সন্তোষকুমার ঘোষের সমস্ত গল্প

দ্বিতীয় খণ্ড

স্বরলিপি ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৫৬

প্রকাশক : ধীরা চৌধুরী
স্বরলিপি
২৩এ, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : তুষার ঘোষ

ছেপেছেন : দি নিউ কমলা প্রেস
শ্রীকৃষ্ণমোহন ঘোষ
৫৭/২, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০০৯

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

গানের আকাশ যার বরাবর,
অন্যতর অবকাশ তাকে। তখনকার
গল্প আবার এখন।

একদিন আমি লিখে খালাশ, আজ ফের ছাপতে দিয়ে, আবার। এই সব গল্প যৌবনের, যা আমার জীবনের উজানে। তখনকার রক্ত, তখনকার বিশ্বাসে অবিশ্বাসে গ্রহণে প্রত্যাখানে এগুলো অন্তত তখন জীবন্ত ছিল। লোকে পড়ত। আজ যদি ভুলে গিয়ে থাকে আক্ষেপ করব না। আমিও তো ওদের বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম।

আবার ওরা দুটো মলাটের আব্রু নিয়ে বেরিয়ে এল! ওদের কে নেবে কে নেবে না সেই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই। গল্পগুলো ভালো হলে ভালো, মন্দ হলে মন্দ। তারা নতুন পেশোয়াজ পরে পেশ তো হল! প্যালা মিলুক চাই না মিলুক এই লেখক এখানেই থামুক।

কারণ তার পাওনা যে পেয়েছে সে! এরপর কিসে কী যায় কী আসে?

কোনও লেখা মরে, কোনও লেখা বাঁচে। কোনও কোনও লেখা মরেও বেঁচে ওঠে। এই আশা নিয়েই ইতি—

অচিন্ত্যকুমার

সূচীপত্র

প্রেমপত্র

কনক, আমি সুধাময়। তোমাকে যে ভালবেসেছিল। এবং যার ভালবাসার ভয়ে তুমি এখন দূরে গিয়ে পালিয়ে রয়েছে।

এ-লেখাটা শেষ পর্যন্ত তোমাকে হয়ত পাঠব না, পাঠাতে সাহস হলেও রুচি হবে না, তবু লিখছি। এই ভরসায় যে, কিছু হালকা হওয়া যাবে। নিজের নামটা আগে ভাগে লিখে রাখলুম, ফলে শেষের পৃষ্ঠাটা তোমাকে প্রথমেই দেখে নিতে হবেনা।

মধ্যবয়সী একটা মানুষের ভালবাসাকে ভালুকের মত ভয় পাও, কনক, তুমি কী! একটু যদি ধৈর্য থাকত তোমার, তবে জানতে, সে ভালবাসার নখ-দাঁত কোনটাই নেই। সুতরাং পালাবার প্রয়োজন ছিল না।

এখন তুমি ত অনেক দূরে কনক, সত্যি করে বল ত, তোমাদের জানালা থেকে আমাকে যখন দেখতে, তখন তোমার মনে ঠিক কী ভাব জাগত। মাথার দখল নিয়ে লড়াই করে কাঁচা আর পাকা দু তরফের চুলই যার সাফ হয়ে এসেছে, সেই লোকটি টেবিলে বসে ঝিমোত, গালে তার তিন দিনের বাসী দাড়ি, ঢিলে লুঙ্গিতে কষে-বাধা কোমর। লোকটি কলম খুলে কাগজ সামনে নিয়ে বসে থাকত, মাঝে মাঝে লিখত। কী, জান? মানে নেই এমন টুকিটাকি। ছাতের কার্নিশে বসে একটা কাক কাকিনীটার ঘাড়ের রোঁয়া ঠুকরে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, আর একটা অবাক কাঠবিড়ালী একটু দূর থেকে তাই তারিফ করছে। লোকটি তার খাতায় এই জরুরী খবরটি টুকে রাখল।

কিংবা কোনদিন দুপুরের দাউ দাউ রাগের পরে বদ্ধ পাগল আকাশটা হঠাৎ শোরগোল করে হয়ত কান্নাজুড়ে দিয়েছে, লোকটি তখন লেখা ফেলে পিছনের পানাপুকুরে বৃষ্টির খই ফুটছে কিনা দেখতে দৌড়ল। এসব কোনো কাজে লাগে না, না-কাহিনী, না-ডায়েরি, তবে খাপছাড়া লোকটার কথাই আলাদা।

লুকিও না কনক, আমি জানি, তুমি লুকিয়ে দেখতে। কিন্তু তোমার কী মনে হত। কৌতুক? সম্ভব। ভয়? বোধহয় না। তখনও আমাকে ভয় করবার কোন কারণ ঘটেনি। কিন্তু সে যখন কিছুই লিখতে না পেরে কাগজ কুটিকুটি করে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিত, অস্থির হয়ে এদিক ওদিক চাইত, তখন? করুণা কি হত, কনক? কমবয়সী মেয়েরা কি প্রৌঢ় পাগলামিকে করুণাও করে?

দেখ, কনক, সময়কে যদি বলা যায় বহতা পানি, এক একটা বয়স তবে তার পাড়ের এক-একটা বাঁধান ঘাট; উজান থেকে মানুষ কতটা এল, সে হিসাব যার সিঁড়িতে খোদাই করা আছে। ভাঁটির ঘাটে দাঁড়িয়ে পিছনে চাইলে উজানের ঘাট বড় জোর ঝাপসা ভাবে চোখে পড়বে কিন্তু মানুষ সেখানে কখনও ফেরে না, ফিরতে পারে না।

কেউ যা পারেনি, ভেবেছিলুম আমি তা পারব। জানতুম না, প্রকৃতির নিয়মের উপর জারিজুরি চলে না।

তোমার মনে আছে, কনক, আমার বসবার ঘরের জানালাটার পাশে একদিন বিকালে আমরা দুজন দাঁড়িয়ে ছিলুম? পর্দা সড়িয়ে তুমি কী যেন দেখছিলে। হয়ত রাস্তার ভিড়। কিংবা কিছুই দেখছিলে না, শুধু চেয়েছিলে। আমি পিছনে এসে দাঁড়ালুম, তোমার কাঁধে সন্তর্পণে একটি হাতও রেখেছিলুম মনে পড়ছে। স্পর্শ-কাতর লতারমত তুমি কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেলে; সরে যেতে চাইলে।

আমার ইচ্ছাটা যদি নিজেই নিজের বিধি হত, তবে সেই

মেঘেঢাকা কালামুখি বিকালে ব্যাপারটা কতদূর গড়াত, বলতে পারিনে। একটু দুরে গিয়ে তুমি জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছ আমার দিকে অপলক চেয়ে একটু একটু করে পিছনে হঠছ।

হঠাৎ আমি অস্ফুট গলায় নিজেকে বলে উঠতে শুনলুম, "বন্ধ কর, বন্ধ কর জানালাটা।" বলতে বলতে আমি পাল্লা দুটো নিজেই টেনে ধরলুম। ঠাস ঠাস চড় পড়ার মত দুটো শব্দ হল। আমি দম নেবার জন্য একবার চোখ বুজেছি, তুমি সেই অবসরে ছুটে পালিয়ে গিয়েছ।

কনক, তুমি আজও জান না, সে দিন আমার কী হয়েছিল। কেন হঠাৎ জানালাটা বন্ধ করে দিলুম।

আমার স্ত্রী যূথিকা কিন্তু জানত, কেন। বসবার আর শোবার ঘরের মাঝখানে একটাই ত পর্দা, ফ্যানের হাওয়া সেটাকে থেকে থেকে মুঠোর মত পাকিয়ে আবার খুলে দেয়। বিছানায় বালিশের উপর বালিশ সাজিয়ে যূথিকা এদিকেই চেয়েছিল, সব দেখেছিল।

একটু পরে যখন ও-ঘরে গেলুম, সে বালিশের স্তূপে পিঠ ঠেকিয়ে সোজা হয়ে বসল, একটা চোখ ছোট করে তাকিয়ে বলল, "কে এসেছিল?"

তোমার নাম বললুম।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় চোখটাকে বন্ধ করে যুথিকা ভাবনায় ভান করল। তারপর দুটো চোখেই খুলে বলল, "বুঝেছি, সিনেমায় নামবে বলে ঘোরাঘুরি করছে, পাড়ার সেই খারাপ মেয়েটা, কেমন? তা হঠাৎ অমন দুদ্দাড় ছুটে পালাল কেন?"

সব জানে, তবু আমার মুখে শুনতে চায়। বদ্ধ জন্তুকে খোঁচা দেবার বর্বর সুখ।

তিক্ত গলায় বললুম, "জানি না। তুমিই বল না।"

"জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছিলে বলে।"

চমকে উঠলুম। অত্যন্ত কর্কশ গলায় জিজ্ঞাসা করলুম, "জানালা কেন বন্ধ করলুম, তা-ও জান বোধ হয়?"

অদ্ভুত চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে যূথিকা ধীরে ধীরে বলল "তা-ও জানি। জানালার ঠিক বাইরে কচি সজনে গাছটার পাশে ন্যাড়া-মরা নিম গাছটাকে দেখে হঠাৎ ভয় পেয়েছিল।"

অনেক দিন কল্পনা করতে চেষ্টা করছি, কোন মানুষ যদি হাসতে হাসতে হঠাৎ মরে যায়, তবে তার মুখে কেমন হাসি ফুটে থাকে; চোখের কোল হয়ত একটু কুঁচকে যায়, সামান্য ফাঁক হয় ঠোঁট দুটি। আর তার কোন নড়চড় কিছুতে হয় না। যূথিকার মুখে সেই স্থির, বোবা হাসি দেখতে পেলুম। কনক, চিত্রটি সম্পূর্ণ করতে আমি সেদিন যূথিকার চোখের মণি উপরে নিতে পারতুম।

আজ বুঝতে পারছি, যূথিকা ঠিকই বলেছিল জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সেই খণ্ড মুহূর্তে সহসা মনে হয়েছিল, মর জন্ম ঘুচে গিয়ে লোকান্তরে আমরা উদ্ভিদ-দেহ পেয়েছি, সবুজ সজীব সজনের ডালের পাশে ন্যাড়ামরা নিম হয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি।

জানালাটা সেদিন থেকে বন্ধই থাকত। তবু কনক, তোমার কাছে আজ অকপটে স্বীকার করছি, মাঝে মাঝে এক একদিন আমি লুকিয়ে জানালাটা খুলতুম। কেন, আমিও জানিনা। মরা নিমের ডালে একটি দুটি কচি পাতা ফুটেছে দেখতে পাব, হয়ত গোপন মনে এই অসম্ভব আশা লালন করেছি। চুয়ান্ন বছরের প্রবীণ শরীর একটি বাতুল ইচ্ছার নড়িকে আশ্রয় করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেয়েছে।

এইখানে যূথিকার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খোলাখুলি আলোচনা করলে ভাল হয়। উপরে তার যে ছবিটি এঁকেছি তা থেকে যদি ধারণা কর কনক যে আমরা বিবাহিত জীবনে সুখী হয়নি, তবে ভুল করবে। যদি মনে কর, যূথিকা স্বভাব ক্রুর সামান্য রমণী, তবে তার প্রতি অবিচার করা হবে।

আসলে যেদিন যূথিকা হাসপাতাল থেকে দুরারোগ্য অসুখ নিয়ে

ফিরে এল, সেদিন থেকেই এই জটিলতার শুরু। সূতিকায় ত কত শিশুই মরে, কিন্তু তাদের মায়ের দেহ-মনে এমন ছাপ আর কেউ রেখে যায় না। যূথিকা জেনে এসেছিল সে আর কোনদিন মা হবে না। তার চোখের চাউনিই বদলে গিয়েছিল।

প্রথমে দিন কতক বিছানাতেই আয়না চিরুনি, পাউডার আর স্নো নিয়ে পা ছড়িয়ে বসত, মুখ দেখত আর মুখ দেখত। রং বুলিয়ে ঠোঁট দু'টি করত টুকটুকে। আঙুল দিয়ে সিঁথি চিরে চিরে পরখ করত ক'টা চুল পাকল। গুনত, ভুল করত, ফের গুনত।

হঠাৎ বা কোনোদিন জিজ্ঞাসা করত, "এটা কী সাল বল ত?" শুনে নিয়ে হিসাব করতে বসত।......"এক, দুই, তিন, ...আমার তবে এখন চুয়াল্লিশ চলছে। না না, হল না, তেতাল্লিশ, কী জানি, ঠিক গুনতে পারছি না। তুমি একবার বলে দেবে?"

ভয় হত, বয়স গুনে গুনে আর পাকা চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাগল না হয়ে যায়।

এ ভাবটা মাস তিনেকের বেশী স্থায়ী হয়নি, একদিন দেখি শিয়র থেকে সরে গেছে আয়না, বালিশ-বিছানার আনাচে-কানাচে থেকে পাউডার কুমকুম ইত্যাদি বিলাসের সব উপচার অন্তর্হিত।

কাছে যেতেই বলল, "উঁহু, এস না, এস না, আগে গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে এস।"

বিস্মিত এবং কতকটা বিরক্তও, জিজ্ঞাসা করেছি, "গঙ্গাজল কোথায় পাব।"

"আছে, চাকরকে দিয়ে আজ আনিয়েছি। তুমি আমাকে গীতা এনে দেবে?"

তিনদিনে যূথিকার এক অধ্যায় গীতা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তা নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ ছিল না, কিন্তু সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরলে আমাকে তার ব্যাখ্যা করে শোনাতে বসত কিনা, কনক মুশকিল ছিল সেখানে। এ বিষয়ে আমার উৎসাহের অভাব ত ছিলই

কিন্তু প্রকৃত সমস্যা অন্য। যূথিকা যতদূর সম্ভব আমার ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে চলতে চেষ্টা করছিল। দৈবাৎ গায়ে গা ঠেকত যদি, সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে গঙ্গাজলের ব্যবস্থা ত ছিলই।

মজা যে একেবারেই পাইনি, তা বলব না কনক। পেয়েছি। প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ও দিয়েছি। কিন্তু ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে তখন কল্পনাও করতে পারিনি।

যূথিকা একদিন বলল, "আমি দীক্ষা নেব।"

বললুম, "বেশ ত, নাও না। গুরু-টুরু কি পেয়ে গেছ?"

"গুরু আমার ঠিকই আছে। শোনো, তিনি বলেছেন তোমাকেও দীক্ষা নিতে হবে।"

"আমাকে? আমাকে আবার কেন। তোমার পুণ্যের একটু ভাগ আমাকে দিয়ো, তবেই বৈতরণী তীরে দেখবে স্বর্গে ঠিক তোমার পাশে গিয়ে হাজির হয়েছি।"

বলতে বলতে, কী সর্বনেশে বুদ্ধি হল, ঝুঁকে পড়ে যূথিকাকে বুকের উপরে টেনে নিতে গেলুম। তীব্র একটা গুলির মত ছিটকে গেল যূথিকা, আলু-থালু বেশে ভাঙা-চেরা একটা বাঁশির মত গলায় চেঁচিয়ে বলল, "ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না তুমি আমাকে।" মাথায় ঠক করে কী লাগল, তুলে দেখি সেই বাঁধান শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতা। যূথিকা হাঁপাতে হাঁপাতে আবার বলল, "পশু।"

সেই মুহূর্তে আমারও কী জানি কী হল, এই স্ত্রীলোকটির দিকে চেয়ে সমস্ত শরীর রী-রী করে উঠল, সব দিক থেকে নিঃস্ব এই মেয়েমানুষটার কাছে কোনোদিন কিছু চাইতে পারব না, চাইলেও দেবার মত কানাকড়ি সম্বলও ওর নেই। শনের নুড়ি চুল আর শির ওঠা রোগা-রোগা হাত দু'টির দিকে চেয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললুম, "বুড়ি!"

পলকে যূথিকাকে ফ্যাকাশে হয়ে যেতে দেখলুম। "কী, কী বললে?"

কথাটাকে জিভ দিয়ে যেন টাকার মত বাজিয়ে বাজিয়ে বললুম, "বুড়ি। বুড়ি। বুড়ি।"

ভেবেছিলুম, নুয়ে-নেতিয়ে পড়বে। কিন্তু না, ধীরে ধীরে যূথিকা নিজেকে যেন ফিরে পেল। এক-পা এক-পা এগিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল আমার সমুখে। বলল, "বুড়ি? আমি বুড়ি? আর তুমি?"

কী ছিল সেই অপলক চোখে, আমার ভিতরটা অকস্মাৎ কেঁপে উঠল। অত্যন্ত ক্ষীণ, শুকনো গলায় বললুম. "কী আমি।"

আশ্চর্য স্থির এবং প্রশান্ত ভঙ্গিতে যূথিকা বলল, "তুমিও কিছু কালকের খোকাটি নও। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তোমার ছায়াই তোমাকে সে-কথা বলে দিত। আমাকে বলে দিতে হত না।"

কনক, আয়নার দরকার হয়নি, যূথিকার চোখে আমি নিজের ছায়া দেখেছি। সে চেহারা এক ভয়াল তান্ত্রিকের। শবাসনে বসেছে—শব তার নিজেরই শরীর। ইচ্ছা-বাসনা, সুখ-স্বপ্ন সব মট মট করে ভেঙে সামনে জ্বালানো ধুনিতে আহুতি দেবে।

তুলনাটা কিছু বীভৎস হয়ে গেল, হয়ত দুর্বোধ্যও। সোজা করে বলি। সেই সময়ে আত্মহত্যার মত কাঁচা-নাটকীয় একটা কাণ্ড করবার প্রবল লোভ মাঝে মাঝে আমাকে বিচলিত করেছে। পাহাড়ে উঠে চারদিকে চেয়ে লোকে যে শূন্যতা অনুভব করে, এ তা-ই। উঠবার পথ খাড়া ছিল, দুর্গম ছিল, কাঁটায় কাঁকরে কষ্টে, রক্তে-যন্ত্রণায় মাখামাখি অভিজ্ঞতা। কিন্তু এখন চূড়ায় উঠেছি, যা কিছু দেখার দেখে নিয়েছি, আর উঠব না, কষ্ট পাব না, কিছু নেব না, শুধু নেমে যাব; আরোহণের পর এই অবরোহণ।

সেই নামে মাত্র বেঁচে থাকাটাকে আমি ভয় করতে শুরু করেছি; স্বাদহীন, স্বেদহীন সেই আলুনি আয়ু নিয়ে আমি কী করব।

কনক, ঠিক এই সময়ে তোমরা এই পাড়ায় উঠে এলে। একদিন লেখার টেবিলে বসে ফরমাসী ফিল্মের স্ক্রিপট লিখছি, রাস্তার ও-পাশের বাড়ির ছাদে তোমাকে দেখতে পেলুম।

দেখ, প্রথম দেখাটাকে আমরা এ-কালে আর তেমন মূল্য দিই না, হঠাৎ কোন কিছুকেই না। সব সম্পর্কই পরম্পরা বেয়ে বেয়ে লতার মত জড়িয়ে ওঠে। তবু সেদিন অনেকক্ষণ ধরে তোমাকে দেখছিলুম।

ছাদের কার্নিশে কোনো কিছু না ধরে পা ঝুলিয়ে বসে আছ, তোমার সেই দুঃসাহসী কিন্তু অনায়াস ভঙ্গির ছবি আমার মনে একেবারে ছাপা হয়ে গেছে। ভাল লাগল, ভয় পেলাম। তোমার বসবার ভঙ্গিকে ভাল লাগল। বেপরোয়া, সব কিছু তুচ্ছ করবার ভাবকে ভয় পেলাম। ও-ভাবে ছাদে পা ঝুলিয়ে আমিও একদিন বসেছি, এখন শরীর ওজনে ভারি, মনও ভীতু, এখন আর পারি না, কিন্তু তুমি পার, আর সেই পারার অহঙ্কার লুকোবার এতটুকু প্রয়াস তোমার মধ্যে দেখলুম না। সেই ঔদ্ধত্য আমাকে মুগ্ধ করল।

তবু সেই মোহ হয়ত শুদ্ধ, নির্গন্ধ সাদা ফুলের মত অনুভূতি মাত্র হয়ে মনে বেঁচে থাকত, কিন্তু যূথিকা প্রথম থেকেই সন্দেহের নখে আঁচড়ে আঁচড়ে তাকে রক্তাক্ত ঘায়ের মতো করে তুলল যে। নইলে তোমার সঙ্গে আমার বয়সের যা ব্যবধান, তাতে আমি দিব্য তোমার পিতৃব্য বনে যেতে পারতুম।

প্রথম বোধ হয় পাড়ারই কী একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তোমাকে গান গাইতে শুনি। সেখানে কার মধ্যস্থতায় আমাদের আলাপ হল জানিনা, কিন্তু তার দিন কয়েক পরে তুমি নিজেই একদিন আমার বসবার ঘরে চলে এলে। কার কাছে শুনেছ, আমি সিনেমার জন্যে গল্প, চিত্রনাট্য, সংলাপ ইত্যাদি রচনা করে থাকি। স্টুডিও মহলে আমার যাওয়া-আসা আছে। সামান্য পরিচয়ের ভরসায় জানতে এসেছ, আমি কিছু সুবিধা করে দিতে পারি কিনা।

পারি না, কিন্তু তোমাকে সেদিন কথাটা খোলাখুলি বলতে অহঙ্কারে বেধেছিল। আশাও দিইনি, একেবারে নিরাশও করিনি সত্যি কথা বলতে কী, আমি অবাক হয়ে তোমাকে শুধু দেখেছি সেই সবে পরিচয়, তবু তোমার এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। এই একবার

বসলে, এই উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালে। মাথায় সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে কথা বলতে গিয়ে খোঁপা একবার আলগা হয়ে পড়ল, পিছনে দু'হাত নিয়ে কনুই তুলে ফের সেটাকে বিন্যস্ত করলে, সামান্য একটা কথাতেই কৌতুক পেয়ে হঠাৎ হালকা গলায় হেসে উঠেছ। সেটাও ঈষৎ বিস্ময়কর, কিন্তু তখন অসঙ্গত বা বেমানান মনে হয়নি।

গাম্ভীর্যের মুখোশ এঁটে বসে ছিলুম বটে, কিন্তু কনক, সেই মুখোশের ছিদ্র দিয়ে আমি তোমাকে অপলক দেখছিলুম ঠিক তোমাকে কি? না, তোমার চাপল্যকে। যে চাপল্য আমি ইহ-জন্মের মতো খুইয়েছি আর পাব না তাকেই তুমি তোমার শাড়ি ব্লাউজের মতো তোমার চোখের ক্ষীণ সুর্মারেখার মতো অসামান্য রুচির সঙ্গে পরে আছে।

যূথিকা সেদিনই টের পেয়েছিল ; হেসে বলেছিল, "ও মেয়েটা তোমার কাছে কেন এসেছিল, সিনেমায় নামতে চায় বুঝি ?"

সংক্ষেপে বলেছি, "হ্যাঁ"।

যূথিকা তবু থামেনি, গলায় নকল গাম্ভীর্যের ঢঙ এনে বলেছিল, "সাধু সাবধান।"

"মানে ?"

"নিজেই বুঝে দেখ"।

তীব্রকণ্ঠে বলেছি, "আমার বোঝা আছে। তুমি দয়া করে তোমার ছোট মন আর খুঁত খুঁতে নাক দিয়ে এ সব ব্যাপারে এস না।"

"না, আমার আর কী, আমার বিছানার চারপাশে ত তুমি ওষুধের শিশির পাহাড় জমিয়ে রেখেছ, তার লেবেল পড়ে পড়েই আমার দিন কাটবে। কিন্তু আমি হাসছি তোমার কথা ভেবে, ও-মেয়ের চোখের দিকে চেয়েছ দেখেছ, মণি দুটো না-সাদা, না-বাদামী কী অদ্ভুত রঙের ? এসব মেয়ে সর্বনেশে হয়, জেনে রেখ।"

কনক, সেদিন যূথিকার কথায় চটেছি। কিন্তু পাড়ায় তোমার সত্যিই ত সুনাম ছিল না। ওই ক'দিনেই তোমার নামে অনেক খবর

কানে এসেছে, কিছু চোখেও পড়েছে। তোমার হাবভাব ভাল না। তুমি পুরুষের সঙ্গে বড় বেশী মেশ, এমন কি, সদর রাস্তায় প্রকাশ্যেই লোকের সঙ্গে সহাস্য নির্লজ্জ গল্পজুড়ে দাও। এর সঙ্গে দুপুরে হয়ত বের হও রিকসায়, ওর সঙ্গে সন্ধ্যায় টাক্সিতে। অনেক দিন গভীর রাত অবধিও ফেরনি, হলপ করে এমন কথা বলবারও লোক ছিল।

আর বিছানায় শুয়ে শুয়ে যূথিকা কোথা থেকে কী ভাবে জানি না, সব খবরই জোগাড় করত।

প্রথম দিকে তিন চারদিন পরপর আসতে, পরে প্রায় রোজই আমাদের বাসায় আসা শুরু করলে। জানতে কোন সময়ে আমাকে বাসায় পাওয়া যায়। যূথিকার সঙ্গেও আলাপ করে নিলে। রোজ তার ঘরেও একবার যেতে, তার কোমরে ব্যথা আর ঘাড় ফোলাটা কেমন আছে খোঁজ নিতে। যূথিকা সামনা সামনি তোমাকে কিছু বলত না, কিন্তু মনে মনে জ্বলত, জ্বলত, জ্বলত। আড়ালে যে সব খারাপ গালাগাল মুখে আনত, শুনলে, কনক, তুমি কানে আঙুল দেবে।

ইনিয়ে-বিনিয়ে, কথায় বিষ-ফোঁড়ন দিয়ে বলত, "মেয়েটাকে সিনেমার কাজ এখনও জুটিয়ে দিতে পারলে না বুঝি? তা বাপু আমি বলি কী, ওসব সিনেমা-টিনেমা বাড়ীর বাইরে হলেই ত ভাল। বাড়ীতে কি ওসব কেউ করে?" বলতে বলতে হাসত যূথিকা, "দেখ, একটা মজার কথা মনে পড়ল। আমার এক দাদামশাইয়েরও এসব রোগ ছিল। থিয়েটারের কার কাছে তিনি রোজ যেতেন। কিন্তু মনে রেখো, যেতেন, তাকে বাড়ীতে এনে তোলেন নি। সেকালের লোকেরাও তোমাদের মত খারাপ ছিল, কিন্তু ভদ্র ছিল। বাড়ী আর বাগান-বাড়ীর তফাত বুঝত। তোমরা দু'টোকে এক করে দিতে চাও।"

জবাব দিতে হলে অত্যন্ত কুৎসিত ঝগড়ার ডুবজল পাঁকে নামতে হয়। অতএব কনক, আমি অধিকাংশ দিনই চুপকরে সরে এসেছি।

এসেও ত পরিত্রাণ পেলাম না।

যূথিকা সেই জানালা বন্ধ করে দেবার ঘটনার চারদিন পরে বিশ্রী রকমের ঠাট্টাটা করল, এই চার দিন তুমি আসনি। অথচ তুমি এখানেই ছিলে। একদিন বিকালে ত মুখোমুখি পড়ে গেলুম। পাড়ার যুবসঙ্ঘের পাণ্ডা গোছের একটি ছেলের সঙ্গে তুমি রিকশায় উঠছ। আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। মাথার চুল ফাঁপান ধূসর শাড়ীর আঁচল অন্যমনস্ক, পাশের ছেলেটির সঙ্গে আরও জেরে জোরে হেসে হেসে কথা বলেছ।

কনক, সেদিন আমারও মনে হয়েছিল, তুমি সত্যিই বড় খারাপ মেয়ে।

বাড়ী ফিরে কোনো কাজে মন দিতে পারিনি। চড়া আলোটা নিভিয়ে নিষ্প্রভ-নীল ডুমটা জ্বেলে শুয়ে পড়েছি। ও-পাশের খাটটা থেকে যূথিকা বলেছে, "কী হল।"

শুকনো এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছি। "মাথা ধরেছে।"

"তবে বালিশ-টালিশ সরিয়ে বিছানাটা একটু ঠিক ঠাক করে নাও?"

আধো-অন্ধকারে দেখিনি ও মুখটিপে হাসছিল।

বালিশ সরাতে গিয়ে বিষাক্ত বিছের কামড় খেলাম। যন্ত্রণায় গলা অবধি নীল হয়ে এল। কোনমতে বললুম, "এসব কী। কে এনেছে, কে রেখেছে এ সব এখানে?"

অত্যন্ত ভাল মানুষের ভঙ্গিতে যূথিকা বলেছিল, "কোনসব?"

"এই যে কলপ, আর সালসার শিশি?"

নিষ্ঠুর নির্বিকার গলায় যূথিকাকে উত্তর দিতে শুনেছি, "আমি। আমিই বাজার থেকে আনিয়েছি।"

"কেন?" মাথার যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে প্রচণ্ড গর্জনে যেন ফেটে পড়লুম। বললুম, "কেন, কেন, কেন?"

ঠোঁটের উপর তর্জনী রেখে যূথিকা ফিস ফিস করে বলল, "শ্-

শ্-শ্। আস্তে। তোমার সুবিধার জন্যই। আজকাল আর আসে না, দেখি ত সে জন্যে ঘরময় পায়চারি কর, মাথার চুল ছেঁড়। আসল কথা কী জান? তোমার বয়সকে তুমি ভুলেছ, কিন্তু বয়স তোমাকে ভোলেনি।"

চমকে চাইলুম। একটু দূরেই থরে থরে শিশি বোতল সাজিয়ে ছোটখাটটার সঙ্গে যূথিকার বিশ্রী একদা নারী শরীর মিশে আছে, অস্পষ্ট আলোয় সেদিকে চেয়ে মনে হল, যেন যূথিকা নয়, যেন আমার ভয়ের বয়সটা ছদ্মবেশ নিয়ে আমাকে উপহাস করছে। কলপ আর সালসার শিশিটা ছুঁড়ে শব্দ করে চুরমার করবার লোভ অতিকষ্টে সংবরণ করেছি, কারণ আমি ভীরু, প্রৌঢ়, সামাজিক মানুষ। এক সঙ্গে তিন ধাপ করে সিঁড়িটপকানোর মত সব রকম আতিশয্যই এ-বয়সে বারণ।

কনক, তুমি আমার চোখে কামনার হিস-হিস চেরা-জিভকে নড়ে উঠতে দেখেছ, কিন্তু তার আড়ালে পরম-কাপুরুষ সামাজিক মানুষটিকে দেখতে পাওনি, পেলে অন্তত পালাতে না। সত্যি কথা, সেদিন অনেক রাত অবধি সদর রাস্তায় তোমার জন্য পায়চারী করেছি। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে একটা গাড়ী পলকে অদৃশ্য হল, তুমি সেদিকে খানিক চেয়ে থেকে বাসায় ঢুকতে যাবে, আমি তোমার পথ আড়াল করে দাঁড়ালুম। বললুম, "একবার আমার সঙ্গে একটু আসবে কনক? কয়েকটা কথা ছিল।"

চমকে ভয়ে-ভয়ে বললে, "কোথায়?"

"পার্কে, কিংবা...ধর, কোনো চায়ের দোকানে?" এলোমেলো জবাব, হয়ত সেইজন্যই তোমার সন্দেহ হল। একটু পিছিয়ে গিয়ে বলল, "না-না। আজ থাক। অনেক রাত হয়ে গেছে!" উপর দিকে আকাশে চেয়ে যেন তারাদের সাক্ষী মানলে।

হঠাৎ তোমার কবজিটা চেপে বললুম, "এস ই না। বেশীক্ষণের জন্যে ত না। আমার কথাগুলো খুব জরুরী।"

অনায়াসে হাতটা ছাড়িয়ে নিলে, দ্রুত পাশ কাটিয়ে চৌকাঠে পা রেখে ফিরে বললে, "আজ নয়। কাল সকালে আসবেন। আর, আর, দেখুন—"তোমার গলা এখানে একটু কেঁপেছে, "দেখুন, আমাকে যত খারাপ ভাবছেন, আমি ঠিক ততটাই খারাপ নই।"

বেত-খাওয়া জন্তুর মত মাথা হেঁট করে ফিরে এসেছি।

কনক, আজ তোমার কথাটা তোমাকেই ফিরিয়ে দিই। যতটা ভেবেছিলে আমিও ঠিক ততটাই খারাপ নই।

মিছিমিছি সেদিন ভয় পেলে কেন। পেলে যদি, এত কেন, যে ভয় হিতাহিত জ্ঞানহীন করে? অন্যথা পাড়ার রকের মুরুব্বী অপদার্থ ছোকরাটার সঙ্গে সাতদিনের মধ্যে পালানোর মত ভুল তুমি করতে না। এ-কথা আমি পরে বারবার ভেবে সুখ এবং দুঃখ পেয়েছি যে, ভালবেসে নয়, আমার হাত এড়াতেই তুমি চূড়ান্ত দামে একটা লোকশান কিনেছ।

পাড়ায় অবশ্য তোমার পলায়ন নিয়ে অনেক মুখরোচক গুজব তৈরি এবং ফিরি হয়েছিল। তার মধ্যে একটা ছিল, তোমার মাতৃত্ব আসন্ন।

তোমার কারণ তুমি জান, আমার তরফ থেকে একটা কথা তোমাকে খোলাখুলি জানাতে চাই। সেদিন সন্ধ্যাবেলা যত চাঞ্চল্যই দেখিয়ে থাকি না কেন,- আমরা শিক্ষিত ভদ্রলোক, সব রকমের বাড়াবাড়িকে ভয় করে থাকি। বেশী দূর এগোতাম না।

এক, ইচ্ছা ছিল না। দুই, সাধ্যও না।

আজ কবুল-জবাব দেবার নেশায় পেয়েছে, নইলে সাধ্যের কথাটা লিখতে কলম সরত না।

যূথিকাকে একদিন বুড়ি বলে গাল দিয়েছিলুম, মনে আছে?

যে-দিন সে আমাকে আয়নায় মুখ দেখতে বলেছিল?

ও বিছানা নেবার প্রায় বছর পরের কথা। একদিন আমার চোখ কান ঢাকা নীতিবোধের টুপিটা বিকালের হাওয়ায় উড়ে গেল। সন্ধ্যার ঘোর লাগতে বেরিয়ে পড়েছিলুম সেই সুখের সন্ধানে, যা পণ্য। সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু সংগ্রহ করতে পারিনি। শুধু গান শুনে আর, আর পান করে ফিরে আসতে হয়েছে। বোবা, বিবাস ইচ্ছাটা শরীর-চেতনায় কিছুতে ধরা দেয়নি। যূথিকার সালসার শিশির ঠাট্টাটা সাধে কি সহ্য করতে পারিনি।

শ্রাবণের মেঘ যেমন আকাশ ছেয়ে এবং প্রবল জ্বর শরীরের রক্তকণা ছেয়ে আসে, মৃত্যুর সাধও তেমনই আমাকে সেদিন পেয়ে বসে ছিল। কোন কাজে মন ছিল না। ভাবিনি সেই নিরাশা এবং নিষ্ক্রিয়তার সাঁড়াশির চাপ কোনোদিন আবার শিথিল হবে। হয়েছিল। সামান্য ক'দিনের জন্য, কিন্তু হয়েছিল।

পরিবর্তনটা যূথিকার চালাক চোখে ধরা পড়েছিল। বিছানায় শুয়ে শুয়েই এক ধরনের আমোদ পাওয়া হাসি হাসত। মুখে কিছু বলত না, কিন্তু চোখের পাতা কখনও ঠোঁটের কাজ করে। সেই হাসির মানে আমি পড়তে পারতুম। যূথিকা যেন বলত, ব্যাপার কী। আগে ঠেলে ঠেলে নড়ান যেত না, এখন যে বড় চটপটে ভাব। সময় মত নাওয়া-খাওয়া। লেখার প্যাডে ধুলো জমেছিল, হঠাৎ তিন তিনটে স্ক্রিপটের খসড়া তৈরী হয়ে গেল।

চোখের পাতা দপ দপ কাঁপত, যূথিকা যেন বলত, জানি জানি, এত উৎসাহের ইড়া, পিঙ্গলায় কে বসে আছে জানি।

প্রায় বছর ঘুরতে চলল, কনক, এখনও তোমার খোঁজ পাইনি। তোমার বাড়ী লোকেরা সন্তাপে, লজ্জায় এ পাড়া ছেড়ে গেছেন। শুনেছি তাঁরা তোমাকে হিসাব থেকে খারিজ করে দিয়েছেন। পুলিশ কেস করবার মত মূল্যও তাঁরা তোমাকে দিতে রাজী নন।

একটি পাথরের নুড়ি কয়েকটি জল-বলয় তুলে ডুবে গিয়েছে, পুকুর শান্ত, স্থির।

কিন্তু একটি হৃদয় এখনও শান্ত হয়নি।

উপসংহারে তার একটা অত্যন্ত ছেলেমানুষী সাধের কথা শোন। সব গিয়েছে, তবু এখনও মাঝে মাঝে এই সাধের সহকারে একটি প্রিয় কল্পনার লতাকে জড়িয়ে দিই। কী কল্পনা, জান?

একবার, জীবনে আর মাত্র একটিবারই, তোমার সঙ্গে দেখা হবে। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে তোমার বাসার দরজায় গিয়ে দাঁড়াব, টোকা দেব। না, দেখা হতে তোমার মুখ কঠিন হবে না। ম্লান হেসে বলবে, "ও, আপনি?"

ম্লান হাসি, কনক, কেননা চারিদিকে চোখ বুলিয়ে ইতিমধ্যে দেখে নিয়েছি যে, তুমিও সুখে নেই। অনেক উচ্চাশা ছিল যার মনে, অনেক প্রাণের ফেনা যার চোখের কোন দিয়ে উছলে পড়ত, এই হতশ্রী পরিবেশের হট্টগোলে তাকে চেনা শক্ত হবে।

"খুব রোগা হয়ে গিয়েছ।"

অপ্রতিভ হয়ে বলবে, "হ্যাঁ, বড় একটা অসুখ থেকে উঠলাম। টাইফয়েড হয়েছিল, দেখছেন না চুলের হাল? সব উঠে গেছে।"

জানি, অত্যন্ত অনুচিত কল্পনা, একান্তই হীন। তবু এই বিষাক্ত লালা দিয়ে মন-মাকড়সা তার জাল বুনে চলে, ছিঁড়ে বেরিয়ে আসি, সে সাধ্য নেই।

একটি কর্কশ কান্নার শব্দকে অনুসরণ করে লিকলিকে রোগা এক শিশুকে দেখতে পাব।

জিজ্ঞাসা করব, "এরও অসুখ?'

মাথা নিচু করে বলবে, "হ্যাঁ। জন্ম থেকেই রিকেট।"

"চিকিৎসা?"

এবার জবাব দেবে না, এবং দেবে না বলেই অকস্মাৎ টের পাব, যার সঙ্গে ঘর ছেড়ে এসেছিলে, সে সরে পড়েছে। তুমি একা।

কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে যাব, কিন্তু ফিরেও আসব খানিক পরে। ঘোরাঘুরি করে ফল আর টনিক ঔষধ কিনে এনেছি। সেগুলো হাতে

তুলে নিতে তোমার চোখ ছলছল হবে। পরদিন আবার ফিরব; তারও পরদিন আবার।

বাস্তবে হয়ত সম্ভব হত না, কিন্তু সবটাই যখন কল্পনা, তখন একদিন তোমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কিছু টাকা দিতে বাধা নেই। তোমার কুণ্ঠা দেখে বলব, "না—না দান নয়, ধার। একটা কাজ পেয়ে শোধ দিও।"

কাজ? বিষণ্ণ উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে বলবে, "কাজ কোথায় পাব।"

অভয় দিয়ে বলব, "নিশ্চয়ই পাবে। তোমাকে এতদিন বলিনি, একটা ফিল্ম কোম্পানির সঙ্গে ছোট একটা পার্ট তোমাকে দেবে বলে কথা প্রায় পাকা করে এনেছি।"

বিশ্বাস করতে সাহস পাবে না, অথচ চোখ দেখে বুঝতে পারছি ত, বিশ্বাস করতে পারলে তুমি বেঁচে যাও। হয়ত সেই টানা পোড়েনে তোমার চোখে জল এসে যাবে। হঠাৎ আমার হাত দু'টি চেপে ধরার মত ছেলেমানুষী করে ধরা গলায় ধীরে ধীরে বলবে, "আপনাকে আমি কিছুই দিইনি, তবু...."

কনক, তখন? যে কথাটি বলবার জন্যে কল্পনার এই আয়োজন, তার এক বর্ণও কি সেই গদ্‌গদ মুহূর্তে মুখে ফুটবে? হয়ত বলতেই পারব না, কী পেয়েছি, কতখানি। বেঁচে থাকার অভিরুচি তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছ। জেনেছি, এখনও তবে আমি ভালবাসতে পারি! আমার যৌবন যায়নি। মুখ ফুটে বলতে যদি পারি, অবাক হয়ে তাকাবে।—

"যায়নি?"

"না।"

দেহগত তুচ্ছ একটা পটুতা নয়, ভালবাসা পাওয়া ও না, শুধুমাত্র ভালবাসতে পারাই যে যৌবন, এ বয়সে একথা বোঝা তোমার পক্ষে শক্ত হবে। তবু লিখে রাখলুম, এই ভরসায় যে কোনদিন হয়ত বুঝবে। কেননা, কনক, তোমারও ত এই বয়সের অবসান আছে।

গিল্টি

একটি যৌথ ব্যবসায় ফেল পড়ার কাহিনী লিখতে বসেছি।

শুরু করেও কিন্তু বুঝতে পারছি না এটা শেষ অবধি গল্প হবে কিনা। দেখা জিনিস আর শোনা কথার ছাঁটকাট শেলাই করি, গল্প বলে চালাই। জিনিস তৈরী হয়ে গেলে কখনও কাপড়ের টুকরো বাঁচে, কোন কাজে লাগে না, কলের ছ'ধারে জড়ো হয়, কিছু হাওয়ায় ওড়ে, কিছু ঝাঁট দিয়ে ফেলি, ছ'এক টুকরো তুলেও রাখি যদি কোনদিন জোড়া-তালির কাজে লাগে। এই লেখাটা মূলে তেমনি একটা কাপড়ের টুকরো, পরে দরকার হবে ভেবে তুলে রেখেছিলুম, আজও তোলা আছে। রঙ জ্বলে গেছে, বুনট জীর্ণ হয়ে এসেছে। পাছে সব যায় সেই ভয়ে এটাকে আজ নামিয়ে নিয়েছি। কলম নিয়ে বসেছি যেমনটি দেখেছি তেমনিই লিখব বলে। এখনও সন্দেহ আছে, হয়ত লেখাটা বিবৃতিমাত্র হবে, বড় জোর ধাঁধা।

প্রথমে কার কথা লিখি, সীতার না সলিলবাবুর? ছ'জনের মধ্যে সলিলবাবুকে আগে দেখেছিলুম, সুতরাং তাঁকে নিয়েই আরম্ভ করা যাক।

সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের সেই মেসটিতে আমাকে দেখে প্রথম দিন সলিলবাবু খুশি হননি। চিলে কোঠায় একলা থাকতেন, নতুন রুমমেটটিকে উৎপাতের মতো মনে করেছিলেন।—আপনাকে এখানে এনে ঢুকিয়েছে বুঝি? ম্যানেজার ব্যাটা দেখছি সব ভরে ফেলতে চায়, ছ'দিন বাদে মাছি বসবার জায়গাটুকুও থাকবে না।

তা মহাশয় কি টেম্পোরারি, না একেবারে পারমানেন্ট সেটলমেন্ট করে এলেন ?

বললুম, টেম্পোরারি। রেলের চাকরি, আমিনগাঁও থেকে বদলি করেছে লখনৌ। মাঝখানে কিছুদিন কলকাতা থাকতে হবে।

বললেন, ও! বুঝলুম নিশ্চিন্ত হয়েছেন, হয়ত প্রীতও, কেন না গামছা কাঁধে নীচে নেমে গেলেন। খানিক পরেই কলতলা থেকে গুন্ গুন্ গলা ভেসে এল, সুরটা চিনলুম, হে ক্ষণিকের অতিথি!

এসব পার্টিশনের অল্প কিছু দিন পরের কথা।

সলিলবাবুকে কিন্তু আমার ভাল লেগেছিল। কোট পাতলুন পরে যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতেন, মনে হত রীতিমত সুপুরুষ, চশমার নীচে চোখ দু'টি বুদ্ধিদীপ্ত; খালি গায়ে খাটিয়ায় শুয়ে যখন বিড়ি টানতেন তখন আবার অন্য রূপ! লুঙ্গিটা ঢিলে করে অধমাঙ্গে কোনোমতে জড়ানো, কোমরে কসির দাগ, শুকনো ঘায়ের মতো, শ্বেতির ছিটের মতো। পাঁজরার হাড় গোনা যায়। চশমাটা বালিশের পাশে খুলে রাখা, নিস্প্রভ, ঈষৎ প্রোথিত চোখের কোলে কালি স্পষ্ট।

সলিলবাবু কী করতেন কখনও টের পাইনি। এক এক দিন সকাল সকাল বেরিয়ে যেতেন, ফিরতেন বেলা গড়িয়ে। কোনো দিন বা বিকালে বেরুতেন—হয়ত ফিরতেন, হয়ত ফিরতেন না। অন্তত কখন ফিরতেন আমি টের পেতুম না, কেন না ঘুমিয়ে পড়তুম। সকালে উঠে অনেক দিন দেখতুম ও-পাশের খাটে মাথা অবধি মুড়ি দেওয়া একটা মানুষের দেহের আভাস, থেকে থেকে নাক ডাকছে। এমনও দেখেছি, দিনের পর দিন সলিলবাবু ঘর থেকে আদৌ বের হলেন না। মাঝে মাঝে চাদরের বাহিরে মুখ বার করতেন, শুধু চা টোষ্ট খেতে। দেখতে পেতুম একগাল দাড়ি, ফোলা ফোলা চোখ, হলদের ছোপ-লাগা দাঁত। তারপর একদিন দাড়ি কামিয়ে স্নো

ঘষে, ধবধবে জামা কাপড়ে ফিটফাট হয়ে বের হলেন। হলেন ত হলেন, তিন চার দিন তাঁর টিকি দেখা গেল না।

শুনতুম বিজনেস আছে, সেটা যে ফক্কাও কিছু নয় বুঝতে অসুবিধা হত না, কেন না মেসের পাওনা বাকী রেখে ম্যানেজারের সঙ্গে কুৎসিত ভাষায় ঝগড়া করতেন, সিকিটা আধুলিটা ধার নিয়ে ভুলে যেতেন, মিল বন্ধ হল ত টানা উপোস দিলেন। ওজর দিতেন শরীর খারাপ।

প্রথমদিকে এসব বুঝতুম না। সকাল সকাল নাকে-মুখে দু'টি দিয়ে কাজে যাচ্ছি, সলিলবাবু তখনও বিছানায় হাই তুলছেন, বলতুম, বেশ আছেন মশাই, হিংসে হয়। পরের গোলামী করবার জন্য ছোটাছুটি নেই। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসতেন সলিলবাবু।—যা বলেছেন। এই একটা মহা সুখ। কারও পরোয়া নেই। বলেই অস্বাভাবিক জোরে হেসে উঠতেন, সেই জোরটুকুকে খাঁটি মনে হত না।

ফাঁকিটা ধরে ফেলতে আমার অবশ্য বেশি দেরি হয়নি। বোধহয় কোনো একটা ছুটির দিন হবে, শুনলুম সলিলবাবু আজ খাবেন না, জ্বর হয়েছে। আগের দিন রাত্রে ম্যানেজারের সঙ্গে তাঁর কথা-কাটাকাটির খবর জানতুম। আজ সকালেই ভদ্রলোককে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতে দেখে কপালে হাত দিয়ে দেখতে গেলুম। দেখি কত জ্বর।

কী হিংস্রভাবে সলিলবাবু আমার হাতটা ঠেলে দিলেন, আজও মনে আছে। বোধহয় আঙুলে ওঁর নখের কয়েকটা আঁচড় বসে গিয়েছিল। প্রথমে অপ্রতিভ, পরে বিরক্ত হয়ে বললুম, জ্বর হয়েছে তবে ডাক্তার দেখান না কেন? ওষুধ খান।

চাদরের নীচে মাথা টেনে নিয়ে সলিলবাবু বললেন, এ জ্বরে ওষুধ লাগে না।

বিকালে অফিস থেকে ফিরে আমাদের ঘরেই কিছু চা-ডিম-

খাবার ইত্যাদি আনিয়ে নিলুম। মিট-মিট করে চেয়ে সলিলবাবু বললেন, কী ব্যাপার, মহাভোজ যে?

—খুব ক্ষিদে পেয়েছে। আসুন না, আপনিও আসুন।

সলিলবাবু তাড়াতাড়ি চাদরের ভিতরে মুখ টেনে নিলেন। ভয়ের ভাব দেখালেন, আসলে সেটা কিন্তু সংকোচ।—আমার জ্বর হয়েছে বলিনি?

—এ জ্বরে চা-জলখাবার খেলে কিছু হয় না। আসুন।

সলিলবাবু এলেন কিন্তু। খেতে বসে তাঁর আর বাধো-বাধো ভাব ছিল না, চায়ের বাটি এক চুমুকে শেষ করলেন, ডিমটা গিললেন এক গ্রাসে। দাঁতে কড়া করে সেঁকা টোষ্ট ভাঙার মচ মচ শব্দ শুনলুম। অস্নাত, অক্ষৌরীকৃত রুক্ষ মুখটা যেন একটা ক্ষুধিত জন্তুর। হাতের তেলোতে মুখ মুছে সলিলবাবু কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। সে চোখে কৃতজ্ঞতা ছিল না, প্রীতিও না। কিছুটা কৌতূহল হয়ত ছিল, বেশিটাই অবিশ্বাস। আয়নার সামনে শিথিলবাস প্রসাধনরত মেয়েরা হঠাৎ কারও পায়ের শব্দ শুনে যে চোখে পিছন ফিরে তাকায়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আলো জ্বলে নি। ধীরে ধীরে কর্কশ রেখা ক'টি মিলিয়ে গিয়ে সলিল বাবুর মুখে কোমলতা ফিরে এল। ঈষৎ ভাঙা কিন্তু চাপা গলায় ওঁকে বলতে শুনলুম,—আপনি খুব চালাক লোক মশাই! আপনার নিশ্চয় ক্ষিদে পায়নি, আমার জন্যেই আজ এসব আনিয়েছিলেন।

প্রতিবাদ করলুম না, কী মোহ আছে মেসের এই কানা ঘরে হেমন্তের ধোঁয়া-বোবা সন্ধ্যার, অপরিচিত মানুষও কাছে আসে: অনেক পরে আস্তে আস্তে বললুম,—বিজনেসে আপনার বোধ হয় সুবিধে হচ্ছে না সলিলবাবু, আপনি বরং একটা চাকরি নিন।

এর জবাবে সলিলবাবু আমার হাত জড়িয়ে ধরবেন ভাবিনি। মুখের কাছে মুখ এনে বললেন, আছে, আছে আপনার খোঁজে?

পাইয়ে দেবেন একটা চাকরি? আমি নিজে ত কোনো চেষ্টা বাকি রাখিনি।

সেদিন সলিলবাবু ওঁর বুকের উপরটার মতো ভিতরটাও নিরাবরণ করে দিয়েছিলেম। আবরু, লুকোচুরি ছিল না। চাকরি ত সলিলবাবু একটা করতেন আগে, জগন্নাথ ঘাটের কোন স্টিমার কোম্পানীতে। পার্টিশনের পরে পূর্ববঙ্গের ইউনিট আলাদা হল, এদিককার ব্যবসায়ে ভাঁটা পড়ল। সলিলবাবু একদিন অফিসে গিয়ে শুনলেন তাঁর এবং আরও কয়েকজনের চেয়ার বাড়তি হয়েছে। এদিকে বিধবা বোন চলে এসেছে ছোট একটি ছেলের হাত ধরে। ছোট ভাই কলকাতায় সলিলবাবুর কাছ থেকে কাজকর্মের চেষ্টা দেখত, সে পড়েছে শক্ত অসুখে। প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, পরে নিশ্চিত জানা গেল, টি, বি। বোনকে কোথায় রাখেন, ভাইকে হাসপাতালে দিতে হবে তার তদ্বির করেন, না চাকরির। শেষ পর্যন্ত দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাসায় বোনের একটা জায়গা যদি বা হল, তারা আবার ছেলেটিকে রাখতে চায় না। আসলে ওদের ইচ্ছে বিমলাকে যদি দু'মুঠো খেতে দিতেই হয়, দস্তুরমত খাটিয়ে নিতে হবে। সে রাঁধবে, বাসন না মাজুক, দরকার হলে ছেলে ধরবে। নিজের ছেলে থাকলে পরের ছেলের দিকে নজর দেবে কখন! অনেক বলে কয়ে সলিলবাবু ওদের তাতেও রাজি করালেন। এমন কি ওই আত্মীয়দেরই সুপারিশে ভাইয়ের জন্যে হাসপাতালে একটি সীটেরও ব্যবস্থা হল। কিন্তু তার খরচ জোগাতে তাঁর নিজের মুখে এখনও রক্ত উঠছে। টুকটাক কাজ যা করেন তাতে আপনার পেট চালানো দায়, বিজনেসটা ভুয়ো।

কত ভুয়ো সেটা সীতাকে দেখার আগে টের পাইনি।

সলিলবাবু কিন্তু পরদিন থেকে আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেছিলেন। সকালে উঠেই জিজ্ঞাসা করেছিলুম,—কেমন আছেন সলিলবাবু? তিনি জবাব দেননি। পাশ ফিরে দেয়ালের দিকে মুখ রেখে শুয়েছিলেন। আরও দু'চারটে কথা জিজ্ঞাসা করেও তার

সাড়া পাইনি। অবাক হয়েছিলুম, একটু অপমানও বোধ করে থাকব। পরে নিজেই ভেবে ভেবে ওর বিসদৃশ আচরণের একটা কারণ খুঁজে পেয়েছিলুম। কাল সন্ধ্যার অন্ধকারে যার কাছে কিছু গোপন রাখেন নি আজ সকালের আলোয় তার মুখের দিকে চাইতে পারছেন না সলিলবাবু। এই উটপাখী-রীতি ভাল করেই চিনি। নিজেকে ক্রমাগত ধিক্কার দিচ্ছেন সব বলে দিয়েছেন বলে, সব জেনেছি বলে আমাকে। রোষ ঘৃণার রূপ নিয়েছে। আমাকে সলিলবাবু সহজে ক্ষমা করবেন না।

এর বোধহয় দিন দুই পরে সীতা এসেছিল। চিলে কুঠির দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল,—সলিলদা'—সলিলবাবু নেই?

তাড়াতাড়ি উঠে বসলুম।—আছেন। বোধ হয় নীচে গেছেন। সলিলবাবুর সীটটা দেখিয়ে বললুম, বসুন।

সীতা—পরে জেনেছিলুম বলেই প্রথম থেকে নাম দিয়ে মেয়েটির উল্লেখ করতে পারছি। একটু দ্বিধা করল, তারপর বসল। শালীনতা বজায় রেখে যতটা সম্ভব ওকে ততটা দেখে নিলুম। রঙ ফরসা, নাক কিছু চাপা, ঠোঁট ঈষৎ পুরু হলেও মুখশ্রী মোটামুটি। রোগা, তবে স্বাস্থ্যহীন নয়। কপালে দু'-একটি ব্রণ শুকিয়ে কালো হয়ে এসেছে, পাউডারের ছোপ কণ্ঠার ঘামাচি ক'টিকে ঢাকতে পারেনি। পরনে খেলো রঙিন একটা শাড়ি, একটু ক্রীমও বুঝি ঘষে এসেছে, তা আসুক কিন্তু এসেন্স মাখতে গেল কেন?

সলিলবাবু ফিরে এসে থমকে দাঁড়ালেন,—কতক্ষণ এসেছ সীতা?

—এই মিনিট কয়েক। ইনি বললেন, তুমি নীচে গেছ এখুনি আসবে।

—ইনি? এতক্ষণে আমার দিকে সলিলবাবুর নজর পড়ল, মুখপেশী কঠিন হল। শুকনো হেসে বললেন, ও, আপনি ঘরেই আছেন বুঝি? সেই সন্ধ্যার পর এই প্রথম সোজাসুজি আমার সঙ্গে কথা বললেন। নিজের ঘরে নিজে আছি এটা অপরাধ কি না ঠিক

বুঝতে না পেরে বিব্রত হয়ে উঠলুম, বোকার মতো হাসতেও হল। তার পর কয়েক সেকেণ্ড কারও মুখে কথা নেই। সলিলবাবু গায়ে পাঞ্জাবি চড়ালেন, দেখাদেখি আমাকেও চড়াতে হল, তিনি হাত দিয়ে চুল ঠিক করে নিলেন, আমিও করলুম। আড়চোখে চেয়ে দেখলুম সীতা মাথা নীচু করে পায়ের নখে নিজের মন দেখছে।

এর পরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই হয়। চৌকাঠের বাইরে পা দিতেই রূঢ় গলা কানে এল,—আমার চিরকুট তবে পেয়েছিলে? কিন্তু তোমাকে এখানে আসতে ত বলিনি। একটি সঙ্কুচিত গলা শোনা গেল,—কী করি, সেই মোড়টায় কোথা দিয়ে যেতে হয় কিছুতেই মনে পড়ল না যে। তা ছাড়া মোড়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে সবাই কেমন তাকাতে থাকে,আমার ভয়-ভয় করে।

জবাবে সেই নীরস গলা: আর তুমি বুঝি ভেবেছিলে মেসে এলে কেউ তাকায় না?

কটাক্ষটা হয়ত আমাকে। তাড়াতাড়ি সরে পড়লুম।

একটু পরে ওঁরাও বেরিয়েছিলেন। নীচে নেমে সলিলবাবু একটা রিক্শা ডাকলেন, ছাদের কোণ থেকে দেখতে পেলুম।

অন্যান্য দিন ঘুমিয়ে পড়তুম, সেদিন কিন্তু জেগে ছিলুম। সলিল বাবু ফিরলেন, তখন এগারোটা হবে। অন্ধকারে জামা-কাপড় বদলালেন, খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল, ছুঁলেন না, শুয়ে পড়তে যাবেন, হঠাৎ কী দুর্বুদ্ধি হল, ফস করে জিজ্ঞাসা করে বসলুম, বেড়ানো হয়ে গেল সলিলবাবু?

সলিলবাবু চমকে উঠবেন জানতুম। অন্ধকারে ওর ফ্যাকাশে মুখটা যেন দেখতে পেলুম।—আপনি এখনও ঘুমোন নি?

—না।

—সীতা দেবীকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে এসেছেন?

সলিলবাবু কতটা চটে যান পরখ করার দুঃসাহস মাথায় চেপে ছিল। আশ্চর্য, ভদ্রলোক এতটুকু রাগ করলেন না। শিস দিয়ে হিন্দী গানের একটা কলি গাইলেন। মেজাজটা যেন ফুর্তির ভেলায় ভাসছে। কাছে এসে আমার বিছানায় বসলেন। আবদার আর অভিমান-মেশানো গলায় বললেন,—সীতা কে, জিজ্ঞাসা করলেন না ত বললুম, ধরে নিয়েছি আপনার বান্ধবী। তাই অশোভন কৌতূহল দেখাই নি।

পা দোলাতে দোলাতে সলিলবাবু কী যেন ভাবলেন।—বান্ধবী উঁহু, বান্ধবী নয়। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা ছিল।

নাকে চড়া চড়া, পচা পচা গন্ধ এসে না লাগলেও বুঝতে পারলুম সলিলবাবু আজ কথা বলবেন। সন্ধ্যাবেলা ঝিরঝিরে বৃষ্টির পর গলিটা কাদা হয়ে ঘুমোচ্ছে, কনকনে হাওয়া কখন থেকে পিঠে সুড়সুড়ি দিয়ে চলছে, তবু তাঁর সাড়া নেই। ঘরের আলো নেবানো, আমরা পরস্পরকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিনে। এই স্তব্ধ গম্ভীর পরিবেশে সেই সন্ধ্যার বাচলতা আবার ফিরে পেয়েছেন সলিলবাবু। বললেন,—জানেন, আমাদের বিয়ে হবার কথা ছিল।

পাছে সলিলবাবুর মোহ ভাঙে, সেই ভয়ে সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করলুম,—হল না কেন?

—হত। চেনাশোনা কি আজকের, সীতা সলিলবাবুর দেশের মেয়ে। কলকাতায় চাকরি করতে আসবার পরেও দু'জনের কতবার দেখা হয়েছে। স্টিমার কোম্পানীতে যখন কাজ করতেন। কত বার নানা ছুতোয় মালের জাহাজেই সলিলবাবু দেশে গেছেন। রীতিমত রোমান্টিক ব্যাপার!

—তবু বিয়ে হল না? বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম।

মাথা নেড়ে নেড়ে সলিলবাবু বললেন,—তবু হল না। ষ্টিমার কোম্পানীর চাকরীটাই গেল যে, ম্রিয়মাণ গলা, একটু আগেকার ফুর্তি চুপসে কখন বিষণ্ণ হয়ে গেছে। না কি বিষণ্ণতাই ফুর্তির

ছদ্মবেশ পরে এসেছিল! করুণ সুরে সলিলবাবু বললেন,—চাকরিটাই গেল যে। বেকার কি বিয়ে করে?

কিছুদিন বাদে সীতারাও এখানে এল। ওর বাবা ইস্কুলে কাজ করতেন, তা ছাত্ররাই রইল না ত কাঠের বেঞ্চিগুলোকে কি পড়াবেন? দুর্ভাবনা বড় বড় মেয়েদের নিয়েও।

সলিলবাবু আবার গলা নামিয়ে নিলেন।—আপনাকে বললুম বটে বেকার কি বিয়ে করে, কিন্তু আপনার কাছে লুকোব না, সে ইচ্ছে একবারে যে বিসর্জন দিয়েছিলুম, তা নয়।

ওরা আসবার মাসখানেক পর খবর পেয়ে দেখা করতে গিয়েছিলেন। গা-ঘিন-ঘিন গলির ভিতর টালির ঘর। সীতার বাবা দরজা খুলে দিলেন। —ও, তুমি? এস। ভাবলেশহীন কণ্ঠস্বর। দরজা খুলে দিয়েই সরে গেলেন। চাকরি নেই ওঁরাও জানতেন কিনা, খারাপ খবর বাতাসের মুখে দৌড়ায়। সীতার মা কিন্তু আদর-যত্ন করেছিলেন। সীতার বোনেরাও এসেছিল। মানা, কান্না, আন্না। বেশ বড় হয়ে গেছে, তবু ফ্রক ছাড়েনি, শুধু শেমিজের খরচায় শাড়ি আর শেমিজের দরকার মিটছে। সকলেরই কুত কুতে ভীত চোখ, বুকের ওপর আড়াআড়ি করে দু'হাত রাখা। শেষবয়সী মেয়েদের বেশবাসে শরীরের বিলীয়মান রেখা ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস, এদের ঢাকা দেবার।

এত কথা বললেন সীতার মা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা জিজ্ঞাসা বাদ করলেন, তবু আশ্চর্য, বিয়ের প্রসঙ্গ কেউ একবার তুললে না। তুললে সলিলবাবুকে 'না' বলতেই হত, কিন্তু ওরা একবার কথাটা পাড়লে না কেন?

বললুম,—সীতাও না?

সীতাও না। দরজা বন্ধ করে দিতে সেইত সলিলবাবুর পিছে পিছে এসেছিল। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মৃদু গলায় দু'জনে একটা দু'টো কথাও বলেছিলেন, কিছু সলিলবাবু যা চাইছিলেন সীতা তার ধার

দিয়েও গেল না, হাত বাড়িয়ে সলিলবাবু ওর একটা আঙুল ধরলেন, বাধা পেলেন না, সাড়াও না, কয়েকটি মড়া পাশার হাড় যেন হাতের মুঠোয় মড় মড় করে উঠল।

চলে আসার আগে সীতা বলেছিল,—আমাকে একটা কাজ খুঁজে দাও সলিলদা।

নিজেরই কাজ নেই, সলিলবাবু হেসে বলেছিলেন,—কী কাজ চাও তুমি?

—যা হোক কিছু। বাবার চোখে ছানি পড়ে এসেছে, উনি আর চাকরি করতে পারবেন মনে হয় না। পারলেও পাবেন না। একটা মাস ত এখানে কোনো মতে চলল। এরপর? ইস্কুলে পড়া বিদ্যে বেশি নয় আমার, বাড়িতে বসে যা শিখেছি তা দিয়ে কিছু জুটবে না?

এরপরে সেই পরিবেশে বিয়ের কথা বেসুরো শোনাত। খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে সলিল বাবু সেদিন চলে এসেছিলেন। দিন কতক গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। সীতা থাকতে দেয়নি। এই মেস অবধি চলে এসেছে।—সলিলদা আমার কাজ? সলিলদা, চাকরি? চলে যায়, আবার ফিরে আসে। কাজের খোঁজ আছে, চাকরির? রোজ এক ঘ্যানঘেনে প্রশ্ন। নিজের সমস্যায় সলিল বাবু পাগল, বিরক্ত হয়ে একদিন বললেন,—চাকরি, মানে কিছু টাকা রোজগার করতে চাও এই ত। একটা খোঁজ দিতে পারি, রাজী? তাতে আমারও হয়ত কিছু থাকবে।

সীতা সাগ্রহে কাছে এসেছিল, ওর নিশ্বাসের তাপ বহুদিন পরে লাগছিল গায় সলিলবাবুর ধীরে উচ্চারিত কথাগুলো শুনে আবার আগের চেয়েও দূরে সরে গিয়েছিল। মুখ কালো, স্ফুরিত ঠোঁট, তীব্র গলায় শুধু বলেছিল,—ছোটলোক! আর এক মুহূর্ত বসেনি, দিন দিন পনেরো আর দেখা নেই।

দীর্ঘ একটা যতি দিলেন সলিলবাবু। হয়ত দম নিলেন।

হয়ত সঙ্কোচ জয় করলেন। তারপর এক চুমুকে পেয়ালা খালি করার মত দ্রুত গলায় বাকীটুকুও বললেন।

রাগ দেখিয়ে যে চলে গিয়েছিল সেই মেয়ে নিজে থেকে একদিন এল। ফণা নেই, ঝাঁঝ নেই। বাবার চোখের ছানি এ কয় দিনে আরও পুরু হয়েছে। মা কবে যেন কলতলায় পিছলে পড়ে কোমর ভেঙেছেন, মানা পাড়ার কোন ছেলের সঙ্গে একদিন কাউকে না বলে ম্যাটিনিতে সিনেমা দেখে এসেছে। সেদিনের মতই সীতা গা ঘেঁষে বসল, কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল,—তোমার এখন আর রাগ নেই ত সলিলদা ?

—রাগ কেন, কার উপর ? রাগ ত তুমি করেছিল।

—না, এমনি বললাম। আচ্ছা সলিলদা, তুমি সেদিন একটা প্ল্যান দিয়েছিলে……ঠাট্টা করনি, না ?

সলিল বাবু বললেন,—না।

সীতা মাটির দিকে চেয়ে বলল,—সেটা এখনো কি—কঠিন মর্মভেদী চোখে ওর দিকে চেয়ে সলিলবাবু বললেন,—এখনো। তুমি রাজী ?

নতনেত্র সীতার মৌনই সম্মতি হল।

তবু প্রথম দিকে নানা অসুবিধে ছিল। রাস্তায় নেমে সীতা বলত,—আমার গা ঠক ঠক করছে সলিলদা, ভারি ভয় করছে, তুমি আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে চল।

ওর পিঠে চাপড়ে দিয়েছেন সলিলবাবু, সাহস দিয়েছেন।—ভয় কী। মোটরে একটু হাওয়া খেতে আসবে বইত নয়! বড়ো জোর দেড় ঘণ্টা। ওরা আবার এই কাফেতেই পৌঁছে দিয়ে যাবে।

অবাক ব্যাপার এই, এত সাহস দিয়ে সীতাকে বিদায় করতেন ; অথচ ওরা চলে যেতেই সলিলবাবুর নিজেরই কেমন গা ছম ছম করত। সরু সুড়ঙ্গের মত সেই কাফেতে কত লোক আসে যায়।

কারা আসে, কেন আসে, কী চায়, এখন রাত কত, ওদিকে খুপরিতে কে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, তার সঙ্গী তাকে ধমক দিতে গিয়ে নিজে অমন বিশ্রী গলায় হেসে উঠল কেন, মশমশ খুট খুট জুতোর চলা, চীনামাটি আর কাচের বাসনের টুং টাং, সব যেন ছায়া ছায়া একাকার, বোবা বোবা কানা কানা দম বন্ধ ভয়। গলিত আগুনে গলা জ্বালিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত সেই ভয়ের হাত থেকে রেহাই নেই।

আবার ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি নেমেছে। চিলে কোঠার জানালার পাল্লা হঠাৎ খুলে গিয়ে ফের বন্ধ হয়ে গেল। সলিলবাবু হেসে বললেন,—সীতার এখন কিন্তু একটুও ভয় নেই।

চুপ করে থেকে বললুম,—ওকে আপনি এখনও বিয়ে করে ফেলুন সলিলবাবু। একি সর্বনাশ করছেন?

শ্বাস পতনের দীর্ঘ একটা শব্দ শুনলুম।—আর হয় না। সীতার মা-বোনেদের উপায় কী হবে? আর, বিয়ে যে করব, বাসর হবে কি সদর রাস্তায়? এখন যে দু'মুঠো জুটছে, তাও ত বন্ধ হবে। যে ডালে বসে আছে সে ডাল কি কেউ কাটে? আর হয় না। সলিলবাবু আবার বললেন,—কোনদিন বিয়ে হবে না জেনেই না ওর সঙ্গে এই বোঝাবুঝিতে নেমেছি। সীতাও রাজী হবে না।

সেই বোঝাবুঝিতেও কত ফাঁকি সেদিন বুঝিনি। পরদিন আড়াল থেকে ওদের কথা শুনতে না পেলে বোঝা হতও না।

আমার উপর বাজার করার ভার পড়েছিল। কেনা-কাটা সারা হতে দেখি অফিসের বেলা হয়ে গেছে। তেল মেখে নেব বলে তাড়াতাড়ি উপরে চলে এলাম। কিন্তু ঘরে ঢোকা হল না। স্পষ্ট মেয়েলী গলা কানে এল।—তোমার পায়ে পড়ি সলিলদা, আজ অন্তত কুড়িটা টাকা দাও।

রুক্ষ, বিরক্ত জবাব : তোমাকে বলেছি না আজ ভাঙানো নেই, কাল দেব ?

সরে যাওয়া উচিত ছিল, স্বীকার করছি, যাইনি। ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম, সীতাকে বলতে শুনলুম,—কিন্তু আমার যে এখনই দরকার সলিলদা। চাল কেনা হবে, তবে উনুন জ্বলবে। খাব কী সেটা ভাবছ না ?

সলিলবাবু নির্মম গলায় বললেন—কাল ত অনেক খেয়েছ, তাতেও পেট ভরেনি ?

—সে ত চপ-কাটলেট। তাতে ক'দিনের খিদে মেটে সলিলদা ? আর আমার মিটলেই কি বাকি সকলের মেটে ?

—বাজে তর্ক কোরো না। আসল কথা তোমাকে তো বলেছি। নোট ভাঙানো হয় নি। হলে তোমার পাওনা কড়াক্রান্তি হিসেব করে মিটিয়ে দেব। আমাকে এটুকু বিশ্বাস কর না ?

—করি, খুব করি। সীতার গলা ধরে এল,—কিন্তু আমি বাড়ী ফিরে ওদের কী বলব বলে দাও। চাল ছাড়া মানা—কান্নার ফ্রক ছিঁড়ে গেছে, ছিট কিনতে হবে, মার ওষুধ—

বোমা ফাটানোর মত গলার আওয়াজ করে সলিলবাবুকে বলতে শুনলাম,—চুপ কর।

সত্যিই কয়েক সেকেণ্ডের জন্য সীতা যেন ভয় পেয়ে চুপ করে গেল। একটু পরে দাঁতে-দাঁত-চাপা স্বর শোনা গেল,—শঠ জোচ্চোর। তোমার কীর্তি আমি জানি না ভেবছ ? আগর ওয়ালার কাছ থেকে তুমি এর মধ্যে ত্রিশ টাকা নিয়েছ, আমাকে বলনি।

আশ্চর্য, জবাবে ধমক নয়, সলিলবাবুর বিরস গলার হাসি শুনতে পেলুম।—ঠিক। কিন্তু জোচ্চুরি বা লুকোচুরি যাই বল, সে কি আমি একা করেছি ? সীতা তুমি করনি ? খাস্তগীরের কাছ থেকে হাত পেতে ইয়ারিং নিয়েছিলে, সে কথা আমাকে জানিয়েছ ? টাকার

দরকার যদি এতই বেশি ছিল, তবে সেটাকেও বাঁধা রাখতে পারতে ?

সীতার চমকলাগা গলায় যেন ওর বিবর্ণ মুখ দেখতে পেলুম।—সে ইয়ারিং তো গিল্টির। কে বাঁধা রাখবে বল ?

মনে হল সলিলবাবু যেন সীতার কাছে সরে গেলেন। কাঁধেও হাত রাখলেন কি না বলতে পারি না! অবিচল গলায় বললেন,—তোমার ইয়ারিং গিল্টি সীতা ? আগরওয়ালা যে নোটটা দিয়েছে, সেটাও তেমনি জাল। জাল বলেই টাকাটা ভাঙাতে পারিনি। ওটা আগরওয়ালাকে ফেরত দিয়ে বদলে নিয়ে আসব।

শাড়ির খসখস, সীতা বুঝি ছিটকে সরে গেল।—জাল ? কক্ষণো না। মিথ্যুক!

—বেশ, বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখতে পার। সলিলবাবুর উদাসীন, নিষ্কম্প গলা।—ওইত আমার জামার বুকপকেটে আছে, নামিয়ে নাও।

—চাই না। আমি নোটের আসল নকল চিনি না। দীর্ঘ স্তব্ধতার পর সীতার ক্লান্ত গলা শুনতে পেলুম,—এখন আসি সলিলদা। টাকা যখন তুমি দেবেই না।

—দেব না ত বলিনি। নোটটা বদলানো হলে তোমাকে শেষ পাইটি বুঝিয়ে দিয়ে আসব, বুঝেছ ?

দরজার মুখে ছায়া পড়ল। তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়ালুম। খোঁপা এলানো, শাড়িরও ভাঁজ নেই, সীতাকে টলতে টলতে বেরিয়ে যেতে দেখলুম।

কয়েকদিন পরেই লখনউ চলে যেতে হয়। জানি না সীতা আর কোন দিন মেসে ফিরে এসেছিল কিনা। সেদিন কে সত্যি কথা বলেছিল তাও জেনে নেওয়া হয়নি। হয়ত দু'জনেই, হয়ত কেউ না।

ভুলটা খাঁটি, গিল্টি দুই-ই হতে পারে, নোটটা আসল বা জাল। গল্পের শেষটাও অজানা রয়ে গেছে, তবে দূর থেকে আশা করছি ওদের বিচিত্র যৌথ চুক্তির পরমায়ু বেশি দীর্ঘ হয়নি; যেখানে দুই অংশীদারের মধ্যে এত সন্দেহ আর অবিশ্বাস, সেখানে হয় না।

কান্নার মানে

অন্যান্য দিনের সঙ্গে এই দিনটির শুরুতে অন্তত কোনো তফাত ছিল না।

ভোরটা ছিল বোবা-বোবা, ভিজে-মতন, যে ভোরে জানালার তিন হাত দূরের চেনা শিউলি গাছটাও অনেক দূরে সরে গিয়ে, কুয়াশার আড়ালে অচেনা একটু ভয়ের মত ঝাপ্‌সা হয়ে জমে থাকে।

কুয়াশা কাছের জিনিসকে দূরে ঠেলে দেয়, অপার্থিব, রহস্য গুণ্ঠিত করে তোলে। আর, দূরের জিনিসকে একেবারে লেপে মুছে, নিরাকার-মিছে করে দেয়।

সেদিনও দিয়েছিল।

গলির আলো নিবেছে, পাশের বস্তিতে চৌকিদার-মোরগটা চেঁচিয়ে উঠেছে। পাঁচটা। গায়ে আরেকটু কাঁথা জড়িয়ে শোওয়া যাক। ও-পাশের ফ্ল্যাটে নতুন আমদানী ভাড়াটের ঘরে আলো জ্বলে উঠল, বিয়ের উমেদার আধ-বুড়ি কুমারী মেয়েটার এখনই তারস্বরে সার্গমবাজি শুরু হবে: সাড়ে পাঁচ। গোটা তিনেক হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে পিছনের ডোবাটায় গিয়ে নামল। সারারাত ধরে নির্জলা-উপোসী কলতলাটার বক সুতো-সরু জলের ছোঁয়ায় তিরতির করে উঠল, অতএব ছ'টা। আর না, এবারে উঠতেই হবে।

কেননা, একটু পরেই ঠিকে ঝি এসে দরজায় হানা দেবে। তার আবার মিনিটের সবুর সয় না, দরজা খোলা না পেলে রক্ষা নেই, কড়্ কড়্ কড়া নেড়ে জানান দেবে পাড়াসুদ্ধ লোককে। দোতলায় মেজ জায়ের অনিদ্রা ব্যামো, হয়ত সকালের দিকে তিনি একটু চোখ বুজেছেন। খান খান ঘুমের ফলে ভাঙা মেজাজ নিয়ে তিনিই হয়ত থালু থালু হয়ে নীচে ছুটে আসবেন।

তার আগেই কুসুমকে উঠতে হবে। ঢালাই লোহার কারখানাটায় একশো কুকুর এক সঙ্গে কেঁদে ওঠে সাতটা বাজিয়ে দেবার আগেই।

গলায় আঁচলের বেড় দিয়ে পুবের ঈষৎ-লালচে আকাশকে গড় করবার সময়ও কিন্তু মনে হয়নি যে, এ-দিনটি অন্য কোনো দিনের চেয়ে একটু আলাদা হবে। গরু যেমন ঠুলি-পরা চোখে ঘানির চারদিকে ঘোরে, এ-বাড়ির দিনগুলোও তেমনি অমোঘ কোন নিয়মে একটি নির্দিষ্ট পরম্পরার খুঁটিকে প্রদক্ষিণ করে।

উনুনটা ভিজে-ভিজে, ভালো করে জ্বলতে চায়নি। হাঁটু ভেঙে ফুঁ দিতে গিয়ে কুসুমের চোখে জল এসে গেছে। মানি ঝি ছাই-মাখা হাতের পিঠ গালে ঠেকিয়ে অবাক হবার ভঙ্গি করে বলেছে, 'ওমা ছোট বউদি, কাঁদছ?'

'কই, না ত।'

হালকা গলাতেই কুসুম বলেছে বটে, কিন্তু জ্বলে গেছে মনে মনে। হারামজাদীর সব ন্যাকামি। কাঁদছ? মনে মনে কুসুম শব্দটাকে ভেঙে-ভেঙচে আবৃত্তি করেছে, তা' তে রাগটা আরও তেজী হয়ে উঠেছে। ন্যাকামী। উনুনে আঁচ দিতে হলে নাকের জলে চোখের জলে যে মিশ খেয়ে যায়, জানেন না যেন।

জানেনা আবার, সব জানে। আসলে ওটা ঠাট্টা হল। মানি ঝি, অনেকদিন থেকেই কুসুম লক্ষ্য করেছে, তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে চায়, ফাজলামো করতে এগিয়ে আসে। মনে মনে কুসুমকে সে তার সমান দরের মানুষ বলেই জানে। এ বাড়ীর অন্য কোন বউ-ঝিকে ত জল-তোলা, উনুন ধরানো, চা-তৈরি করার কাজে দেখতে পায় না। রোজ ভোরে তার সঙ্গে যার চার চক্ষুর মিলন হয়, সে কুসুম। সে যখন ছাই, শাল পাতা আর বাসনের কাঁড়ি নিয়ে কলতলায় বসে, কুসুম তখন উনুন ধরায়। সুতরাং, মানি ঝি মনে মনে হিসাবে করে নিয়েছে, সে আর কুসুম এক জাতেরই মানুষ,

দু'জনেই ঝি। তবে কুসুম মোটামুটি ফর্সা কাপড় পরে কিনা, অতএব একটু উপরের ক্লাসের ঝি।

কে তাকে কী চোখে দেখে, সব টের পায় কুসুম, মুখে কিছু বলে না, উনুনের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে ভাবে। তাই বলে কাঁদে না।

কান্না কুসুমের কবে শুকিয়ে গেছে।

আবার উনুনের মতো হঠাৎ দপ্ করে কোনদিন জ্বলবে না। কুসুমের জ্বলুনিও কবে শেষ হয়ে গেছে!

কুসুম যে ঝি, একটু উঁচু ক্লাসের ঝি, এটা সে কবেই টের পেয়ে গেছে। যেদিন লাল-চেলি আর মুকুট পরে এ-বাড়ীতে প্রথম পা রেখেছিল, সেদিন না হোক, তার দিন কতক পরেই। প্রথম দিন অবশ্য অনেক আলো জ্বলেছিল, চোখে ধাঁধা লেগেছিল। তা একটু লাগতে পারে বইকি। ঘন-ঘন উলু আর শাঁখে কানে কোনো ছোট কথা আসেনি। কড়ি আর চাল নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করতে করতে মনে হয়েছিল, গোটা জীবনটাই বুঝি এমনি খেলা-খেলা। ননদ জায়েদের কেউ এসে কানে-কানে ফিস ফিস করেছিল, কেউ সাজিয়ে দেবার ছলে গালে টোকা দিয়ে পরখ করেছিল নরম কিনা; তখন কিছু বোঝা যায়নি। কুসুম ভেবেছিল, সে-ও বুঝি এদেরই একজন।

তা—যে নয়, সেটা টের পেয়েছে জোড়ে ফিরে এসে। দেখেছে বাড়তি লাইটগুলো ডেকরেটরেরা কবে খুলে নিয়ে গেছে; পাড়ার কুকুরগুলোকে মেটে গেলাস আর কলা পাতা চেটে চেটে খেতে দেখে গিয়েছিল, আজ একটি এঁটো পাতাও পড়ে নেই। সন্ধ্যার পর এ বাড়ীতে মিটমিটে কয়েকটা আলো জ্বলে, একটা ছেলেদের পড়ার ঘরে, একটা হেঁশেলে, আর একটা বড়-জার ঘরে। অন্য কোথাও আলো জ্বলতে দেখলেই বিধবা ননদ এসে নিবিয়ে দিয়ে যায়। মিটার চড়বে। সেই নিবু নিবু আলোয় কুসুম টের পেল, লাল চেলিটা যেমন একদিনের, বন্ধুত্বের জলুস তেমনি দিন সাতেকের। একটা বিয়ের পরদিন থেকেই তোরঙের নিচের ভাঁজে চাপা পড়ে

রঙ খোয়াতে শুরু করে, বুনটটুকুও কবে খসে যায় কেউ টের পায় না। আরেকটাও ওপরের খোলসের মত খসে পড়ে। সাধারণ একটি মেয়ে দু'দিনের জন্য রানীর পোশাক পরে বটে, কিন্তু সেটা ধার-করা। অভিনয়ের পরে খুলে দিতে হয়। ষ্টেজটা কম সময়ের, আসল সংসারটা আঁকা সীনের পিছনে, সাজঘরে। সেখানে রঙচঙে সব পোশাক খুলে ফেলে গায়ে আটপৌরে শাড়ি তুলতে হয়। রূঢ় হাতে ঘষে ঘষে তুলে ফেলতে হয় সব রঙ, শেষ অবধি সব মুছে সিঁথিতে হয়ত সামান্য একটু সিঁদুরের ছোঁয়া টিকে থাকে।

কুসুম তখনই জেনেছে, মাঝারি আয়ের যৌথ পবিবারে কয়েকটি অলিখিত নিয়ম থাকে। তার মধ্যে একটি হল এই যে, যে-বৌয়ের স্বামীর রোজগার সবচেয়ে কম, সে উঠবে সকলের আগে। উনুনে আঁচ দেবে, সেই আঁচের ধোঁয়া ঘুম ভাঙাবে অন্য ঝি-বৌদের; তারপর চায়ের পেয়ালার ধোঁয়া বাড়ির ছেলে আর বাবুদের।

ডাক্তার ভাসুরের স্ত্রী বড় জা যে-নিয়মে উকিল ভাসুরের স্ত্রী মেজ-জাকে একদিন রান্নাঘরে পাঠিয়ে ছিলেন, ঠিক সেই নিয়মেই মেজদি, কুসুম আসবার দিন কতক পরেই ছুটি নিলেন।

কেননা, প্রমথ বেকার, এটা ধরে, সেটা ধরে, আয়ের কিছু ঠিক নেই।

হেঁশেলে কুসুমকে বসিয়ে দিয়ে মেজদি বলেছিলেন,'—নাও ভাই এবারে রানীগিরি কর।'

রাণীগিরিই বটে! ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে যখন চোখ ছল ছল করে, পিঠে টান ধরে, তখন ঝাপ্‌সা আধো অন্ধকার ঘরখানার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে অসম্ভব সব ভাবনার পাগলামি কি আজও কুসুমকে পেয়ে বসে না? একবারও কি মনে হয় না, এই কাঠের পিঁড়িটা আসলে তার সিংহাসন, চ্যাপটা পিতলের হাতাটা রাজদণ্ড, এই ছোট চাপা স্যাঁতসেঁতে হেঁশেলে কুসুম

মহারানী? পাতে পাতে মেপে মেপে সে শাক-তরকারী ডাল পরিবেশন করে না, করুণা বিতরণ করে।

আজগুবি কল্পনা, অদ্ভুত, কিন্তু মাঝে মাঝে চারপাশের এই চাপা দেওয়ালটাকে এক মন্তরে উড়িয়ে দিতে কার না সাধ যায়। না হয় মন্ত্রটা মিথ্যাই।

তাই, মানি ঝি যখন গায়ে পড়ে ভাব-করা গলায় বলেছে 'কাঁদছ,' কুসুম অহেতুক বেশি মাত্রায় চটে গেছে। নইলে কথাটার মধ্যে দোষ ধরবার কিছু ছিল না। দোষ বলবার ধরনে।

'ছোটবাবু আজ এখানে নেই, না বউদি?'

কুসুম সংক্ষেপে বলেছে, 'না।'

'চাকরির খোঁজে বেরিয়েছে শুনলুম? যাক, তবু ভাল যে এত দিনে হুঁশ হল। কোথায় গেছে, জানো?'

কুসুমের মনে হয়েছে, চিৎকার করে বলে যে, তুমি থাম, তুমি আমার সই নও, কিন্তু ভীরুতা বা ভদ্রতায় আটকেছে।—'শোনপুরে।'

'সে আবার কতদূর। নাম শুনি নি ত।'

মুশকিল এই, শোনপুর যে ঠিক কোথায় বা কতদূর, কুসুমেরও জানা নেই। জানা নেই বলেই সে চটেছে আরও বেশি। শোনা কথার ভরসায় আন্দাজে বলেছে, 'অ—নেক দূর। বড় রেল, ইষ্টিমার, তারপরে ছোট রেলে যেতে হয়।'

'কবে ফিরবে?'

'জানি না।'

মানি ঝির মুখ বন্ধ করবার জন্যেই কুসুম আরও জোরে জোরে চায়ের কাপে চামচ নেড়েছে।

দোতলার বারান্দায় বড় জায়ের মেয়ে মানসীর মুখ দেখা না গেলে মানি ঝি হয়ত থামত না।

'খুড়িমা, জল গরম হয়েছে?'

উপর দিকে ঘাড় তুলে চেয়ে কুসুম দেখতে পেয়েছে মানসীকে।

জোরে জোরে ব্রাশ ঘষছে, মুখ ভর্তি ফেনা, তারই অনেকখানি শব্দ করে ফেলেছে উঠোনে, আর একটু হলেই চৌবাচ্চাটায় ছিটে লাগত। কুসুম মনে মনে বলেছে অসভ্য মেয়ে, মুখে আনতে সাহস পায় নি, কোনোদিনই পায় না। অতি মিহি, ভয়ে ভালো মানুষ গলায় বলেছে।

'এক্ষণি হবে।'

'হয়নি বুঝি এখনও?'

'এতক্ষণ বটঠাকুরের চা করলুম যে।'

থমথমে মুখ মানসীর। গলাটাও যেন ভারি ভারি। হয়ত ঘুমে, হয়ত রেগে গেছে বলে। রাগ করে আরও খানিকটা ফেনা উঠোনে ফেলেছে।

'কেতলিটা তুমি ওপরে পাঠিয়ে দাও খুড়িমা, গার্গল্ করবার মত গরম জল আমি নিজেই ষ্টোভে করে নিতে পারব। তোমার যখন অনেক কাজ।'

ভয়ে ভয়ে কেতলিটা তাড়াতাড়ি উনুনে বসিয়ে দিয়েছে কুসুম। আড়চোখে চেয়ে দেখেছে, মাথা নীচু করে বাটনা বাটছে বটে মানি ঝি, কিন্তু ঠোঁট টিপে হাসছে।

বড় ভাসুর কাগজ পড়ছিলেন, চায়ের বাটিটা অভ্যস্ত হাতে টেনে নিয়েছেন, এক চুমুক মুখে দিয়েই কাপটা সরিয়ে বলেছেন, 'চিনি কি ফুরিয়ে গেছে বৌমা?'

লজ্জায় কুসুমের মাথা কাটা গেছে।

বড়ো ছোট এ-বাড়ির মানুষ, পান থেকে চুনটুকু খসলে ক্ষমা করতে জানেনা।

মেজ-জা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করে বলেছেন, 'বুলার দুধটা জ্বাল দিয়েছ ত ছোট বউ?'

'দুধ ত আসেনি মেজদি।'

'তোমার মেয়ে চুক চুক করে কী খাচ্ছে তবে, পিটুলিগোলা?'

'কালকের বাসি দুধ, একটুখানি বেঁচেছিল মেজদি।'

'বাসি দুধ বুঝি' মেজ-জা ফিসফিস করেই বলেছেন, কিন্তু ফিস ফিস গলাও বাড়ী শুদ্ধ লোকের কানে যেতে পারে, শুধু ঠোঁট নাড়ার প্রক্রিয়াটি জানা থাকা চাই। কুসুমের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, বারান্দার কোণে বসে খুকু তখনও শুকনো দুধের বাটিটার চাঁচি-মুচি চাটছিল, ভেবেছে বাটিটা কেড়ে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, ঠাস করে মেয়েটাকে ঠেলে ফেলে দেয় দেয়ালে, কাঁদুক ও, কেঁদে কেঁদে সারা হোক, ওর কপালটা সুপরির মত শক্ত হয়ে উঠুক।

যে-নিয়মে এ-বাড়ীতে কুসুমের সব কাজ সামলাতে হয়, সেই নিয়মে তার বেকার স্বামী প্রমথ নিত্য বাজার করে। আজ প্রমথ নেই, বড় জার ছেলে পটল বাজার যাবে, পটলের হাতে ফর্দ তুলে দিলেন বড়দি, কুসুমকে বললেন, 'ওকে টাকা দিয়ে দাও ছোট বউ।'

টাকা? কুসুমের কাছে কবে আবার টাকা থাকে। টাকাও বড়দি রোজ দেন প্রমথকে।

বড় জাও বুঝেছেন কুসুমের কাছে টাকা নেই। মুখখানা তাঁর ধীরে ধীরে কালো হয়ে এসেছে।

'ছোটঠাকুরপোকে কাল বাজারে যাবার সময় দশটাকার একখানা নোট দিয়েছিলুম, তা-থেকে বুঝি একটা পয়সাও বাঁচেনি ছোট বউ?'

বেঁচেছে কিনা, তাই বা কুসুম কোথা থেকে জানবে। সে শূন্য চোখে চেয়ে থেকেছে। আঁচল থেকে খুলে তিনটে টাকা ছেলের হাতে তুলে দিয়ে বড় বউ বলেছেন, 'অথচ কাল শোনপুর যাবার নাম করে ঠাকুর পো ওঁর কাছ থেকে গুণে গুণে পাঁচটা দশ টাকার নোট নিয়ে গেছে, ছোট বউ।'

দুপ-দাপ করে বড় বউ উপরে উঠে গেছেন, আর অসাড় অবশ শরীরটা নিয়ে নিতান্ত যান্ত্রিক অভ্যাসেই পিঁড়িতে বসে খুন্তি নেড়ে গেছে কুসুম। ভিজে শাক থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উড়ছে, আঁচল

হাওয়ায় কাঁপছে। না, হঠকারী কিছু কুসুম করবে না, করতে পারবে না, করতে চায় না।

এই নিগ্রহ ত নতুন কিছু না। এটাকে ত সে শাঁখা নোয়া এয়োতি চিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে নিয়তি বলেই মেনে নিয়েছে। এ সব না থাকলেই বরং অস্বস্তি হত, মনে হত কোথায় যেন হিসাব মিলছে না, আজকে সকালটা অন্য সব সকাল থেকে আলদা মনে হত।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু আলাদা হলও।

বেলা বাড়তে না বাড়তে একটু একটু মেঘ জমেছে, আকাশের রঙ বদলে গেছ, কিন্তু সে জন্য না।

ঝির ঝিরে বৃষ্টি শুরু হতে কুসুমের মনে পড়েছে, ছাতে অনেক কাপড় শুকোতে দেওয়া আছে। সব তুলে তুলে জড়ো করে রাখছিল চিলেকোঠায়, হঠাৎ কুসুম দেখতে পেয়েছে বড় ভাসুর ফিরে আসছেন। হাতে খবরের কাগজ, সেটা দিয়ে মাথা-আড়াল-করা, তাড়াতাড়ি পা ফেলছেন. কিন্তু এমন সময়ে ত উনি কোনদিনই ফেরেন না!

কুসুমের মনে পড়েছে, সদর দরজা বন্ধ; তাড়াতাড়ি নেমে এসে খুলে দিয়েছে, সরে দাঁড়িয়েছে এক পাশে, ওর চোখে চোখ পড়তে বড় ভাসুর কেমন যেন চমকে উঠেছেন। লুকোতে গেছেন হাতের-কাগজ, তারপর কোনদিকে না চেয়ে সোজা উঠে গেছেন উপরে।

এত তাড়াতাড়ি উনি ত কোনদিন সিঁড়ি ভাঙেন না।

কী জানি কী ভেবে কুসুম ও পিছে পিছে উপরে উঠে এসেছে, হয়ত সামান্য মেয়েলী কৌতূহল। কিংবা অন্তর্যামীই হয়ত বুকের ভিতর থেকে সব টের পাইয়ে দেন।

উপরে উঠে দেখেছে দরজা ভেজানো, অবোধ শিকলটা থেকে থেকে কেঁপে উঠেছে। কুসুম যেন জানত, ভেজান থাকবে। কারণ নেই, তবু বুকের ভিতরটা শিকলটার মতই থেকে থেকে কেঁপে উঠেছে। কুসুম কান পেতেছে কপাটে। ওরা চাপা, ত্রস্ত গলায় কথা বলছে। কিন্তু প্রতিটি শব্দ শুনতে পেয়েছে কুসুম।

'ষ্টিমার-ডুবি? কাল রাত্রে? কই সকালের কাগজে ত ছিল না।'

'টেলিগ্রাম ছুপুরে বেরিয়েছে। দানাপুর এক্সপ্রেসের প্যাসেনজার নিয়ে একটা স্টীমারই গঙ্গা পাড়ি দেয়। চড়ায় ঠেকে জাহাজ চৌচির হয়ে গেছে।'

'সব নাম বেরিয়েছে?'

'আস্তে। ছোট বউমার কানে এখনই যেন কিছু না যায়। নাম সব বেরোয়নি। সব লাশের কিনারা হয়নি ত। হলে বেরোবে আস্তে আস্তে।'

ঠিক তখনই ভয়ে-রক্তে একাকার হয়ে কুসুমের মনের মধ্যে সব জানাজানি হয়ে গেছে। ধপ করে কুসুম বসে পড়েছে বারান্দায়, দরজার বাইরে ধুলোয়। শব্দ পেয়ে বড়দি তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে এসেছেন, ওকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছেন, আর কথা বলতে হয়নি, অমন ভারিক্কি গিন্নি মানুষ হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠেছেন।

কুসুমের চোখে তখনও জল আসেনি।

পরপর কী ঘটেছে, তাও ভালকরে টের পায়নি।

যেন মনে পড়ে, অনেকগুলো পায়ের শব্দ নানা দিক থেকে ওর কাছে এসে থমকে থেমেছে। নিঃশব্দ বোবা মুখের সারি, সকলেরই চোখে জল। কে যেন ওর পিঠে হাত রেখেছে।—বউ ওঠ।

কিছু বোঝেনি কুসুম, জিজ্ঞাসা করেনি কেন তবু উঠেছে। হাত ধরাধরি করে ওরা ওকে পৌঁছে দিয়েছে ঘরে। সহানুভূতি দিয়ে সম্পূর্ণ করে ঢেকে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। কোলের কাছে এনে দিয়েছে খুকিকে।

এরা কারা। এই যে একজন ওর শিয়রে দাঁড়িয়ে পাখার হাওয়া করছেন, আরেকজন হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন কপালে, কুসুম কি এদের জানে। কী জানি, কিছু মনে করতে পারছে না, সব যেন ধোঁয়া ধোঁয়া আবছায়া, চিনুক বা না-চিনুক, এরা সবাই ওকে ঘিরে আছে কেন।

ওরা কি চেপে ধরবে কুসুমকে, একটু একটু করে পিষে দম বন্ধ করে মেরে ফেলবে ওকে? না না এই ত ওদের মুখ মায়া-মলিন, চোখ-কান্না-কোমল। কার জন্য কান্না, কুসুমের? কী হয়েছে কুসুমের। কিছু ত হয়নি। এই ত সে দিব্যি শুয়ে আছে, দেখছে সাদা দেওয়াল গুলো বকের পাখা হয়ে কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল। গেল বটে, কিন্তু কী যেন নিয়ে গেল। কী। কী। ভাবতে গিয়ে মাথা ঘুরে গেল, হাতের উপরে ভর দিয়ে হঠাৎ উঠে বসতে গেল কুসুম, আর তখনই দুটি ঠাণ্ডা হাত ওকে জড়িয়ে ধরল, অতি মৃদু, অতি-সহৃদয় গলায় কে বলল, উঠল, 'না কুসুম, আর একটু শুয়ে থাক।'

কুসুম? এ-নামের এই পাঁচ বছর এ-বাড়ীতে কেউ ত তাকে ডাকেনি? চোখ মেলে কুসুম দেখল, বড়-জা। ওর মাথাটি কোলের ভিতর টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে বলছেন, 'উঠো না কুসুম।'

কুসুম? আর কান্না ধরে রাখা যায়নি, বড়দির কোলের ভিতরে মুখ ডুবিয়ে বলে উঠেছে, 'আমার যে সব ফুরিয়ে গেল, দিদি।'

'কুসুম শক্ত হও। খুকুর দিকে চাও। এখনই ভেঙে পড়ো না। সব খবর পাওয়া যায়নি ত, উনি আজই সন্ধ্যার ট্রেনে পাটনা যাচ্ছেন। উনি ফিরে আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাখ।'

সব কথা বোঝেনি, সব কথা কানেও গেছে কিনা সন্দেহ, কুসুম অনেকক্ষণ চোখ বুজে চুপ করে থেকেছে। তারপর ধীরে ধীরে নিস্তেজ গলায় বলেছে, 'তোমরা সবাই যাও। আমি একটু একা থাকব।'

ঢালাই লোহার কারখানায় একশো কুকুর গলা মিলিয়ে কেঁদে উঠতেই কুসুম চোখ মেলেছে, ধড়মড় করে উঠে বসতে গেছে। মাথাটা এখনও ভারি, শরীরেও দুঃসহ যন্ত্রণা, জলের পিপাসা শুকিয়ে

শুকিয়ে গলার কাছে কাঁটার মত শক্ত হয়ে ঠেকে আছে। কিন্তু আর সব ফাঁকা, সাদা, একেবারে শূন্য।

সে কোথায়। তার শোবার ঘরে? কিন্তু কারখানা ছুটি হল, বেলা গড়িয়ে গেছে, সে এখনও শুয়ে কেন।

সব কাজ এখনোও বাকি না? উনুন ধরাতে হবে না? ইস্কুল কলেজ থেকে ওরা সব এখুনি ফিরবে, ওদের খেতে দিতে হবে না?

পা টলছে, তবু দেয়াল ধরে কুসুম কোনোমতে উঠে দাঁড়াতে গেল। কিন্তু পারল না, বিছানাতেই ওকে বসে পড়তে হল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল কে। বালিশের উপর ওর মাথা নুইয়ে দিয়ে বলল, 'উঠছ কেন, কুসুম, আরেকটু শুয়ে থাকোনা।'

মেজদির গলা।

অস্ফুট গলায় কুসুম বলতে গেল, 'কিন্তু মেজদি, বিকেলের কাজকর্ম সব যে বাকি, ঘর ঝাঁট দেওয়া, উনুন ধরানো, ঠাকুরকে জল-মিষ্টি দেওয়া, প্রদীপ দেখানো—'

মেজদিকে বলতে শুনেছে, 'ছি ভাই ছি। আমরা কি পশু। কোন কাজ পড়ে থাকবে না, সব আমরা ক'জন মিলে হাতে-হাত করে নেব, দিদি, আমি, মানসীও আছে। এই দেখ, মানসী তোমার জন্যে দুধ গরম করে এনেছে, খেয়ে ফেলে আরেকটু শুয়ে থাক দেখি।"

কুসুম চেয়ে দেখেছে, গরম দুধের গ্লাস হাতে মানসী এসে দাঁড়িয়েছে। ছল-ছল চোখ। এই মেয়েটিই কি আজ সকালে তাকে ধিক্কার দিতে উঠোনে শব্দ করে দাঁত-মাজা ফেনা ছিটিয়ে দিয়েছিল? বিশ্বাস হয় না। ধোঁয়া নেই, জ্বালা নেই, আজকের সন্ধ্যা এমন নরম, কালো, সুন্দর হল কী করে। আর চারপাশের চেনা মানুষগুলো কি মন্ত্রবলে আলাদা হয়ে গেল। ভেবেছে কুসুম, কেবলই ভেবেছে। কিনারা পায়নি, কেঁদেছে। কেঁদে ঘুমিয়েছে।

আসল কান্নার পালা ছিল এরও পরে, কুসুম নিজেও জানত না।

একতলায় রাস্তার ধারে কুসুমের ঘর। বড়দি নিজে শুতে চেয়েছিলেন। কুসুম বলেছে, 'দরকার নেই'। 'তবে মানসী আসুক?' বড়দি বলেছেন আজ একা শুতে নেই কুসুম, ভয় পাবে। কুসুম তাতেও রাজি হয়নি।—'না দিদি, না। সব ভাবনা ঘুচে গেছে আমি ভয় পাব কী। শুধু একটু ঘুমোব।'

শেষ পর্যন্ত মানি ঝি দরজার বাইরে মাদুর পেতে শুয়েছে। সেই ভয় পেতে হল। আরও কান্না কাঁদতে হল।

ভয় এল মাঝরাতের কাছাকাছি একটা সময়ে। জানলার ঠকঠক শব্দ শুনেছিল ঠিকই, কুসুম তো আর ঘুমোয়নি। প্রথমে ভেবেছিল বাতাস। কিন্তু বাতাস কি এমন চুপ পায়ে আসে, এমন গুনে গুনে টোকা দেয়? তবে। বুকের উপর হিম হাত দু'টি জড়ো করে কুসুম শুয়েছিল, একটা একটা করে টোকা গুনছিল। মনে মনে বলছিল, সব তো গেছে, আমার আবার ভয় কী, তাই চেঁচায়নি। তারপর টোকা থেমে গেছে, কুসুম শুনতে পেয়েছে, অতিনীচু কিন্তু স্পষ্ট গলায় কে যেন ওর নাম ধরে ডাকছে। চেনাগলা। বিদ্যুতের ছোঁয়া ছড়িয়ে গেছে সমস্ত দেহে। কুসুম উঠে বসেছে। নিশিতে পাওয়া গলায় বসেছে, 'যাই'; আচ্ছন্ন অভিভূতের মত ছিটকানি খুলে দিয়েছে।

কপাট আলগা হতেই প্রথম দমকা হাওয়া, তারপর সেই হাওয়ার পিছে পিছে যে চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে তার অবয়বের আভাস ছাড়া কিছুই দেখা যায় না, তবু কুসুমের চিনতে ভুল হয়নি, পা থেকে মাথা অবধি একবার থরথর করে কেঁপে উঠেছে, আহ্লাদ অবিশ্বাস, আতঙ্ক মেশানো কণ্ঠে কুসুম বলে উঠেছে, 'তুমি?'

আগন্তুক এগিয়ে এসে ওকে কাছে টেনে নিয়েছে। তার বুকে মুখ লুকিয়ে কুসুম শুনতে পেয়েছে, 'আমি। আমিই ত। প্রমথ। ভয় পেয়েছিলে?'

কুসুমের না-বাঁধা চুলে আঙুল বুলিয়ে প্রমথ বলে গেছে, 'সত্যিই

আমি। ভূত নই। আলো জ্বালিয়ে দাও; দেখবে আমার ছায়া পড়েছে। ভূতের কি ছায়া পড়ে?'

প্রমথর বুকে মুখে রেখেই একেবারে ছোট্ট খুকিটির মত গলায় কুসুম বলেছে, 'না।'

'আলো জ্বালবে না?'

'আমার আলোর দরকার নেই।' হাত বাড়িয়ে প্রমথর চুল ছুঁয়েছে কুসুম, চোখের পাতায় নরম দু'টি আঙুল রেখেছে। তারপর নাক, ঠোঁটে গলা পেরিয়ে হাত রেখেছে রোমশ বুকে, সজোরে আঁকড়ে ধরে ঘ্রাণ নিয়েছে। নিঃশব্দ থর থর পরীক্ষা সাঙ্গ হলে বলেছে, 'তুমি, তুমিই ত। তুমি, তুমি, তুমি।' যেন ওই 'তুমি' কথাটা মন্ত্রের মতো, ওর মধ্যে সব ভরসা লুকোনো আছে।

অনেকপরে কুসুম ধীরে ধীরে বলেছে, 'তবে যে-খবরের কাগজে··· সব মিথ্যে।'

মিথ্যে কেন। ষ্টীমার ডুবিটা সত্যি। সেই ষ্টীমারে প্রমথ ছিল এও ঠিক। সকলের সঙ্গে সেও ছিটকে পড়েছিল জলে, ভাসছিল, ডুবছিল, ফের ভাসছিল। অন্ধকার রাত্রি কী খরস্রোতের টান, সেই টানে কতজন তলিয়ে গেল, আকাশের তারা, যাদের ছায়া-চর থাকে জলের নীচে—ছাড়া সে হিসাব কেউ রাখে না। অনেক দূরে একটা আলোর বিন্দু, মজ্জমান চেতনা নিয়েও প্রমথ বুঝেছে ওই বিন্দু হল তার প্রাণ, প্রাণের প্রতীক ওখানে পৌঁছতে হবে, ওকে ছুঁতে হবে। একটি ইচ্ছার ফলকে সমস্ত শক্তিকে গ্রথিত করে প্রমথ ঘোলা জল ঠেলে সেদিকে এগিয়ে গেছে।

'তারপর?' কুসুম রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছে।

তারপর আর মনে নেই। সেই বিন্দুটা বুঝি ছিল মাঝি-নৌকো, তারা কখন এসে তাকে তুলে নেয়, তাকে এবং আরও ক-জন যাত্রীকে, কিছু মনে নেই। ভোরবেলা মাঝিরা তাদের পৌঁছে দিয়েছে পাড়ে, তার কাছাকাছি কোন রেল স্টেশন নেই। কিন্তু একটা গঞ্জ আছে

মাঝিরা গরম দুধ দিয়েছিল, দয়াপরবশ হয়ে একটা ধুতি দিয়েছিল পরতে ; গঞ্জের ডাক্তারবাবু ওকে একদিন হাসপাতালে রেখে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রমথ বাড়ি ফেরবার জন্যে ব্যাকুল, কিছুতেই রাজি হয়নি। ডাক্তারের কাছে কিছু পয়সা চেয়ে নিয়ে বাসে উঠে বসেছে। তারপর কী করে নানা শহরে-বাজারে বাস-বদল করতে করতে বাড়ী এসে পৌঁছল, সে এক দীর্ঘ কাহিনী। সবটা সবিস্তারে বলল না প্রমথ।—'আজ আমি বড় ক্লান্ত। কাল শুনো, সকালে সবাইকে ডেকে যখন যমের দুয়ার থেকে মানুষ-ফেরার গল্প বলে তাক লাগিয়ে দেব, তখন। কেমন?'

কুসুম ধরা ধরা গলায় বলেছে, 'শুনে আমার দরকারও নেই। তুমি ফিরে এসেছ এই ঢের।'

হাত বাড়িয়ে হঠাৎ আলোটা জ্বেলে দিয়েছে প্রমথ। কুসুমের পূর্ণায়ত চোখে চোখ রেখে বলেছে, 'তুমি বুঝি আজ সারাদিন কেঁদেছ?'

'বা-রে, কাঁদব না?' কুসুম অবাক হয়ে অনর্গল গলায় বলে গেছে 'তুমি কী-যে। জানো, খবরটা শুনেই বটঠাকুর পাটনা রওনা হয়ে গেছেন? বড়দি মেজদি ওঁরা সারা দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা আমাকে আগলে রেখেছেন, মাথা তুলতে দেননি ; সংসারের সব কাজ আজ ওঁরাই হাতে হাতে সেরেছেন, আমাকে কিছু ছুঁতে হয়নি, জানো?'

'তবে ত তোমার আজ ছুটি গেছে।' প্রমথ ঠাট্টার সুরে বলেছে।

'ছুটিই তো?'

এরপরেই সেই কঠিন পরীক্ষাটা এসেছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কেটে গেলে প্রমথ হঠাৎ ওর মুখখানা দু'হাতে টেনে নিয়ে বলেছে, 'সারাদিন অনেক ত কেঁদেছ কুসুম, এবারে একটু হাস।'

'হাসব? আচ্ছা হাসি।' কিন্তু সেই মুহূর্তে কী মনে পড়ে গেছে থর থর করে কেঁপে উঠেছে সারা শরীর, চেষ্টা করেও কুসুম হাসতে পারেনি। চোখের কোলে জল এসেছে, ঠোঁট, চিবুক, চোয়াল

বেঁকে তুমড়ে কঠিন হয়ে গেছে, কিন্তু এক রতি হাসি ফোটেনি। অক্ষমতায়, লজ্জায় করুণ মুখচ্ছবি তুহাত ঢেকে কুসুম কোনোমতে বলেছে, 'আলো নিবিয়ে দাও।'

তারপর, অন্ধকার ঘরে একটি মেয়ের পাশে শুয়ে শ্রান্ত প্রমথ অনেক—অনেকক্ষণ ধরে তার অবিরল কান্নার ধ্বনি শুনেছে। মাথায় পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিয়েও সেই কান্না থামাতে পারেনি, প্রমথ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে।

আবহাওয়াটা লঘু করে দিতেই হয়ত এক সময়ে বলে উঠেছে, 'এতক্ষণে বুঝেছি। ভেবেছিলে আপদ গেছে। আমি আবার ফিরে এসেছি এটা তোমার ভাল লাগছে না, তাই কাঁদছ, না ?'

প্রমথর মুখে হাত-চাপা দিয়ে কুসুম ভিজে গলায় বলেছে, 'ছি।'

'তবে কাল থেকে ফের সংসারের সব খাটুনির ভার এসে ঘাড়ে পড়বে, সেই ভয়ে বুঝি ?'

কুসুম আবার বলেছে, 'ছি। তুমি কি আমাকে এমনই ভাব ?'

প্রমথ এবার অস্থির, রূঢ় কণ্ঠে বলে উঠেছে, 'তবে কী, তবে কী। কেন এই অর্থহীন কান্না।'

কুসুম কিছু বলেনি। বলতে চেয়েও পারেনি। গুছিয়ে বলতে শেখেনি বলেই পারেনি। যদি বলে, সে কাঁদছে বড়-জা, মেজ-জা আর মানসীর কথা ভেবে। তাহলে প্রমথ কি বুঝবে, না বিশ্বাস করবে ?

অথচ সত্যিই তাই। কুসুম আজই প্রথম জেনেছে, পৃথিবীর লোক ভালোও হতে পারে। এমন কি, যে মানুষগুলো খারাপ, সময়ে সময়ে তারাও আলাদা হয়ে যায় ; অন্যের শোকে কাঁদে, পাশে এসে দাঁড়ায়। যেমন আজ বড়দি মেজদিরা দাঁড়িয়েছিল। কুসুম কেঁদেছে এই জানার আনন্দে।

আবার তুঃখেও। আলাদাই হল যদি, এত অল্প সময়ের জন্যে হল কেন। মাত্র একদিনের জন্যে কেন। সংসারের খাটুনির ভয়ে

নয়, রাত পোহাতেই যে মানুষগুলো আবার সেই সামান্য আর হিংসুটে আর ছোট হয়ে যাবে, তাদের করুণা করেও কুসুম কেঁদেছে।

কিন্তু এসব কথা বুঝিয়ে বলা ত সহজ নয়। কেঁদে কেঁদেই সে একটি কান্নার মানে বলতে চেয়েছে কি সাধে।

পরমায়ু

হাওড়া ইস্টিশনে গাড়ি দাঁড়াতেই প্রথমে কুলি পরে হোটেলের দালালেরা ছেঁকে ধরেছিল, ঠিক দশ বছর আগেও যেমন ধরত, তেমনই পায়ে-পায়ে-ঠোক্কর, ভিড, কানে তালা-লাগা শোরগোল। একটু বেশি বই কম নয়। তবু গেটে টিকিটটি সঁপে বাইরে পা দিয়েই সুরপতি নিজেকে বড় একা বোধ করেছিলেন। ম্যামথ কঙ্কাল ব্রীজটার নীচে ভাগীরথী যথাপূর্ব পুণ্যদায়িনী, পণ্যবাহিনী; উপরের ধোঁয়াঘোলাটে আকাশটুকুও চিনতে পারছেন ঠিক। তবু সুরপতি মৃদু গলায় নিজেকে বললেন, "কিছুই আসলে তখনকার মতো নেই।" মোড়ে মোড়ে এমন লালচোখ আলোর ধমক কি তখন ছিল, না দূরে দূরে এত আকাশলেহী বাড়ি। সেকালের ঠিলহিলে পিছল-কেঁচো গলিগুলিও কেমন উদার হৃদয় হয়ে গেছে দেখ।

প্যাঁক প্যাঁক ট্যাক্‌সিকে কেবলই ডাইনে বাঁয়ে ঘোরার নির্দেশ দিয়েছেন, আর মনে মনে ভয় পেয়েছেন, সেই পীতাম্বর সাহা লেনটিকে বোধহয় খুঁজে পাবেন না। ভারি ভারি উৎসাহী শহর-সংস্কারক রোলারের তলায় সে হয়ত কবে গুঁড়িয়ে গেছে। ঝুঁকে পড়ে সুরপতি এদিক ওদিক দেখেছেন, আর সন্দিগ্ধ হয়রান ট্যাক্‌সি-ওয়ালাকে ভরসা দিয়েছে, "আর একটু আরও একটু।"

অবাক ব্যাপার, কী এক সুকৃতির জোরে পীতাম্বর সাহা লেনটি বেঁচে গেছে। আর দশ বছর আগে জীর্ণবাসের মতো যাকে ত্যাগ করে গিয়েছিলেন, সেই মেস-বাড়িটিও। ট্যাক্‌সিকে ভাড়া চুকিয়ে দিলেন আগে, সামান্যই সামান, নামিয়ে নিতে অসুবিধে হল না। তারপর কড়া নাড়লেন।

ছাইমাখা হাতের পিঠ দিয়ে যে ঝি দরজা খুলে দিল, তাকে সুরপতি চেনেন না, অন্তত তাঁর আমলে দেখেননি। জিজ্ঞাসা করলেন, "অনুকূলবাবুর মেস ত?" কম কথার মানুষ ঝি, আঙুল দিয়ে অফিসঘর দেখিয়ে দিল। একটা চাকর সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে নেমে আসছিল, সেও নতুন। অফিস ঘরের বাঁধানো কালীর পটটা ধুলো আর ঝুলে ভরে গেছে ; কাচও ভাঙা তবু চেনা যায়। কমলেকামিনী ক্যালেণ্ডারটা অবশ্য তখন ছিল না। টেবিলের উপরে দু'পা তুলে দিয়ে যিনি নাকে সর্গম তুলছিলেন, তিনি সুরপতিবাবুর পায়ের সাড়ায় চোখ মেলে তাকালেন। পা দু'টি নামিয়ে নিলেন তাড়াতাড়ি। "কী চান?"

নাকে যার মেঘডম্বর, তার গলার আওয়াজ এত মিহি কী করে হয়, এই প্রশ্নের মীমাংসা নিয়ে সুরপতিবাবু তখনই যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেননি, তার কারণ তখনও এখানে আশ্রয় পাবেন কিনা, তার নিশ্চয়তা ছিল না। সুতরাং ক্ষীণতর কণ্ঠে বলেছেন, "অনুকূলবাবুর মেস? এখানে সীট পাওয়া যাবে? ক'দিন থাকতে চাই।" শ্রোতার মুখের একটি রেখাও স্থানচ্যুত হল না দেখে তাড়াতাড়ি জুড়ে দিয়েছেন, "অনুকূলবাবুকে আমি চিনি। এখানে আমি অনেক দিন আগে থেকে গেছি। আমার নাম সুরপতি চৌধুরী।"

ভেবেছিলেন, নামটা শুনে লোকটা হয়ত চকিত চোখে তাকাবে, শ্রদ্ধায় সমীহে চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বলবে, বসুন। আশানুরূপ ভাব বৈলক্ষণ্য দেখতে পেলেন না। লোকটি নিরুত্তরে শুধু একটা খাতা ঠেলে দিয়ে বলল, "সই করুন। পেশা, বর্তমান ঠিকানা, এ সবও লিখবেন। রুলটানা ঘর আছে, দেখে নিন।"

পেশার ঘরে লিখতে পারতেন 'ব্যবসা' তবু কী ভেবে সুরপতি লিখলেন 'লেখক'। লোকটার মুখে তবু বিস্ময়ের চিহ্নমাত্র নেই। কতকটা ওকে শুনিয়ে, কতকটা নিজের মনে মনে বললেন, "সবই কেমন বদলে গেছে, না? পুরনো বোর্ডার কি একজনও নেই?"

কথাটা নিজের কানেই কেমন বোকা-বোকা শোনাল; সেটা ঢাকা দিতেই সুরপতি যেন আরও একটু বোকার মতো হাসলেন, "কালীর পটটা কিন্তু ঠিক আছে। অনুকূল বাবু এখনও দু'বেলা জপ করেন?"

সে কথার জবাব না দিয়ে লোকটা গম্ভীর গলায় বললে, "পাঁচ টাকা অ্যাডভান্স।" ঘন্টা বাজিয়ে চাকরটাকে ডেকে হুকুম দিলে, "মাল দোতলায় ছ নম্বর ঘরে তুলে দে।"

অনুকূলবাবু চিনছেন ঠিক। অফিস-ফেরত খাতায় নাম দেখে সোজা উঠে এসেছেন উপরে। আগেকার তুলনায় কিছু শীর্ণ, একটু বা ময়লা। হাসলেন, দেখা গেল দু'টি দাঁতও খুইয়েছেন। বললেন, "তাইত বলি, কে। ভাগনে বললে, পুরনো বোর্ডার। তাও ত এই সবে বছর দুই হল দেশ থেকে এসেছে, আপনাদের দেখেনি। শুধু ওই 'লেখক' কথাটি লিখেই যা ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিলেন মশাই।"

"কেন, আমি কি লেখক নই?" ভয়ে ভয়ে, কতকটা আত্মপরিচয় দেবার কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে, সুরপতি বললেন, "আপনার কিছু মনে থাকে না অনুকূল বাবু। এই মেসে বসেই তিনটে বই—।"

"মনে থাকবে না কেন, আছে। যাবার আগেও মেসের এই ঘরটিতেই ছিলেন। রেলে চাকরি পেলেন, তিন মাসের মাথায় বদলি। আমাদের সবাইকে জোর ফীসট্ দিয়েছিলেন, বলছেন, মনে নেই? এ-শর্মার সব মনে থাকে সুরপতিবাবু। কত বোর্ডার এই ত্রিশ বছর এল গেল, কাউকে ভুলিনি। এখনও সবাইকে ডেকে বলি, তোরা এক টুকরো মাছের ভাগ কম হলে চেঁচিয়ে মাথা ফাটাস, জানা আছে কে কোন্ লাটের বেটা। এই মেসেই আগে অনেক বড়ো বড়ো চাকুরে থেকে গেছে, এখানকার ঝোলভাত খেয়ে অনেকে অফিসার হয়েছে, তারা কোনদিন টুঁ শব্দটি করেনি। অনুকূল সম্মার মেসের ভাতের অনেক পয়।" অনুকূলবাবু সহসা উঁচু গ্রামে একটি হাসি ধরলেন,

তার তরঙ্গ দেয়ালে দেয়ালে ঠোক্কর খেল। দু'পা পিছিয়ে দাঁড়ালেন সুরপতি, হাসির গমকে এই কোনোমতে মেরামতি খাড়া বাড়িটির চুনবালি না খসে পড়ে। সে-হাসি সংবরণও করলেন অনুকূল নিজেই। উচ্চতম শিখর থেকে খসে কণ্ঠস্বর একেবারে গুহাহিত হল : "এখনও সেই কাজই করছেন? নিশ্চয়ই এতদিনে গেজেটেড হয়েছেন?"

কেমন অস্বস্তি বোধ করছিলেন সুরপতি, প্রসঙ্গটা চাপা দিতে তাড়াতাড়ি বললেন, "কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি এখন ব্যবসা করছি অনুকূল বাবু। রেলেরই ঠিকেদারি।"

ভুরু কপালে উঠে গিয়ে অনুকূলবাবুর চোখ দু'টি আপনা থেকে যেন গোল হয়ে গেল।—"ওরে বাবা, তবে ত আপনি এখন আমাদের নাগালের বাইরে, নইলে বলতুম আমার ভাগনেটাকে কোথাও ঢুকিয়ে দিতে। বলছেন সে-ক্ষমতা আপনার নেই? জানি সুরপতিবাবু, চিরকালই আপনি এমনি লাজুক, নিজেকে কিছুতেই বড়ো বলবেন না। এত ওপরে উঠেছেন, আপনার হ্যাট-কোট-বুট দেখেই বুঝতে পারছি, তবু তেমনি রয়ে গেছেন। দেখেছেন আপনার কথা কিছুই-ভুলিনি, স্বভাবটুকুও মনে করে রেখেছি।"

"বিশ্রাম করুন", বলে অনুকূল বাবু একটু পরে উঠে গেছেন, তবু সুরপতি পোশাক না ছেড়ে অনেকক্ষণ খাটে পা ঝুলিয়ে তেমনি বসে থেকেছেন। দেয়ালে পানের পিকের দাগ, বিলিতী মাটি চটে-যাওয়া মেঝে, দরজার কোণে অধ্যবসায়ী মাকড়শার সূক্ষ্ম কারুকর্ম—সব আচ্ছন্ন ক্লান্ত চোখের সামনে ধীরে ধীরে একটি একাকার অবয়ব হয়ে উঠেছে, চোখের পাতা বুঁজে আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছেন সুরপতি। কিছুই ভোলেননি, এ-কথা অনুকূলবাবু বারবার তারস্বরে ঘোষণা করে গেছেন, তবু একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মনের নীচতলা থেকে এই ভয়টা উঠে এসেছে, সে দিনের কথাই বুঝি অনুকূল বাবুর মনে নেই। এই ঘরে বসে একদিন তার লেখা নাটকের পুরো তিনটি অঙ্ক পড়ে শুনিয়েছিলেন, উদাত্ত—অনুদাত্ত-স্বরিত স্বরে,

সে সব না হয় ভুলে গেছেন, কিন্তু তাঁর একটি উপন্যাস যে অনুকূলবাবুকে উৎসর্গ করেছিলেন তাও কি মনে নেই ?

কতক্ষণ চুপচাপ চোখ বুঁজে ছিলেন হুঁশ নেই, হঠাৎ টুপ করে একটা আওয়াজ হতেই সুরপতি ধড়মড় করে উঠে বসলেন। উপরের কড়িকাঠ অর্ধেকটা উইয়ে খেয়ে গেছে, একটা তড়বড়ে টিকটিকি সেটা টপকাতে গিয়ে খসে গিয়ে থাকবে। পড়েই তরতর দৌড়, কিন্তু লেজটা রেখে গেছে এখানেই, সুরপতির বালিশটার ঠিক পাশেই। তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে তিনি টিকটিকিটাকে চেপে ধরেছিল কিনা, ঠিক খেয়াল করতে পারলেন না সুরপতি, কিন্তু ধরে থাকতে পারেন এই সন্দেহে গায়ে কেমন কাঁটা দিল, যে-হাতটা বালিশে রেখেছিলেন সেটা যেন বশে নেই। হেঁট হয়ে সুরপতি সোজা পডতে শুরু করলেন, হাতড়ে খাটের নীচে থেকে জুতে জোড়াকেও টেনে আনলেন ঠিক। তাই ত, বড়ো দেরি হয়ে গেছে। এখুনি অফিসারের বাড়ি দৌড়োতে হবে পাঁচ নম্বর স্কীমের ঠিকেটার জন্যে, যে-তদ্বিরে এতদূর এসেছেন। ঘড়িতে সময় দেখলেন, সাড়ে ছ-টা। এরই মধ্যে এখানে দিন ফুরিয়ে যায় ? এই ত একটু আগে খাটের পায়ার কাছে সে বসেছিল, শেষবেলার নরম এক টুকরো রোদ, পা গুটিয়ে ছোট মেয়েটির মতো। তাকে পাহারা রেখে সুরপতি চোখ বুঁজেছিলেন। আর যেই চোখ বোঁজা অমনি সঙ্গে সঙ্গে সে পালিয়েছে, একছুটে হয়ত সিঁড়ি টপকে, হয়ত জানালা গলিয়ে। এ-ঘরে শুধু একমুঠো অন্ধকার তার পায়ের ধুলোর মত পড়ে আছে।

খুট করে ফের শব্দ হল, চাকর চা এনেছে, আলো জ্বেলেছে। গায়ে কোট চড়াতে চড়াতে সুরপতি ঘর্ঘর গলায় তাকে বললেন,

"এখানে রেখে যাও।" দেওয়ালের পেরেকে হাত আয়না ঝুলিয়ে সুরপিত সোজা হয়ে সামনে দাঁড়ালেন। দশ বছর আগে এই ঘরে যে যুবকটি কেরাণী গিরির ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য সাধনা করত, আয়নার আয়ায় তাকে দেখতে পাবেন এ-দুরাশা ছিল না, যদিও সেই পুরোনো

পরিচিত পরিবেশ স্যাঁতসেঁতে দেয়ালে চামচিকে গন্ধ, তবু নিজের হাতে কাচা পাঞ্জাবি-পরা সেই উজ্জ্বল চোখ ছেলেটি দেখা দিল না। সুরপতি যাকে দেখলেন, তার সিঁথির দুপাশে চুল বিরল, কানের উপরটা রুপোলী। গলায় ঝকঝকে মসৃণ-ভাঁজ টাই; চোখ দু'টি ছাড়া বাকী সবটুকুই তার উজ্জ্বল। মামুলি ছবি, জীবনে সফল প্রৌঢ়ের।

হ্যারিসন রোডের মোড়ে বাসটা যদি অতক্ষণ না দাঁড়াত, তবে কী হত বলা যায় না। সুরপতির হয়ত খেয়ালই হত না, একদা অতি পরিচিত বইয়ের দোকানের সারি পিছনে ফেলে যাচ্ছেন ফুটপাতে, রেলিঙের ধারে তখনকার মতোই ভিড়, কাটা কাপড় আর পুরনো বইয়ের দোকানের সারি, বাস থেকে সেখানে নেমে একবার থমকে দাঁড়িয়েছেন সুরপতি, রকমারি বেসাতির ওপর চোখ বুলিয়েছেন, কিন্তু দাঁড়াননি, তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে গেছেন ও ধারে, যেখানে কাচের শো-কেসের আড়ালে নয়নাভিরাম নতুন বইয়ের প্রদর্শনী। সেখানে এক মিনিট দাঁড়ালেন, কাচ ঘষে নিলেন চশমার, নামগুলো একবার পড়লেন। বেশির ভাগই নতুন নাম, তবু ওরই মধ্যে দু-একটা সুরপতির চেনা। ভিতরে গেলেন, সেখানেও কাউন্টারে অজস্র বই ছড়ানো, কেনাবেচার ভিড়। গলদ-ঘর্ম কয়েকটি লোক ক্যাশমেমো কাটছে, আরও বই বয়ে আনছে। আরো, আরো।

"প্রলয়বীণা কী রকম টানছে দেখেছিস।"

"আর সাতটা দিন যেতে দে, দেখবি এডিশন কাবার।" কাউন্টারের ও পাশে ওরা বলাবলি করছিল, সুরপতি শুনতে পেলেন।

এপাশ থেকেও কয়েকজন ক্রেতা আরেকটা বইয়ের নাম বারবার চেঁচিয়ে বলছিল, "মন-আগুন।"

"'মন-আগুন,' 'মন-আগুন' দু'কপি"—কাউন্টারের ওদিকে প্রতিধ্বনি উঠল। বইও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এল। একটি লকলকে

শিখা সমগ্র বইটিকে বেষ্টন করে আছে। এক কোণে পরিপাটি হরফে লেখক আর বইয়ের নাম। এমন সুদৃশ্য প্রচ্ছদ সুরপতির চোখে বেশি পড়েনি। লোভ হল হাত বাড়িয়ে বইটি স্পর্শ করেন। করলেনও। পাতা উলটে গেলেন। আসল বইটা যেখানে শুরু তার আগেকার কয়েকটা পৃষ্ঠাই একরকম সাদা। কোনটাতে বইয়ের নাম লেখা আছে, কোনটাতে লেখকের। একটা জায়গায় প্রথম প্রকাশের তারিখের নীচে সুরপতি দেখতে পেলেন, বড়ো বড়ো হরফে লেখা, দশম মুদ্রণ। দশম!

আর ঠিক তখনই সুরপতি ছেলেমানুষের মত একটা কাজ করে বসলেন। গলা খাঁকারি দিয়ে একবার ঝেড়ে নিলেন, তারপর স্পষ্ট, একটুও না-কাঁপা স্বরে, জিজ্ঞাসা করলেন "'জোয়ারের জল' আছে? 'জোয়ারের জল' দিতে পারেন এক কপি?"

কাউনটারের ওপাশে ওরা এ ওর মুখের দিকে তাকাল। কেটে গেল কয়েক সেকেণ্ড। আবার চাইবেন কিনা সুরপতি ভাবছেন, ওদেরই একজনকে ঢোক গিলে বলতে শুনলেন, "'জোয়ারের জল' কী বললেন, 'জোয়ারের জল'?"

কপট বিনয়ে সুরপতি বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। বইয়েব দোকানে কাজ করছেন অথচ এ বইয়ের নামও শোনেননি?"

সে-লোকটি পিছিয়ে গেল কিংবা তাকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে এল আরেকজন। "'জোয়ারের জল'? লেখকের নামটা বলতে পারেন?"

দোকানে আয়না নেই, সুতরাং মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল কিনা সুরপতি দেখতে পেলেন না! সামলে নিয়ে, ধীরে কিন্তু দৃঢ়স্বরে বললেন, "লেখকের নাম সুরপতি চৌধুরী।" অন্য খরিদ্দার দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ছেলেটি বলল, "না, ওনামে কোন বই ছাপা নেই।" অজ্ঞতার লজ্জা নয়, সুরপতি তার মুখে অবহেলার হাসি দেখলেন। "পাশের দোকানে খোঁজ করতে পারেন।" উপদেশ

দিয়েই ছেলেটি হাঁক দিল, "'প্রলয়বীণা' দু' কপি, 'মন-আগুন' তিন।"

তারপর সারা বিকেল জুড়ে সুরপতি সেদিন শুধু দোকানে দোকানে ঘুরেছেন। 'জোয়ারের জল' আছে দিতে পারেন এক কপি? 'ত্রিপূর্ণির ঘাট'? 'রাত শেষের খেয়া'? নেই? সুরপতি চৌধুরীর কোন বই নেই? সবাই বলেছে, না। এক দোকানে কে একজন বুঝি নামটা চিনতে পেরে বলেছে, "ওসব বই এখন আর ছাপা হয় না মশাই। চাহিদা নেই। আমরাও রাখি না। নতুন কিছু চান ত বলুন, বের করে দিই।"

এক দোকানে শিক্ষিত, অন্তত দেখে সুরপতির তা-ই মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক বসেছিলেন। 'রাতশেষের খেয়া' বইটির নাম শুনে হেসে হাই তুললেন। "ছিল মশাই লাষ্ট কপি, শেলফের নীচের তাকে অনেক দিন ধুলোবালি মেখে পড়েছিল। মাস ছ'য়েক আগে একজন প্রবীন অধ্যাপক খোঁজ করে কিনে নিয়ে গেছেন। বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃতি অধ্যায়ের উপর কোন থীসিস লিখে ডক্টরেট হাতাবার ফিকিরে আছেন কিনা খবর নিয়ে দেখুন গে যান।"

সেখান থেকে সুরপতি গেছেন পিছনের গলিতে। এখানে অনেক প্রকাশক, অনেকেই তাঁর চেনা, একটি দোকানের সাইনবোর্ড দেখেই চিনলেন, তাঁর 'জোয়ারের-জল'-এর প্রকাশক ত এরাই। একটি টেবিলে ঘিরে কয়েকজন বসে। সকলেরই মোটামুটি কম বয়স, অন্তত রাতের আলোতে তাই মনে হল। কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মার্জিত করে সুরপতি বললেন, "অপূর্ববাবু আছেন?"

যারা বসে ছিল তাদের সবাই একসঙ্গে ফিরে তাকাল। একজন বললেন, "অপূর্ববাবু ত রিটায়ার করেছেন, বিজনেস এখন দেখেছেন ইনি, তাঁর ছেলে নিশীথবাবু। এর সঙ্গে কথা বলুন।"

আঙুল দিয়ে যাকে দেখান হল, সিগারেট আর চায়ের ধোঁয়ায় তার মুখের আধখানা ঢাকা, তবু অপূর্ববাবুর সঙ্গে তার চেহারার মিল

সুরপতি সহজেই খুঁজে পেলেন। তাঁর নিজে থেকেই বোঝা উচিত ছিল। নমস্কার করে ধপ করে বসে পড়লেন একটা চেয়ারে, অনুরোধ না হতেই। ঘুরে ঘুরে ঘেমেছিলেন, ঘাড়ে গলায় একবার রুমাল বুলিয়ে নিলেন। নিশীথ চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে বসল ওঁর মুখোমুখি। একটা সিগারেট ধরাল নিজে, একটা বাড়িয়ে দিলে ওঁর দিকে, দেশলাই নেবাতে নেবাতে বলল, "মফস্বলের লাইব্রেরি বুঝি? কত টাকার বই নেবেন?"

আর কথা বাড়ানো বা দেরি করা চলে না, সুরপতি মরীয়ার মতো গলায় বললেন, "আমি সুরপতি চৌধুরী।"

আশ্চর্য, এই প্রথমবার যেন মনে হল, নামটায় কাজ দিয়েছে। ওদের চোখে চোখে কী কথা হল সুরপতি বুঝলেন না, কিন্তু একজনকে বলতে শুনলেন, "আপনি আগে লিখতেন, না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এখান থেকেই আমার দু'খানা বই বেরিয়েছিল।" বলতে বলতে সুরপতি সীলিঙের দিকে চাইলেন, যেন হিসেব করলেন, "বার আর পনের বছর আগে।" নিশীথের দিকে ঝুঁকে পড়ে সাগ্রহ গলায় বললেন, "সে-সব বই এখন আর কেউ পড়ে না, ছাপাও নেই, না?"

"ক-বে ফুরিয়েছে।" হাল্কা, তাচ্ছিল্যভরা গলায় নিশীথকে বলতে শুনলেন, "সেই বাবার আমলেই। সব বোধ হয় বিক্রি হয়নি। কেন, আপনার অ্যাকাউণ্ট ত বাবাই—"

"হিসাবে নিতে আসিনি, বলছিলুম কি বইগুলো যদি আবার—"

"ছাপতে বলছেন?" অসহায়ের মতো মুখভঙ্গি করে নিশীথ একটার পর একটা ধোঁয়ার বলয় রচনা করে গেল।—"কিন্তু এখন যে অনেক অসুবিধে। এই দেখুন না দশটা বই প্রেসে পড়ে আছে, চালু বইই বাজারে দিতে পারছি না, এখনকার ব্যবসায়ে কী যে ঝামেলা—"

"পরে ছাপবেন?" অকাম্পত নিলর্জ্জ, প্রায় প্রার্থনার সুরে সুরপতি জিজ্ঞাসা করলেন।

ঠোঁটে সিগারেট, নিশীথের গলা তাই বুঝি কেমন ধরা-ধরা শোনাল, "করে ছাপব ঠিক কথা দিতে পারছিনে যে। দেখুন না এঁদের কাছেই অপরাধী হয়ে আছি, এখনকার সেরা দু'জন লেখক এখানে বসে আছেন। সর্বেশ মুখুজ্যে, 'মন-আগুন'-এর লেখক। দশ হাজার বই দেড় বছরে কেটে গেছে, লোকে ওঁর নতুন বই চায়। সেটা আমরা নিয়েছি, কিন্তু দপ্তরী আজও বেঁধে এনে দিল না। কী করি বলুন। ইনি সুবীর মিত্র, সিনেমায় হীট বই 'জীবনদোলা, দেখেছেন, তার লেখক। এখন টালিগঞ্জ ছাড়ছে না, ওদিকে বোম্বাই থেকে ডাকছে। যমে-মানুষে টানাটানি লোকে বলে না? এ ঠিক তাই। 'জীবনদোলা'র বাইশর এডিশন ফুরিয়ে গেছে, বাজারে নেই বলে ইনি মুখ ভার করে বসে আছেন।"

অনাসক্ত গলায় সুরপতি বলেছেন, "ও"। চশমার পুরু কাচের আড়ালে ওঁর চোখের পাতা ঘনঘন পড়েছে, ওরা দেখতে পায়নি। চেয়ারটা আরও কাছে নিয়ে এসেছে নিশীথ, অতিবিনীত গলায় বলেছে, "এইত অবস্থা। তার চেয়ে আমি বলি কী সুরপতি বাবু, আপনার বই তুলে নিয়ে আপনি অন্য কোনও ঘরে দিন। আমরা কবে ছাপতে পারব ঠিক নেই, কেন খামোখা নিজের লোকশান করবেন।"

"লোকশান, লোকশান," মৃদুস্বরে সুরপতি যেন নিজেকে একবার শোনালেন, তারপর মূর্খের মত হঠাৎ জোর গলায় হেসে বললেন, "আমার আর লাভ কতটুকু বেঁচেছে নিশীথ বাবু, যে লোকশানকে ভয় পাব।"

কোনোমতে শুকনো একটা নমস্কার সেরে সুরপতি পথে নেমে এসেছেন। দু'পাশে সেই বইয়ের দোকানের সারি। নতুন নাম, নতুন বই, সংখ্যা কত সুরপতি হিসেব করেও বলতে পারবেন না। পুরো তালিকা একমাত্র তাঁর কাছেই আছে, কালের কাঠের ফলকে সাদা খড়ি দিয়ে নিত্য যিনি নাম লেখেন আর মোছেন।

কিন্তু সে জন্যেই, শুধু সে জন্যই, সুরপতি পরদিনই হাওড়া ইষ্টিশনে

গিয়ে টিকিট কিনে গাড়িতে চড়ে বসেননি। আঘাত পেয়েছিলেন বই কি, কিন্তু কেবল ঘা খেয়েই পালাননি। পালিয়ে ছিলেন অপ্রত্যাশিত পুরস্কারের ভয়ে। সুমিতার বাসায় পরদিন সকালে যদি দেখা করতে না যেতেন, তবে হয়ত অত তাড়াতাড়ি কলকাতা ছেড়ে চলে আসবার কথা ভাবতেন না।

নইলে বই-পাড়ার অভিজ্ঞতার পর মনের সঙ্গে তিনি ত একটা রফা করে নিয়েই ছিলেন। সেদিন মেসে ফেরবার পথে রিক্শায় বসে সুরপতি স্বগত বলেছিলেন, "এরা বড় তাড়াতাড়ি ভোলে। আমি আর কোথাও নেই। মুছে গেছি।" "মুছে গেছি" কথাটাই দু'বার উচ্চারণ করেছিলেন, মন্ত্রের মতো। আর আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে খেদের খাদটুকু উবে গিয়ে মনের নিকষে নতুন ভাবনার সোনার জলের দাগ পড়েছিল। "মুছে গেছি, ক্ষতি নেই," সুরপতি আবার আহত অন্তরকে বলেছেন, "মুছে গেলেই কি সব মিথ্যে হয়। পাহাড় নিত্য, চিরায়ু।" মেঘে মেঘে আকাশে যে ছবি-লেখালেখি হয়, তা ক্ষণায়ু কিন্তু দু'টোই কি সুন্দর, অতএব সত্য নয়। ক্ষণকালেও যা সুন্দর, সত্য, তাও শিল্প, যেমন দিনায়ু কুসুম।"

আর এই প্রবোধ মনে স্নিগ্ধ অবলেপের কাজ করেছে। মেসে ফিরে চুপিচুপি সিঁড়ি বেয়ে উঠেছেন। দরজা ভেজিয়ে দিয়েছেন নিঃশব্দে। খাবার ঢাকা ছিল, ছোঁননি। আলো জ্বালেননি। বালিশে মুখ রেখে ঘ্রাণ নিতে নিতে কখন চোখ জড়িয়ে এসেছে। অনেক দিন আগে দেখা একটি গ্রামের ছেলেকে মনে পড়েছে। মেঝেতে মাদুর ছড়ানো, বুকের নীচে বালিশ, সমুখে লণ্ঠন, কাঁপাকাঁপা শিখা। ছেলেটি কী লিখছে। পাঠশালার অঙ্ক অবশ্যই নয়, তাহলে আরেকটি মেয়ে সেখানে এসে দাঁড়াতেই ছেলেটি খাতাটা লুকোতে চাইত না।

"কী লিখছিলি রে?"

"কিছু না, ছড়া।"

"আমাকে পড়ে শোনাবি?"

"পালা ।"

"তবে মাসিমাকে বলে দিই ?"

বলেনি, মেয়েটি একটু পরে নিজে থেকেই ফিরে এসেছে। "আমাকে নিয়ে ছড়া লিখবি ?"

"তোকে নিয়ে ছড়া হয় না। ভাগ।"

এবার কাঁদো কাঁদো হয়েছে মেয়েটির মুখ, পিছন থেকে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরেছে।

"লেখ না একটা, ইস, কী অহঙ্কার। আমার নামে ছড়া বাঁধ। তোমার লেখায় আমি থাকব না ?"

তোমার লেখায় আমি থাকব না ? জীবনে বারবার নানাজনের মুখে এই আকুতির প্রতিধ্বনি শুনতে হয়েছে। সেই গ্রামের ছেলেটি বড়ো হয়েছে, শহরে এসেছে। অঙ্কের খাতায় লুকোনো ছড়া নামকরা পত্রিকায় কবিতা, কাহিনীর পরিণত রূপ নিয়েছে। কত ঘনিষ্ঠ পরিচয়, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কত ছেলে কতজন তাকে জীবনের কাহিনী শুনিয়েছে। লিখবে তুমি ? লেখনা। এমনি ত মরে আছি, লেখার মধ্যে তবু যদি বেঁচে থাকি। সামান্য মর-মানুষের অমৃতসাধ। কৃতাঞ্জলি প্রার্থনা। সে-প্রার্থনা যথাসাধ্য পূরণ করেছে যুবক সুরপতি। একদিন গ্রামের সহচরীকে নিয়ে যে ছড়া বেঁধেছিল, পরবর্তিকালে সে পরিচিতমাত্রের ভিতরে কাহিনীর কুশীলব খুঁজেছে। যে সর্বত্যাগী বিপ্লবী সতীশদা একদিন তার হাতে তিনটি রিভলভার গচ্ছিত রেখে জেলে গিয়েছিলেন, তাঁকেই সুরপতি চাপা গলায়-উচ্চার্য পাড়ায় নীলিমার ঘরে শেষ নিশ্বাস ফেলতে দেখেছে। সেদিন কিন্তু মনে তাঁর কোন কামনা ছিল না ; এমন কি, দেশকে স্বাধীন করে যেতে পারলেন না বলে আফসোসও না। শুধু সুরপতির হাত ধরে বলেছিলেন, "আমাদের কথা তুই লিখে রাখিস ভাই। বিফলতা আর সাফল্য, সাহস আর দুর্বলতা দুই-ই দেখাস।"

সুরপতি সে-কথা রেখেছিলেন। সেই বৃহৎ ট্রাজেডির কথা লেখা

আছে তাঁর পুরনো আমলের বহু প্রশংসিত একটি দীর্ঘ গল্পে। যা জানেন, যা শুনেছেন, যা দেখেছেন, তা সবই ছিল। এমন কি, শেষ অধ্যায়ের ফকিরচাঁদ লেনের নীলিমাকেও বাদ দেননি।

আজ পীতাম্বর সাহা লেনের বিছানায় শুয়ে শুয়ে সকলকেই মনে পড়ছে, যাদের ব্যর্থ-সার্থক জীবনের কথা সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন সুরপতি। কাশী মিত্তিরের ঘাটের সেই সাধু: ওর হাতে গাঁজার কলকে তুলে দিয়ে যে বলেছে, "লেখ্ বাবা লেখ্। আমাকে যে শেষ করেছে সেই শয়তানীর নামে ঢিঢি পড়িয়ে দে বাবা।" সব ছেড়ে নেংটি মাত্র যে সম্বল করেছে, গল্পে ঠাঁই পাবার লোভ তারও কিন্তু কম ছিল ছিল না। রোজ আসত লুকিয়ে, গাঁজায় দম দিত আর বলত, "জ্বলে মলাম বাবা, পুড়ে মলাম।"

"কেন তুমি শান্তি পাওনি? ভগবানকে পাওনি?"

হাতের বুড়ো আঙুল নেড়ে সাধু বলেছে, "কিছু পাইনি বাবা, কিছু না। শয়তানীটাকে ভুলতে পারলে ত ভগবানকে পাব? তুই ওর সব কথা ফাঁস করে দে রে বাবা, ফাঁস করে দে।"

ময়লাটানা গাড়ীর নীচে চাপা পড়ে সাধু যেদিন মারা যায়, তার আগের দিন কিন্তু সে সুপতির কাছে এসেছিল। ঘামেভেজা বিশ্রী দাড়ি-ঢাকা মুখ সুরপতির কানের কাছে নামিয়ে বলেছিল, "আমি শান্তি পেয়েছি। তুই আর ওর নামে কিছু লিখিসনি বাবা।"

"লিখব না?"

"না"। সাধু ফিসফিস করে বলেছে, "তাকে আজ আমি চাঁদপাল ঘাটে গেরোনের যোগে ভিক্ষে করতে দেখেছি। পাপিষ্ঠার কুষ্ঠ হয়েছে বাবা।"

আরও কত আছে। সকলের কথা আজ রাত পুইয়ে গেলেও ভাবা শেষ হবে না। সুধাদি। চারু। এই মেসের সদানন্দ, যে দেশ-বিদেশে ভ্রমণের কাহিনী সকলকে ডেকে শোনাত, শুধু একবার ঘোর অসুখের সময় সুরপতিকে চুপে চুপে বলেছিল, "আমাকে নিয়ে একটা

গল্প লিখুন। বলুন লিখবেন? সারা জীবন খালি গাইডবুক আর রেলের টাইম টেবিল মুখস্ত করে লোককে ধাপ্পা দিলাম, আসলে কিন্তু ওতোড় পাড়া ছাড়িয়ে যাইনি। আমাদের মতো সামান্য কেরানী যারা তাদের অনেকেই যায় না, যেতে পায় না। এতদিন যত ভ্রমণ শুনিয়েছি, সব ভুয়ো, লিখে দেবেন এ-কথা, তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও লিখবেন যে, আমার নানা দেশ দেখার সাধটুকু কিন্তু খাঁটি ছিল।"

আরও যে কত লোক তাদের জীবনের গোপনতম কথাটি তাকে নিবেদন করেছে। দু'দিনের জীবন নিয়ে চিরদিনের কাহিনী রচনা করুক, সুরপতির কাছে তাদের প্রার্থনা মোট এইটুকু।

গায়ে টিকটিকি পড়েনি, কড়িকাঠ থেকে উইয়ের বাসাও পড়েনি ঝুরঝুর করে, তবু সুরপতি শিউরে উঠলেন। হৃৎপিণ্ড বার বার কুঞ্চিত প্রসারিত হয়ে কণ্ঠতালু অবধি শুকিয়ে ফেলেছে। বুকে চেপে ধরে বালিশটাকে কানে কানে বললেন, "ভুল, সব ভুল। কত অবুঝ ওরা, সাধারণ মানুষ। লেখকের কাছে অমরত্ব চায়, কিন্তু লেখকের নিজের আয়ু ক'দিনের, কেউ ভাবে না ত। মনে রাখে না লেখকও তুচ্ছ মানুষ, তারও মৃত্যু হতে পারে, হয়। যেমন আমি মরেছি।"

"আমি মরেছি।" সুরপতি উচ্চারণ করেছেন ধীরে ধীরে। বালিশের যেখানটায় মুখ রেখেছিলেন সেখানটা সিক্ত হয়ে গেছে, নিঃশব্দে সেটাকে সরিয়ে দিয়েছেন। এই টপটপ নোনতা জলের চিহ্ন কেউ যেন না দেখে, কেউ যেন টের না পায়।

তবু যদি পরদিন সকালে জামাটা ছাড়তে গিয়ে খুচরো পয়সা ঘরময় ছড়িয়ে না পড়ত। কিংবা, পয়সা পড়েছিল ক্ষতি নেই, চিরকুটটা যদি পকেটেই থেকে যেত আর সেই চিরকুটে যদি সুমিতাদের বাসার ঠিকানা লেখা না থাকত। এতগুলো যদির বাধা যখন ঘুচলই, তখন সুরপতি যে ফের জামাটা ফিরিয়ে পরবেন, পথে

রিক্‌শ নেবেন একটা এবং শিবদাস রাহা সেকেণ্ড লেন খুঁজে বের করে ষোলবাই দুই বাই এফ নম্বরের বাড়ির দরজায় টোকা দেবেন, একে প্রায় নিয়তি বলা চলে।

নিয়তি বইকি। নইলে সেদিনই হয়ত সুরপতিকে কলকাতা ছাড়তে হত না।

হাওড়া ইস্টিশনের এলাকা ছাড়বার পর প্রথম শ্রেণীর একটা গাড়ির কামরায় আধশোয়া সুরপতি মনে মনে সেদিন সকাল-বেলাকার ঘটনা আবার রচনা করে নিজেকে শুনিয়েছিলেন। ...দু'একটি রূপোলী চুল সামান্য যা একটু বিভ্রম ঘটিয়ে থাকবে, নইলে টোকা দিতেই যে দরজা খুলে দিয়েছিল হলুদমাখা আঁচল আর কনুইয়ের কাটাদাগ থেকেই তাকে তোমার চেনার কথা। "সুমিতা?" কতকটা ভয়ে, কতকটা ভরসায় জিজ্ঞাসা করেছিলে। সে জবাব দেয়নি, একটু পরে একটি ছোট মেয়ে এসে তোমাকে ডেকে নিয়ে গেছে। বসবার ঘর নয়, এদিক ওদিক তাকালেই বোঝা যায় এটাও শোবার, তাড়াতাড়ি করে এটাকে একটা বসবার ঘরের চেহারা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। অর্থাৎ কোথা থেকে একটা টেবিল টেনে এনে রাখা হয়েছে ঘরের ঠিক মাঝখানে, একমেব চেয়ারও আছে, কিন্তু তুলো ঝুরঝুর তোশকটাকে সরিয়ে ফেলা সম্ভব হয়নি। ছেঁড়া মাদুরটায় লজ্জা নিবারণ করে, সেটাও ঘরের এক কোণে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে আছে। "এই খুকি শোনো।" মেয়েটিকে কাছে ডেকে তুমি আলাপ করতে চেয়েছ। একেবারে ছোট মেয়ে হলে পালিয়ে যেত, কিংবা কিশোরী হলেও, কিন্তু দশ এগার বছরের এই মেয়েটির সঙ্কোচ স্বভাবত কিছু কম, সে একবার ডাকতেই কাছে এসেছে। যথারীতি তার নাম, পড়াশুনার খবর জেনে নেবার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছ, "বলতো আমি কে।" মেয়েটি একবারও না ভেবে বলেছে, "মামা" অবাক হয়েছ বই কি, মেয়েটির সপ্রতিভতায়, না, সম্পর্কের আকস্মিকতায়, বলা যায় না। "মামা? কে বলেছে?"

"বারে, মা বলে দিল যে। তা ছাড়া তুমি ত, আপনি ত লেখেন।"

"লিখি?" (তুমি যে লেখ একথা আর একজনের মুখে কতদিন পরে যে শুনলে!) "লিখি?" জিজ্ঞেসা করলে আবার। "কে বলেছে।"

"আপনার বই আছে যে আমাদের আলমারিতে। মা মাঝে মাঝে খুলে দেখে, মুছে রাখে। একটাতে মার নাম লেখা, আপনি লিখে দিয়েছেন, মা বলেছে। আর দু'টোতে কিন্তু কিছু লেখা নেই। এবার আপনি নাম লিখে দিয়ে যাবেন ত?"

"যাব।" অভিভূত গলায় শুধু একটি কথা বলতে পেরেছ।

আর ঠিক তখনই সুমিতা এসেছে। হলুদ মাখা শাড়িটা বদলাতে পারেনি, কনুইয়ের সেই কাটা দাগটা লুকোতেও না, তবু ওরই মধ্যে যা একটু ফিটফাট। হয়ত তোমার জন্যে চায়ের জল চড়িয়ে কলতলায় গিয়ে ভিজে গামছায় মুখটাই শুধু মুছে আসতে পেরেছে। বয়স হয়েছে বোঝা যায়, তবু শ্রীটুকু পুরোপুরি ঘোচেনি, বিশেষত হাসিটুকু সেই পনের বছর আগেকার।

"অনেক দিন পরে এলে।"

"হ্যাঁ অনেকদিন।" আর কি বলা যায় ভেবে না পেয়ে ওর কথাটাই তুমি ফিরিয়ে দিলে। আর আঁচলে হাত ঘষে ঘষে আঙুলগুলো পর্যন্ত হলদে করে ফেলল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর তুমি নিজেই আবার বলেছ, "কলকাতায় থাকি না ত, তাই সব সময় খবর নেওয়া হয়ে ওঠে না। তোমরা ভাল আছ?" নাম ভুলে গিয়েছিলে বলে সুমিতার স্বামীর কুশল আলাদা করে জিজ্ঞাসা করা হল না।

"ভাল আছি। তুমি যে ভাল আছ দেখতেই পাচ্ছি। হবে না কেন," বিষণ্ণ একটু হাসি জুড়ে দিয়ে সুমিতা বলেছিল, "তোমার এখন অনেক টাকা, দেশজোড়া নাম।"

গরম লাগছিল, তুমি একবার হুকহীন সীলিঙের দিকে অসহায় চোখে তাকালে, তারপর রুমাল বার করলে পকেট থেকে। সুমিতা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা হাতপাখা নিয়ে এল, বোধহয় রান্নাঘর থেকে, কেন না তার ডাটে কয়লার গুঁড়ো লেগেছিল বলে তুমি ধরতে পারলে না। পারলেও অবশ্য সুমিতা পাখাটা তোমার হাতে দিত না, নিজেই হাওয়া করত। "তোমার নিশ্চয়ই আরও অনেক বই বেরিয়েছে, একখানাও ত দাও না। একটা তুমি সেই ষোল বছর আগে দিয়েছিলে, তোমার প্রথম বই। আর দু'টো আমি কিনেছি।"

"কিনেছ!" উৎফুল্ল হয়েও আহত হবার ভান করেছ।

"কিনেছি। দেখবে? এস না এদিকে। এটা আমার বিয়ের পাওয়া আলমারি, কাচ ভেঙেছে, রঙ চটে গেছে, তবে এইটুকুই যা চিহ্ন আছে। অনেক বই পেয়েছিলাম ত, সব গেছে, লোকে পড়তে নিয়ে ফেরত দেয়নি, শুধু এই শরৎ-গ্রন্থাবলীটা কী ভাগ্যে টিকে আছে। এই দেখ।"

ওর দৃষ্টির পিছু পিছু গিয়ে তোমার চোখ দেখেছে, ভাঙা আলমারির কাপড়, পুতুলের স্তূপের ধারে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর পাশে সযত্নে রাখা তোমার তিনখানি বই।

অপরাধীর গলায় সুমিতা বলেছে, "আর কিনতে পারিনি। সংসার বড়ো হয়েছে, নানা অসুখ-বিসুখ। কী করব, ছেলেমেয়েদের তোমার এই তিনখানা বই-ই দেখাই, তোমার মতো হতে বলি।" একটু থেমে সুমিতা ফের জিজ্ঞাসা করেছে, "তোমার আর কী বই বেরিয়েছে বল ত। সিনেমা হয়েছে।"

কাচের আলমারিতে সাজানো তোমার বই দেখার পরে কী নেশাই চোখে লেগেছিল, অনায়াসে তাই বলতে পারলে, "হয়নি, এবার হবে, সেই কনট্র্যাক্ট করতেই ত কলকাতায় আসা।"

"আমরা পাশ পাব ত।" হঠাৎ কী করে মধ্যবয়সী মেয়েটি একেবারে কিশোরী হয়ে গেছে, আবদারের সুরে বলেছে, "আমরা

সবাই যেন পাশ পাই। আর, তোমার নতুন বইগুলো দেবে না?”

“দেব” সম্মোহিতের মত বলেছ, “দেব। নতুন এডিশন সবে ছাপা হয়ে এসেছে। কাল দিয়ে যাব।”

সুমিতার মুখচোখে ছেলেমানুষী খুশি। “কাল আবার আসবে তুমি? তা হলে কী ভালো যে হয়। কাল রবিবার, ওঁর সঙ্গেও দেখা হবে। তুমি এখন অনেক বড়ো, বলতে ভরসা পাইনে, এসে ওই সঙ্গে যদি দু'টি ঝোলভাত—”

অনেকক্ষণ ধরেই একটু একটু করে ঘামছিলে, এরপরে আর বসে থাকতে পারনি, হঠাৎ, এক রকম বিনা নোটিসে, উঠে দাঁড়িয়ে বলেছ, “সে হবে এখন, সে হবে। এখন চলি।”

সুমিতা দরজা অবধি এগিয়ে দিতে এসেছে।

“আরও একটা কথা আছে।”

সবে চৌকাঠের ওদিকে পা দিয়েছিলে, হঠাৎ থেমে গেছ। ঘোমটা কখন খসে গেছে, আরও একটু কাছে এসেছে সুমিতা। “আরও একটা কথা আছে। তুমি বোধহয় শুনে হাসবে, ভাববে ছেলেমানুষী আমার মনে একটা ক্ষোভ রয়ে গেছে কিন্তু। এতজনকে নিয়ে এত কথা লিখলে, আমাদের কথা কোনোটাতে আজও লেখনি।”

ভাঙা সুইচে যেন হাত ঠেকেছে এমন চমকে উঠেছ। সে-চমক কাটিয়ে উঠতে অবশ্য সময় নাওনি। কণ্ঠস্বরে একটু বা পরিহাসের ছোঁয়া লাগিয়ে বলেছ, “সব ক্ষোভ কি শেষে তোমার ছোট্ট এই একটুখানি দুঃখে রূপ নিয়েছে সুমিতা। কিন্তু কী লিখব বল ত?”

কিছু লেপটে-যাওয়া সিঁদুরে, কিছু লজ্জায়, সুমিতার মুখখানা লালচে লাগছে। আড়ষ্ট স্বরে বলেছে, “কেন, আমাদের কথা। তোমার সাহিত্যে এই হলুদমাখা আঁচল আর কনুয়ের কাটা দাগটার কথা লেখা রইলই বা।”

এবার আর পরিহাস নয়, কঠিন গলায় বলেছ, “ভয় করবে না?”

"কিসের ভয় ?"

"কেন ? কলঙ্কের।"

অনেকক্ষণ পরে সুমিতার মুখে চকিত বিদ্যুতের মতো এক ঝিলিক হাসি দেখা গেছে। "সে ভয় থাকলে তোমার হাতে আমার নাম-লেখা বই কি আলমারিতে সবাইকে দেখিয়ে রাখি।"

অপলক সেই চোখের দিকে বেশীক্ষণ চেয়ে থাকতে পারনি। মাথা নিচু করে চলে আসতে যাবে, জামার হাতায় আলগোছ টান লেগে আবার ফিরে তাকিয়েছ। দেখেছ সেই দৃষ্টি আর নেই সুমিতার চোখে, খর রৌদ্র ছায়া-কোমল হয়েছে। গাঢ়, অশ্রুতপ্রায় গলায় সুমিতাকে বলতে শুনেছ, "আর শোন, যদি কিছু লেখ তবে তাতে আমার ডাকনামটাই দিও,—ঝিনুক। বাপের বাড়িতে যে-নাম ছিল। ও-নামে এখানে কেউ ডাকে না।"

কামরার বাইরে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিপরীত দিকে দ্রুত-সরন্ত গাছপালা, তারের খুঁটির দিকে চোখ রেখে সুরপতি আবার আপনাকে বললেন, "এর পরে এক বেলাও কলকাতায় থাকা তোমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বইয়ের বাজারে যা-লেবে-তা দু-টাকার নিলাম তোমার দেউলে হবার খবর কি এক আশ্চর্য কারণে শিবদাস রাহা সেকেণ্ড লেনের একটি অধিবাসিনীর কাছে অজানা থেকে গেছে। সেখানে আলমারিতে শরৎচন্দ্রের বইয়ের পাশেই তুমি! কিন্তু আর দু'দিন থাকলে কি কিছু জানাজানি হত না! পরদিন সকালে সুমিতার বাসায় খালি হাতেই ত যেতে হত। গিয়ে কী কৈফিয়ত দিতে। প্রাণ গেলেও কি তাকে বলতে পারতে লেখক সুরপতি মরে গেছে? তার বই আর কোনদিন ছাপা হবে না? হয়ত মুগ্ধ একটি মেয়ের নির্জলা স্তুতি শুনতে শুনতে তোমার নিজের বিবেকই মাথা

তুলে দাঁড়াত, দুর্বল কোনো মুহূর্তে স্বীকার করে বসতে, নতুন বই নয়, ছায়াছবির চুক্তি নয়, শুধু রেলের ঠিকেদারির তদ্বির করতেই দূর প্রবাস থেকে এতদূরে এসেছ। সত্যের রোমশ হাত থেকে একটি মিথ্যাকে বাঁচাতে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছ সুরপতি, ভালোই করেছ।”

মনে মনে

এখানে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়াটুকুই যা বানানো গল্পের মতো ঠেকতে পারে; নইলে ঘটনাটা সত্যি হতে সত্যিই কোনো বাধা ছিলনা।

প্রাচীনকালের লেখকদের হাতে এর চেয়েও ঢের অসম্ভব ব্যাপার ঘটেছে। ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়া হঠাৎ খেপে গেছে। পাহাড়ে-পথে মোটরের ব্রেক গেছে বিকল হয়ে।

গল্প জমাতে হলে অমন একটু আধটু জোড়া দিতে হয়। রাতের সব তারাই থাকে দিনের আলোর গভীরে, কিন্তু ট্রেনের কামরায় পূর্ব পরিচিতাকে সে কথা বলবার সুযোগ ক'জন পায়।

পায় না, আসল জীবনে দেখাই হয় না। হলে চেনে না। চিনলেও কথা বলতে ভরসা হয় না। হলে, ছেলে-পুলে, পেনসন ইত্যাদির খবর বিনিময় হয়।

বিধাতার এই এক আশ্চর্য খেয়াল। দু'টি রাজপথ নানা পাড়া পাড়ি দিয়ে এক মোড়ে এসে মেশে, শত শত বাঁক ঘুরে দু'টি নদী এক হয়, অথচ ছাড়াছাড়ি-হওয়া দু'টি জীবন কিছুতেই যেন আর মেলে না। কেন? শহরতলীর এই হাসপাতালে ক'মাস বালিশে মুখ রেখে সুজাতা বারবার জিজ্ঞাসা করেছে, কেন? আজ সেরে ওঠার সার্টিফিকেট নিয়ে লোকাল ট্রেনে কলকাতা ফিরতে ফিরতেও সেই একই প্রশ্ন করেছে, কেন? পাকা লিখিয়ে বলেই কি বিধাতা কাঁচা একটা নাটক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা এড়িয়ে গেলেন। নইলে, এই দু'মাস বিছানার সঙ্গে মিশে-থাকা মেয়েটি মনে মনে যে স্বপ্ন রচনা করেছিল, ক'রে হয়ত নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিল, সেটুকু তার নিজের কাছে ত মন্দ লাগেনি।

থার্মোমিটার হাতে নিয়ে যে লোকটা 'নিরাময়ে', শহরতলীর এই হাসপাতালে, তিনবেলা ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ঘোরাঘুরি করে, পরনে যার ধুতির উপরে সাদা কোট, তার সুবিমল হতে ত কোন বাধা ছিল না।

চেহারার মিল দেখে সুজাতা প্রথমদিনই চমকে উঠেছিল। কতকটা সঙ্কোচে, কিছুটা-বা ভয়ে, ও-দিকে মুখ ফিরিয়েছিল। তার পর লোকটি যখন অনেকটা এগিয়ে গেছে, তখন ফের মুখ ফিরিয়ে লুকিয়ে চেয়েছে। হুবহু সেই মুখ, চলার ভঙ্গিটাও যেন এক রকম। কপালের কাছে চুলগুলো পাতলা। এই দশ বছরে সুবিমলেরও চুল পাতলা হত। রং তামাটে? প্রৌঢ় বয়সের চৌকাঠে পা দিয়ে সুবিমলেরও রঙ ময়লা হয়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কম দিন ত নয়। সুজাতার নিজের স্বাস্থ্যে আর মুখশ্রীতেও কি গ্রহণ লাগেনি, ঢলঢল চোখ দু'টি হয়নি চৈত্রের কুয়ো? তবে!

সুজাতার নিজের মনেও অবশ্য খটকা ছিল। নইলে সেই প্রথম দিনের পর থেকে লোকটিকে কতবার ত বাইরের বারান্দা দিয়ে যেতে আসতে দেখেছে, একদিনও সোজাসুজি ডেকে জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হয়নি কেন। পাছে খেলাটুকু ভেঙে যায়? পাছে লোকটি বলে বসে, আপনি ভুল করেছেন। আমার নাম সুবিমল নয়। আমি এখানকার মেল নার্স।'

শহরের সীমার বাইরে বেশ কয়েক মাইল সটান চলে এসে এখানে পৌঁছে ট্রাঙ্ক রোডটা যেন হঠাৎ বেয়াড়া ঘোড়ার মত ঘাড় বেঁকিয়েছে। এখানে তার আকৃতিটাও ঘোড়ার খুরেরই নালের মতো। সব উদ্দাম গতি—লরি, বাস, মোটর যাই হোক না কেন—মোড়টার মুখে এসে থমকায়। ধুলোর ফেউগুলো পিছিয়ে পড়ে। চালক একই সঙ্গে সঙ্কেতের জন্য হর্নে হাত দেয়, ব্রেকে পা ঠেকায়। আরোহীরা সেই অবসরে দেখে কংক্রীটের কালভার্টটা, নয়ানজুলির এপাশের শাহীসড়ক আর ও-পাশের উঁচ জমির মধ্যে ঘটকালি

করেছে। শুধু কালভার্ট কেন, সেকেলে দোতলা বাড়িটাও চোখে পড়ে, দু-ইঁট পুরু একটা পাঁচিল ঝাঁপানো একটা ঘাগরার মত যার কোমর জড়িয়ে আছে।

ঘাগরা নেহাৎ কষ্ট কল্পনা নয়। জনশ্রুতি, একদা এটা বাগানবাড়ি ছিল। ঘুঙুরপরা পায়ের ঘায়ে কঠিন মেঝে ককিয়ে উঠত। ইদানীং ভোল বদলেছে। রূপ আর পরিচয় দুইই। শাহীসড়কে ছায়া-দেওয়া শিরীষ গাছে নতুন পরিচয় একটা টিনের পাতে লেখা আছে, 'নিরাময়'। ক্ষয়রোগগ্রস্তদের হাসপাতাল।

জানলার বাইরে বিকেলের রোদ রোজ রোজ মরে। সুজাতা চেয়ে চেয়ে দেখে। আকাশটা ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। এও যেন এক রকমের ক্ষয়রোগ। সদর রাস্তার শিরীষের ডালে বাসার দখল নিয়ে দু-দল পাখির কলহ কান পেতে শুনতে মন্দ লাগে না। শেষ আলোটুকুও এক সময় ফুরোয়। তখন কাঁধে মই নিয়ে ব্যস্তসমস্ত কারা যেন ছুটোছুটি করে আকাশের মোড়ে মোড়ে একটির পর একটি নিবু নিবু তারার বাতি জ্বেলে দিয়ে যায়। খোলা জানালার ফাঁকে ঝিরঝিরে হাওয়া, প্রাঙ্গনের বেলফুলের ঝাড় থেকে সুজাতার জন্যে সে চুরি করে এনেছে সৌরভ, আর নিমগাছের পাতায় রাহাজানি করে তার জীর্ণ ফুসফুসের জন্যে অনেকখানি অক্সিজেন।

লোকটি সুবিমল হলে তখন হয়ত একবার আসত।

সেই তাজা হাওয়ায় বুক ভরে নিয়ে অলস চোখ দুটি বুঁজে সুজাতা অনেকক্ষণ ধরে তার সঙ্গে কথা বলতে পারত।

'অনেক দিন পরে দেখা হল।'

'অনেক দিন।'

'আঙুলে গুনে দেখলুম দশ বছর।'

'আমাকে আঙুলে গুনতে হয় নি। হিসেব মনে আছে। কত

বুড়ো হয়ে পড়েছি দেখছ না। রোদে-পোড়া মুখ, মাথায় টাক! তুমি কিন্তু আরও ফর্সা হয়েছে।'

সুজাতা বালিশে মুখ-রাখা নিজের খিলখিল হাসি শুনতে পেত। 'নতুন আলুর মতো? আরও কিছুদিন ভুগতে দাও দেখবে শেষ রক্তটুকু দিয়ে মেম সাহেবের গায়ের রঙ কিনে নিয়েছি। বয়স কিন্তু আমারও কম হল না সুবিমল। বাংলা প্রবাদের হিসেবে দু'বার বুড়ি হতে মোটে আট বছর বাকি। চুল উঠে উঠে মাথা একরকম সাফ হয়ে এল, চিরুনি টেনে কোনোরকমে ঢেকেঢুকে রাখি।

'বয়স ত বাড়বার জন্যেই।'

'তাতো দেখছিই। যখন ছোটটি ছিলুম তখন এক একটি জন্মদিনে কী যে ফুর্তি হত। বড় হচ্ছি একটু একটু করে, মেয়ে হচ্ছি। বয়সের জলে পায়ের পাতা ডুবিয়ে যেন মজা দেখছি। সেই জল এখন পা, হাঁটু, কোমর বুক ছাপিয়ে গলা অবধি উঠে এসেছে, এই অসুখে যদি না-ও মরি, বয়সের বানে ডুবে মরব। ভয় পেয়েছি কি সাধে?'

লোকটা সুবিমল হলেও তার সঙ্গে হয়ত এসব কথা হত না। হাজার হোক এটা হাসপাতাল, মেলনার্সের সঙ্গে রোগিনীর গাঢ় গলা আলাপ কি সাজে। বড় জোর কুশল সমাচার বিনিময় হত। সুজাতা জানতে চাইত, সুবিমল পশ্চিমে একটা শহরে ভাল একটা কাজ নিয়ে চলে গিয়েছিল বলে জানত, এই হাসপাতালের মেলনার্সের চাকরিতে কী করে, কবে থেকে, জুটল। নিজের কথাও কিছু বলতে হত বই কি! বলত, 'টাইপিস্‌টের কাজ নিয়েছিলুম। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, উপরন্তু গানের টিউশনি। একটু একটু করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে অবশেষে দেখছ ত, এখানে। ওপারের টিকিট কেটেছি, তোমাদের এই হাসপাতালটা গাড়ি বদলানোর ইস্‌টিশন, কেমন?'

'বাজে কথা বলোনা।' সরা-ঢাকা ঘড়ার মত থমথমে গলায়

সুবিমল বলত, 'তোমার এমন কিছু হয়নি। প্লেট দেখেছি। দু-দিনে সেরে যাবে।'

'ভরসা দিচ্ছ? প্রথম যখন ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে এটা দেখা দেয়, তখনও একজন ডাক্তার এই কথাই বলেছিলেন। তারপর এই দু'বছর ধরে আশ্বাসের সিঁড়ি বেয়ে ক্রমাগত নিচেই নেমে এলুম সুবিমল।'

তারপর, বলা যায় না, সব সঙ্কোচ জয় করে সুজাতা হয়ত সীতাদির কথাও জিজ্ঞাসা করতে পারত। 'তোমার বাসা কতদূর বল। সীতাদি এখানেই ত। একদিন নিয়ে এস, কেমন?'

পরম মমতায় সুজাতা মনে মনে সংলাপের ঊর্ণাজাল বুনে গেছে। সুবিমলকে বলতে শুনেছে, 'সীতা ত নেই, সুজাতা।'

নেই? শুনে থর থর হাতে লোহার খাটটা চেপে ধরে সুজাতার নিজেকে সামলাতে হত। 'কী হয়েছিল? অবশ্য ছোটখাট অসুখ ওর লেগেই থাকত, বরাবর দেখেছি।'

'ছোটখাটো নয়।' সুবিমল ধীরে ধীরে বলত, 'বড় অসুখে মরবার সম্মান থেকে বিধাতা তাকে বঞ্চিত করেন নি। ক্যানসার হয়েছিল।'

এখানে একটু দম নিতে হত সুবিমলকে, আবার বলত, 'এ-রোগের চিকিৎসা নেই, তবু যথাসাধ্য করেছি, বিশ্বাস কর, নিজ হাতে প্রাণ দিয়ে তাকে নার্স করেছি।'

'জানি, প্রাণ ঢেলে সেবা করতে তুমি পার। মাসিমার—তোমার মার—অসুখের সময় দেখেছি ত।'

এরপর কিছুক্ষণ কারও মুখেই কথা থাকত না। শেষে সুজাতাকেই রসিকতার অর্ধসফল প্রয়াস করে বলতে হত, 'নিয়তি দেখ। আমার কপালেও শেষ ক'টা দিন তোমার হাতের সেবা লেখা আছে।'

চেনা মুখ নয়, চেনা-চেনা। যেন সুবিমলের। রোজ সকাল হয়, রোদ ভিজে-ভিজে, যার চোখ থেকে এখনও ঘুমের ঘোর কাটে নি, প্রাঙ্গণের সবুজ ঘাসের বিছানাটুকু পেয়ে সেখানেই ফের শুয়ে পড়ার উপক্রম করে। তারপর গড়াতে গড়াতে চলে আসে বারান্দায়।

চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের ভিতরেও উঁকি দেয়। কোথা থেকে নেমে আসে একজোড়া চড়ুই, কী আছে এখানে, কী পায়, কী খায় ওরা, কে জানে। উর্দিপরা চাপরাসী পুব-জানালার পর্দা টেনে দিয়ে যায়। শিরীষ গাছের গুঁড়ি বেয়ে কাঠবিড়ালিটার তর তর উঠে যাওয়া আর দেখা হয় না। থার্মোমিটার হাতে আজানু সাদা কোট পরা লোকটিকে দেখা যায় তখন। এ-ঘরে যদিও ঢোকে না। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে হয়ত তাকায়, হয়ত তাকায় না। ঢোকে না বলেই সুজাতার সন্দেহ আরো বাড়ে।

ভুল নিয়ে মনে মনে খেলার নেশা তখন আবার জমে ওঠে। এও কি এক রকমের জ্বর বিকার, সুজাতা নিজেই কখনও কখনও ভাবে। কিন্তু জ্বর ত নেই। আজই ত চার্ট লিখতে লিখতে নার্স হেসেছে।—'একেবারে রেমিশন হয়ে গেছে। সেরে গেলেন বলে।' ভরসা-গাঢ় কয়েকটি কথা সুজাতার কপাল ঠাণ্ডা আঙুলের মতো ছুঁয়ে গেছে।

একেবারে মিছে সান্ত্বনা নয়, সুজাতা নিজেও টের পায়, সে সেরে উঠছে। অলক্ষ্যে একটু একটু করে বদলে গেছে শরীর। বুক ভরে শ্বাস নিতে আর যেন তেমন কষ্ট নেই। ধুকধুক কলিজা আগের আগের তুলনায় ঢের সবল। হাত-আয়না সামনে রেখে চোখের পাতা টেনে টেনে পরখ করে, কতটুকু রক্ত জমল। কালিটুকু মুছে গেল কিনা। চোয়ালটা আর বুঝি টিলার মত মাথা তুলে নেই, সমতলের সঙ্গে মিশে নিটোল হয়েছে।

ডাক্তার একদিন পরীক্ষা করে হেসে বলেন, 'এবার আপনি রোজ সকালে আর বিকেলে বাগানে পায়চারি করতে পারেন।'

যখন এসেছিল তখন আষাঢ়-আকাশের মাতঙ্গী রূপ, মেঘের ধূমল শুঁড়ে জল তুলে তুলে অবিশ্রাম ঢালছে। এখন, এই কার্তিকে, সে ধূমাবতী। বাইরে পা দিয়ে সুজাতা অবাক হয়ে গিয়েছিল। জোর নেই, এটুকু আসতেই কেমন মাথা ঘুরছে, শরীর টলছে।

প্রথমদিন আর এগিয়ে যেতে ভরসা হয়নি, ওখানেই একটা বেঞ্চে বসে পড়ে সুজাতা আঁচলে কপালের ঘাম মুছেছে। আবার পা টিপে টিপে দেয়াল ধরে ফিরে এসে বিছানা নিয়েছে। খাঁচার পাখি নির্মম নি-ঘের মুক্তি সইতে পারে নি, ভয় পেয়ে ছাতু-জলের বাটিতে মুখ রেখে ধুঁকছে। জানালার শিকের বরফিকাটা আকাশের টুকরোই তার ভাল। একটা গোটা আকাশ বড়ো একা, বড়ো নিঃসীম।

খটখট জুতো পায়ে একজন ওর বিছানার দিকে এগিয়ে আসছে। দু'চোখ বুঁজে সুজাতা শুয়ে, তবু অনুভূতিই তৃতীয় নেত্র হয়ে তাকে বলে দিয়েছে, কে। ওর বিছানার পাশে যে এল, থমকে দাঁড়াল, ওকে শ্রান্ত দেখে আবার ফিরে গেল, সে যদি সুবিমল হত তবে সুজাতা তাকে এভাবে ফিরে যেতে দিত না। যাবার সময় হয়ে এল, অথচ এখনও কোন বোঝাপড়া হল না যে! এতকাল পর দেখা, তবু পুরনোকাল নিয়ে দু'জনের কোন কথাই হল না। সুজাতার ভুলটা যদি ভুল না হত তবে ওর কনুইয়ে ভর দিয়েই সে অন্তত পিছনের নিরিবিলি বারান্দা অবধি যেতে পারত। এক কোণে মোড়া কিম্বা ডেক চেয়ার নিয়ে বসত দু'জনে। কী কথা দিয়ে সুরু হত? তা কি বলা যায়? ছোট খাটো কত ঘটনাই ত মনের ঝাঁপিতে তোলা আছে। তার একটা পেড়ে নিয়ে কথা সুরু করলেই হল।

—তোমার মনে আছে সুবিমল, সেই যেদিন তোমার উপর প্রথম রাগ করেছিলুম? খুব চটেছিলুম কিন্তু। বিকেল থেকে ময়দানে বসে আছি, সাড়ে পাঁচটায় তুমি আসবে। বারবার বড় ঘড়িটার দিকে চাইছি। ছ'টা বেজে গেল, চৌরঙ্গীর বড় ঘড়িটা পূর্ণিমার চাঁদের মতো জ্বলে উঠল, তখনও তোমার দেখা নেই। অতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলুম কেন, কে জানে, তুমি একেবারে সাতটা বাজিয়ে এলে।

কথা না বলে মুখ ফিরিয়ে থাকার ছেলেমানুষীটুকু করিনি, থমথমে মুখে বললুম, 'এত দেরি?' আমার পাশেই তুমি ধপ করে বসে পড়লে। আমার আঁচলেই কপালের ঘামটুকু মুছে ফেলতে ঝুঁকে পড়লে। বললে, 'কী করি। দুপুর থেকেই মার অসুখটা খুব বেড়েছিল। ডাক্তার ডেকে ঘুম পাড়িয়ে তবে আসতে পারছি।'

সেই প্রথম তোমার মায়ের অসুখের কথা শুনলুম। এতদিন তোমার পরিবারের কথা কখনও সবিশেষ বলনি! হয়ত আমিও শুনতে চাইনি। সেদিনই প্রথম সব খুলে বললে। বিধবার একমাত্র ছেলে তুমি। বাবা সামান্য যা কিছু রেখে গিয়েছিলেন, তাই দিয়ে লেখাপড়া শিখেছ। জ্ঞান হবার পর থেকেই দেখেছ মা রুগ্না। তুমি শুধু তাঁর ভবিষ্যতের নয়, বর্তমানেরও ভরসা। সংসারে কেউ ত নেই, রোগীর সব কিছু ভার তোমার। সেই রোগ ক্রমে জটিলতর হয়েছে, বাতে মার একটা অঙ্গ অসাড়। তাঁকে নাওয়ানো, খাওয়ানো, ওষুধ যোগানো, পথ্য দেওয়া, সব নিজ হাতে করতে হয়।

সেদিন শুনে মুগ্ধ হয়েছিলুম। তোমার অনুরোধে তোমার বাসায় গিয়েছিলুমও একদিন। গিয়ে দেখেছি, তোমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি। তোমার মা নির্নিমেষ চোখ মেলে আমাকে দেখছিলেন, আমি কিন্তু দেখছিলুম তোমাকে। ফীডিং কাপ, গরম জলের ব্যাগ, দাগ-কাটা শিশিবোতল, মেজার গ্লাস দিয়ে তোমার জীবনের অনেকটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছ।

অস্বীকার করব না, সুবিমল, সেদিন তোমাকে শ্রদ্ধা যতটা করেছি, ভয়ও করেছি তত। সহানুভূতির সঙ্গে একটু বিরাগ মিশে ছিল। সেই প্রথম টের পেলুম এতদিন যে সুবিমলকে জেনেছিলুম সেটা তার মেকি পরিচয় মাত্র। আসল পরিচয় আছে এই ঘরে, যেখানে সে একটি রোগী-পরিচর্যায় প্রহরের পর প্রহর কাটিয়ে দিতে

পারে! বাল্যে পিতৃহীন একটি শিশুর সঙ্গে তার মার সুখে দুঃখে যে শরিকানার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, একজনের রোগভোগে, আরেক-জনের সেবায়, সেই শরিকানার দলিল পাকা হয়েছে।

এই শরিকানার ভাগ আমিও নিতে পারতুম। কিন্তু তুমি, তোমরা দিতে রাজী হবে কিনা সেই ভয়ও সেদিনই মনে ঢুকল।

আশ্চর্য, তবু কিন্তু তারপরেও অনেকবার তোমাদের বাসায় গিয়েছি। রোগীর বিছানায় জোড়া, মালিশের গন্ধে ছাওয়া একটি শীতল ঘর আমাকে যেমন ঠেলেছে, তেমনি টেনেছে।

এত কথা সুবিমল ওকে এক সঙ্গে বলতে দিত কিনা সন্দেহ। সুজাতা কল্পনা করেছিল, সে বাইরের বারান্দায় ডেকচেয়ারে আধশোয়া হয়ে কথা বলছে, পায়ের কাছে মোড়া টেনে শুনছে সুবিমল। একটু দূরেই বিলের ধারে শিউলি ফুলের ঝাড়। ওদিকের পাড় ঘেঁষে পা... পাতার আড়ালে যে পাখিটা থেকে থেকে মাথা তুলছে, ফের ডুবছে, তার নাম সুজাতার জানা নেই। আরও দূরে উঁচু ঢিবিটার উপরে কয়েকটি কিশোর বাবলা গাছের জটলা।

সুবিমল ওকে অবশ্যই বাধা দিত। বলত, 'তুমি সবে সেরে উঠছ, এখন এসব কথা থাক। উত্তেজিত হবে, সেটা কিছুতেই উচিত নয়।'

এতদিন পরে সুযোগ পেয়ে সুজাতা সে মানা শুনত কি? য... দিয়ে ধোঁয়ার মতো আপত্তিটাকে উড়িয়ে দিত। পুরনো কথার খেই ধরে ফের শুরু করত—সেদিন তোমাকে বুঝেছিলুম সুবিমল, কিন্তু সবটুকু নয়। সন্ধ্যা হতেই তুমি ব্যস্ত হয়ে উঠতে, তোমাকে কিছুতে ধরে রাখা যেত না। গোড়ার দিকে অভিমান হত, শেষে আর মনে কিছু করতুম না। জানি ত, ওই সময়টাতে তুমি তোমার মাকে ধরে ধরে সামনের ছাতটুকুতে নিয়ে যাও; যতক্ষণ না হিম পড়ে, ততক্ষণ গল্প কর। একবার আমাদের বরানগরের পিকনিক থেকে পাঁচটা ন... বাজতেই তুমি ছুটে পালিয়ে এসেছিলে, মনে আছে ত?

আচ্ছা, সীতাদির সঙ্গে সেই সময়েই ত তোমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলুম? তোমার মা তখনও বেঁচে। আলাপ হল, এইমাত্র। এর বেশী কিছু তোমাদের মধ্যে তখনই ঘটেছিল বলে মনে করিনে। ঘটলে টের পেতুম। জানো ত, এসব ব্যাপারে মেয়েদের সহজাত বোধই গুপ্তচরের কাজ করে। সীতাদি সবে তখন গ্রাম থেকে এসেছে, মেলামেশার ব্যাপারে তখনও আনাড়ি, জড়োসড়ো। দু' একটা কথা বিনিময় হতে হতেই ওর সাহসের দম ফুরিতে যেত। আমি কিছু সন্দেহ করিনি আরও এই জন্যে যে, ওর বয়স ঢের হয়েছিল, ছেলেবেলা থেকে ম্যালেরিয়াতে ভুগে ভুগে চুল উঠে গেছে। সেই কাঠি সার, প্রায় অশিক্ষিত, মুখচোরা, গ্রাম্যকালো মেয়েটিকে আমার মতো কলেজে পড়া মেয়ে, লোকে যাকে বলে সুন্দরী, হিংসে করতে যাবে কী দুঃখে? তোমার রুচির উপরেও আমার ভরসা ছিল।

রূপ আর স্বাস্থ্য যে সব নয়, অন্তত সকলের কাছে সব নয়, সেটা বুঝতে আমার আরও কয়েক মাস লেগেছিল। যেদিন বুঝলুম, সেদিন তোমাকে বুঝতেও আমার কিছু বাকী রইল না।

উৎসাহ দেখিয়ে কোনও দিন জানতে চাও নি, তবু আমার কাছেই মাঝে মাঝে সীতাদির কথা শুনেছ। সম্পর্কে আমার পিসতুতো বোন, জন্ম থেকেই অসুখে ভোগে। একবার কালাজ্বরের পর থেকে কী অসুখ হয়েছে, চোখে যন্ত্রণা, রোজ মাথা ধরে। পড়াশুনো সেজন্যেই হয় নি। কলকাতা এসেছে চিকিৎসা করাতে।

সীতাদির উপর কেমন একটা মায়া বসে গিয়েছিল। তাই আগ্রহ করে ওর কথা তোমাকে বলতুম। তুমি মন দিয়ে হয়ত শুনতেও না। কখনও উদাসীন গলায় হয়ত বলতে, ও।

তোমার মার মৃত্যুর চারমাস পরের সেই সন্ধ্যাটির কথা মনে পড়ে সুবিমল? কলেজ থেকে ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। জানতুম তুমি আমার জন্যে এসে বসে থাকবে। ততদিনে মা বাবার সম্মতি পাওয়া গিয়েছিল। সুতরাং আমাদের বাসায় আসতে তোমার বাধা

ছিল না। ফিরে এসে দেখি বাইরের ঘর অন্ধকার। মা উপরে বোধহয় পুজোর ঘরে। বুঝলুম, তুমি আসনি। জুতো ছাড়লুম বাইরের ঘরেই। বই খাতা ছুঁড়ে দিলুম টেবিলে। কলে মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এসে মনে হল, সীতাদির সঙ্গে খানিক গল্প করিগে।

সেই ঘরে তুমি ছিলে। নীল একটা নিস্প্রভ আলোয় ঘরটা না-স্পষ্ট না-অন্ধকার, তবু সীতাদির শিয়রে বসে তোমাকে জলপটি দিতে দেখতে পেয়েছি।

আমি পিছিয়ে এসেছিলুম। তুমিও সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এসেছিলে। হাতে ওডিকোলনের শিশিটাকে কেন এনেছিলে আজও বুঝতে পারিনি। তুমি কি ভেবেছিলে ওটাকে কাজে লাগাবে? একবার বোকার মত জিজ্ঞাসা করলে, আমার ফিরতে দেরি হল কেন, জবাব পাবার আগেই নিজে থেকে বললে, 'তোমার সীতাদি শুনলুম সারা বিকেল মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছে, তাই—'

তোমার বোধহয় মনে আছে সুবিমল, কথাটাকে শেষ হতে দিইনি। ঘরে ঢুকে সীতাদির কপালে হাত রেখেছি। অত্যন্ত নির্বোধের মতো বলেছি, 'তাইত, খুবই মাথা ধরেছে দেখছি। ভাগ্যিস তুমি ছিলে।' বাইরের ঘরে ডেকে এনে সেদিন রাত ন'টা অবধি তোমার সঙ্গে হেসে নানা গল্প করেছি। কলেজের সোশ্যালে আমার ছোট পার্টটুকুও গুনগুন গলায় তোমাকে শুনিয়ে দিয়ে থাকব। গেট অবধি পৌঁছে দেবার সময় আমার হাত তোমার মুঠোয় ধরা ছিল, ছাড়াছাড়ি হবার আগে একবার কাছেও টেনে নিতে চেয়েছিলে, বাধা দিইনি।

তুমি সেদিন নিশ্চয়ই অবাক হয়েছিলে। আমাকে ঈর্ষাদ্বেষহীন দেবী বা ওই রকম কিছু ভেবে থাকবে। এখন ভাবি সুবিমল, তুমি হয় বোকা, নয় বোধশূন্য পাথর ছিলে। আমি সেদিন নিজেকে সমর্পণ করেছিলুম কেন জান? সেই শেষ বলে।

কেননা তোমাকে আমি চিনে নিয়েছি; যেটুকু বাকি ছিল সেটুকুও আয়নার মত ঝকঝকে হয়ে গিয়েছিল। না, তোমাকে লম্পট বা

দুরাচার ভাবিনি! তোমার মায়ের রোগ শয্যার ছবি সঙ্গে সঙ্গে মনে ভেসে উঠেছিল যে। বুঝেছি আমার নীরোগতাই আমার কাল। তোমার মার মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তোমার শৈশব থেকে অর্জিত অভ্যাস ত যায় নি। একটি রোগীর শিয়র তোমার চাই। স্তন থেকে স্তনান্তরে গিয়ে শিশু যে আশ্বাস পায়, এও তাই। সেদিন বুঝেছি, কালো হোক, অশিক্ষিত হোক, সীতাদির কাছে আমার হার হবেই।

পায়ের কাছে মোড়া নিয়ে নেহাত সুবোধ বালকের মতো যে একটানা কথা এতক্ষণ শুনে গেছে তার দিকে তাকিয়ে হয়ত সুজাতার করুণা হত। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলে বলত, 'জানো আমার ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেছে? এখানে আর তিন চার দিন, কি বড় জোর সাত দিন তারপর আবার একটা ইস্কুল মাস্টারি কি যা হোক কিছু কি জুটবে না?'

সুবিমল তবু মাথা নিচু করে বসে থাকত। শেষে তার দিকে ঈষৎ ঝুঁকে সুজাতাকেই বলতে হত, 'কিছু বলছ না যে। কোনো কথা কি বলবার নেই?'

হয়ত মাথা তুলত সুবিমল। জড়িত ধীর গলায় বলত, 'আছে। কিন্তু সাহস নেই। এখনও ভালো করে সেরে ওঠনি। এখুনি আবার চাকরিতে কেন ফিরে যাবে সুজাতা?'

এবার সুজাতাকে হেসে উঠতে হত।—'যাব না? তবে খাব কী। আমার এমন কে আছে সুবিমল, যে আমাকে বসিয়ে রেখে খেতে দেবে? জীবনের শেষ পুঁজিটুকু খরচ করে এখানে এসে চিকিৎসা করালুম, সে কি পরে অনশনে মরার জন্যে?'

এইখানে একটা নাটক ঘটতে পারত। সুবিমল হয়ত মোড়াটাকে ওর পায়ের আরও কাছে নিয়ে আসত, অধৈর্যের মতো ওর হাত চেপে ধরে বলত, 'তুমি শুধু অতীতের কথা বলছ সুজাতা, যা শেষ হয়ে গেছে তার ছায়া দিয়ে যা হতে পারে তাকে আড়াল করে রাখতে চাইছ।'

সুজাতাকে অবশ্য হাত ছাড়িয়ে নিতে হত। শান্ত, নিস্তরঙ্গ গলায় বলতে হত, 'কী হতে পারে।'

—'সব ভুল বোঝাবুঝির শেষ।'

এই ক'মাস ধরে সুজাতা এই মুহূর্তটিরই ত আশঙ্কা এবং প্রতীক্ষা করেছে! তবু তাকে বলতে হত, 'সুবিমল, তা হয় না।' সীতাদিকে আমি ভুলিনি।'

'কিন্তু সুজাতা, সীতা ত আজ নেই।'

'সুবিমল, তবু হয় না। সে মন নেই, সে বয়স নেই। তাছাড়া দেখছ ত, আমার এই অসুখ।'

গাঢ় গলায় সুবিমল বলতই,—'এ অসুখ তোমার থাকবে না, সুজাতা, তুমি সেরে উঠছ, সেরে উঠবে। আমি তোমাকে সেবা করে সারিয়ে তুলব।'

এইবার সুজাতাকে খিল খিল গলায় হেসে উঠতেই হত।—'আমার ভাবনাও ত সুবিমল সেই জন্যেই। এই অসুখ আমার চিরকাল থাকবে না। সেরে উঠব। তখন আমার কী উপায় হবে।'

—'হেঁয়ালিটা কিছু বুঝতে পারছি না।'

—'বুঝতে পারছ না?' গড়িয়ে-পড়া শিশি থেকে ফোঁটাফোঁটা বিষ যেন ঝরছে, সুজাতার গলা এমন তিক্ত।—'বেশ, আরও স্পষ্ট করে বলছি। তোমাকে যদি এতটুকু চিনে থাকি সুবিমল, তবে তুমি জীবনে কাউকে ভালোবাসনি। তোমার মাকে না, সীতাদিকে না। ভালোবেসেছ তাঁদের অসুখকে। অসুখকে ভালোবাসাও তোমার একটা অসুখ, তুমি নিজেও জান না। আজও আমার এই রোগটাই তোমাকে টানছে। এটুকু গেলে তোমাকে ভোলাবার মতো আমার কী থাকবে।'

তবু সুবিমল হয়ত বাধা দিয়ে কী বলতে চাইবে। তখনও অত্যন্ত অবসন্ন ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মাথা নাড়বে সুজাতা।—'তা হয় না, সুবিমল তা হয় না। রুগ্ন সীতাদির কাছে নীরোগ, স্বাস্থ্যবতী সুজাতা

একবার হার মেনেছে। আরেকবার তার নিজের কাছে, রুগ্ন সুজাতার কাছে, হার মানতে সে রাজি হবে না।'

নাটক নয়, নাটকের মহলামাত্র। সত্যি হলে সুজাতা কি সুবিমলকে এমন কঠিন আঘাত করতে পারত! আসলে ভীরু বলেই ত না-প্রকাশ্যে, না-গোপনে, কালকে ডেকে জেনে নিতে সাহসই হল না, দূর থেকে যাকে ভাসাভাসা দেখেছে, কে সেই মেলনার্সটি।

সাতদিন পরে যখন সুজাতা লোকাল ট্রেনে কলকাতা ফিরে চলেছে, তখনও নিজেকে বলেছে, ভালোই হয়েছে, শেষ অবধি জানা হয়নি, কে। হয়ত সুবিমল, হয়ত সুবিমল নয়। সারাজীবন কত দেখলুম, জানলুম, শিখলুম। জেনেই বা কী লাভ হল। একটি জিজ্ঞাসা না হয় চিরদিনের মতো নিরুত্তর থেকেই গেল।

টেবিলের ওপর চা আর খাবারের থালা রেখে চারু বেরিয়ে যাচ্ছিল, সুরজিৎ খপ করে ওর হাতখানা চেপে ধরল। তুমি বুঝি আমাদের নতুন বামুনমাসির মেয়ে?

চারু স্থির দৃষ্টিতে একবার চাইলে: তারপর আস্তে আস্তে হাতখানা ছাড়িয়ে নিলে:—না, আমি চারু।

সুরজিৎ আরেকটু বেশি বাধা পাবে ভেবেছিল। গ্রাম্য অশিক্ষিত মেয়ে, হয়ত চেঁচিয়ে উঠবে কিম্বা কেঁদেকেটে সারা হবে। কিন্তু যা ঘটল, সেটা না-বজ্রপাত, না-বর্ষণ। কেবল মেঘলা চোখ দুটিতে ঈষৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল!

সুরজিৎ মনে মনে হাসল। ভাবল, তৈরী মেয়ে। বলল, আমি তো তোমার নাম জিজ্ঞাসা করিনি, শুধু তুমি কে, তাই জানতে চেয়েছিলাম।

চারু জবাব দিলে, আমার নামটাই কি ঢের নয়। হাত ছাড়ুন, এবার যাই।

সুরজিৎ চারুকে ছেড়ে দিয়ে চায়ের বাটি নিয়ে পড়ল। না, একেবারে লবঙ্গলতা নয়। লতার মতো নেতিয়ে পড়ে না, তবে লবঙ্গের ঝাঁজটুকু আছে।

আসলে চারু যে কে, সুরজিৎ আগেই তা জেনেছে, চারুর নামও শুনেছে। কাল সন্ধ্যাবেলা বেড়িয়ে ফিরে রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখেছে, নতুন কে একজন বিধবা রান্না করছে, তাঁকে পাশে বসে সাহায্য করছে, পনের-ষোল বছরের একটি মেয়ে। রান্নাঘরের ল্যাম্পটায় কয়লার কালি পড়ে ঝুল লেগেছে, পরিষ্কার বোঝা যায়

না। কিন্তু মেয়েটিকে সুরজিতের ভালো লাগল। শ্যামলা, তবে কোমল নয়। শরীরের বাঁধুনিতে কাঠিন্যের ইঙ্গিত আছে।

উপরে এসে মাকে জিজ্ঞাসা করল, ওরা কারা মা?

মা বললেন, নতুন বামুনঠাকরুন। ওদের সঙ্গে কী একটা সম্পর্কও আছে। দেশে ছিল, খেতে পেত না। একটা ছেলে, সেও সেই দুর্ভিক্ষের বছর থেকে নিরুদ্দেশ।

সুরজিৎ বললে, ওঃ, ওকে তা হলে বামুনমাসি বলে ডাকব?

মা বললেন, ডেকো। বয়সে বড়ো, সম্পর্কও তো আছে। আশ্রয়ে এসে পড়েছে, একেবারে ফেলতে তো আর পারিনে। ওদেরও উবগার হবে, আর রান্নাবান্না ঠিক মতো করে যদি, আমাদেরও।

মার কথা শুনে পরিষ্কার বোঝা যায়, তিনি খুশি হয়েছেন। এই বাজারে কলকাতা শহরে বামুনঠাকুর, চাকর মেলে না, যদি বা মেলে, অগ্নিমূল্যে, এবং বিত্ত ও জীবনযৌবনের মতোই তারা ক্ষণস্থায়ী। তার চেয়ে অর্ধআত্মীয় এই সব লোক দিয়ে কাজও ভালো পাওয়া যায়, সস্তাতেও হয়।

স্ত্রীর ঘরে এসে দেখে, সে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে ললিতা।

সুরজিতের স্পর্শে ললিতা পাশ ফিরে অনেক কষ্টে চোখ মেলে তাকাল। কপালে গালে পাউডারের ছোপ তখনও লেগে রয়েছে। বোঝা যায়, প্রসাধন সম্পূর্ণ করতে পারেনি।

ললিতা বললে, হার্ট ট্রাবলটা বড়ো বেড়েছে।

সুরজিৎ উঠে টেবিলটার কাছে গেল। ওষুধ মেজার গ্লাসে ঢেলে ললিতাকে খাওয়াল। তারপর ফের শুইয়ে দিয়ে বলল, তুমি একটু ঘুমোও। আমি আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যাই।

ললিতা বলল, তুমি একটু বসো।

অগত্যা সুরজিৎকে বসতে হল! টেবিলের ওপর থেকে তিনবার পড়া সকালের কাগজখানা টেনে নিয়ে আরেকবার আদ্যোপান্ত পড়লে। তখনও ললিতা ঘুমোয়নি।

মনে মনে সুরজিৎ বিরক্ত হয়ে উঠল। সেধে আচ্ছা শিকল পরেছে পায়ে। রুগ্না স্ত্রীর বিছানার পাশে বসে থাকার মত অস্বস্তিকর কিছু নেই। এর চেয়ে তারকেশ্বরে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকা ভাল। তাতে অন্তত আধ মিনিট অন্তর অন্তর উঃ আঃ শুনতে হয় না।

ললিতাকে কি দেখে সুরজিৎ পাগল হয়েছিল সে কথা এখন স্মরণ হয় না। বড়োলোকের মেয়ে, একসঙ্গে পড়ত। কলেজের ম্যাগাজিনে নারীজাতির অধিকার নিয়ে প্রবন্ধ লিখত। বিতর্ক-সভায় পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীদের যুক্তিতে না হোক, তীক্ষ্ম বাক্যবিন্যাসে ধরাশায়ী করত!

বস্তুত এ বিয়েতে মায়ের বিশেষ মত ছিল না। তাঁর আপত্তির প্রধান কারণ ছিল, ললিতা সুরজিতের সমবয়সী। কিন্তু সুরজিৎ তখন কর্ণপাত করেনি। আর এখন আপসোস নিষ্ফল।

স্বাস্থ্য? ললিতার স্বাস্থ্য কি এত খারাপ ছিল, কলেজে পড়বার সময়? বিয়ের পরও তো অনেকদিন ভালোই ছিল। দাম্পত্য-জীবনে সুখ দুর্লভ, তবু সুরজিতের মনে হয়, বিয়ের পর প্রথম বছরটা ওরা সুখীই ছিল। মতান্তর হত কেবল একটা বিষয়ে, ললিতা কিছুতেই ছেলে চাইত না। শেষে সুরজিতের অনেক পীড়াপীড়িতে একবার সম্মতি দিয়েছিল। আর বিপত্তিও হল সেই থেকেই। বরাবরই নার্ভাস, সন্তান সম্ভাবনার পর ললিতা যেন একেবারে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। বারবার মূর্ছা ইত্যাদি হতে লাগল। শেষে সাতমাসে একটি মরা ছেলে প্রসব করে নিষ্কৃতি পেল বটে, কিন্তু হার্টের ব্যারাম সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে রইল।

রাত্রে খেতে বসেই দেখেছে বামুনমাসিকে। লম্বা ঘোমটা দিয়ে পরিবেশন করছিলেন অন্নদা। সুরজিতের মা পাশে বসেছিলেন।

দীর্ঘ ঘোমটা স্বল্প আলো, অনভ্যস্ত হাত। খানিকটা ভাত ঠিকরে পড়ল থালার পাশে, খানিকটা আসনে, খানিকটা সুরজিতের জামায়।

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, ছেলের বয়সী, সম্পর্কে বোনপো। ওকে আবার লজ্জা। তুমি অত বড়ো ঘোমটা দিওনা বাপু। এখানে ওসবের রেওয়াজ নেই।

আড়াল থেকে একটি মেয়ে বামুনমাসিকে সব জোগান দিচ্ছে, সুরজিৎ বুঝতে পেরেছিল।

হঠাৎ বললে, একটু জল।

বামুনমাসি সুরজিতের মাকে ফিসফিস করে বললেন, আমার হাত দু'টো যে এঁটো দিদি।

মা বললেন, চারু দিক।

সুরজিৎ সেই প্রথম, সামনাসামনি চারুকে দেখতে পেল। আনত হয়ে জগ থেকে গ্লাসে জল ঢেলে দিচ্ছিল। সুরজিৎ দেখল ঘন চুলে বিন্যস্ত কবরী, সুপুষ্ট বাহু, চিকন রোমবহুল গ্রীবামূল, আরও যা দেখলে, তারজন্যে দুঃশাসন চোখ দু'টিকে সুরজিৎ মনে মনে তিরস্কার করলে।

খাওয়া শেষ হবার আগেই সুরজিতের মা উঠে গিয়েছিলেন। অন্নদা মৃদুস্বরে বললেন, পেট ভরল তো বাবা?

সুরজিৎ হেসে উঠল, একি পরের ভাত খাচ্চি মাসিমা, যে লজ্জা করে খাব? অনেকদিন খেয়ে এমন তৃপ্তি পাইনি।

তারপর আরও দু'চারদিন কেটেছে। চারুকে সুরজিৎ দেখছে, কিন্তু সোজাসুজি কথা বলার সুযোগ হয়নি। চারু যদিও দৃষ্টি এড়ায়নি, কিন্তু পালিয়ে বেড়িয়েছে। সুরজিৎ মনে মনে হেসেছে। বেড়াক, বলির ছাগশিশুকেও তো মানুষ ঘাসপাতা খেতে দেয়, চারুর স্বাধীনতাও তেমনি। একবার যখন এসেছে, তখন সুরজিতের হাতের মুঠোয় এসে পড়ল বলে।

সেদিন সকালবেলাকার হাত ধরে ফেলার কথা সুরজিতের

মনে হয়েছিল, চারু হয়ত ওর মাকে বলে দেবে। কিন্তু দু'দিন কেটে গেল, কিছুই ঘটল না দেখে স্বস্তি বোধ করল। সাহসও বাড়ল। সাড়াটা যদি এ পক্ষের হয়, ও পক্ষের সায় নিশ্চয়ই আছে।

ওদের জন্যে নিচের তলায় একটা ঘর নির্দিষ্ট হয়েছিল। সেদিন অফিস থেকে ফেরবার পথে সুরজিৎ সেখানে নিতান্ত কৌতূহলবশে একবার উঁকি দিলে।

তক্তপোশের ওপর শুয়ে চারু কি একটা বই পড়ছিল। সুরজিৎকে দেখে বইটা বালিশের নিচে লুকিয়ে ফেললে।

—তোমার মা কই খুকি।

চারু উঠে বসল। আঁচল ঠিক করে নিয়ে বললে।—আমি খুকি নই!

—তুমি তবে কী।

—চারু।

—আচ্ছা বেশ। তোমার মা কোথায়?

সুরজিৎ লক্ষ্য করলে, চারু মুখ টিপে টিপে হাসছে। মাকে খুঁজতেই ঘরে ঢুকেছিলেন নাকি?

গ্রাম্য হলে কি হয়, সব বোঝে চারু।

সুরজিৎ মনে মনে হাসল।

চারু বললে, কালীঘাটে মাসিমার কি একটা মানত ছিল, সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

সুরজিৎ ততক্ষণ তক্তপোশটার ধারে বসে পড়েছে, চারু একটু সরে বসতে গেল, কিন্তু আঁচলের ভেতর থেকে বইখানা পড়ে গেল।

—কী বই দেখি, সুরজিৎ ঝুঁকে পড়ল। চারু ততক্ষণ বইখানার ওপর উপুড় হয়ে পড়েছে।

একপশলা ঝর্ঝরি বর্ষার মত কাড়াকাড়ির অবসানে দেখা গেল বইখানা সুরজিতের দক্ষিণকরতলগত, বাম হাতের মুঠোয় চারুর

শিথিল আঁচলের একটা প্রান্ত। চারু পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে, খোঁপা খুলে পিঠে, কানের দু'পাশে, দীর্ঘ কালো চুলের ঢল নেমেছে।

সুরজিৎ বইখানার পাতা উল্টে দেখলে, একখানা নভেল। নামকরণ থেকে অনুমান হল নিছক প্রেমোপাখ্যান। গম্ভীর ভাবে বললে, এই সব পড়ছিলে ?

—বেশ করছিলুম। চারু উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আঁচল ছাড়ুন। কেউ দেখে ফেলবে।

সুরজিৎ হঠাৎ পুলকিত হল। আঁচল ধরে ফেলায় রাগ করেনি। শুধু কেউ দেখে ফেলার ভয়।

কানের কাছে মুখ নিয়ে সুরজিৎ বলল, ফেলুক না। লুকোচুরির হাত থেকে বেঁচে যাই।

চারুও একটা ভ্রূভঙ্গি করে কী বলতে যাচ্ছিল, সদরে গাড়ির শব্দে অপরূপ বিশ্রম্ভালাপে ছেদ পড়ল। মা আর মাসিমা এসেছেন বুঝি।

তিন লাফে সুরজিৎ সিঁড়ি অতিক্রম করল; মন লঘুপক্ষ পাখির মত আনন্দের মেঘলোকে উধাও।

ঘরে ঢুকতেই ললিতা চিঁচিঁ করে বলে উঠল, কী গো এতক্ষণ কোথায় ছিলে! আমি সেই কখন থেকে একা বসে আছি—

সুরজিৎ বললে, কেন চারুকে ডেকে নিলেই পারতে।

ললিতা অবজ্ঞার হাসি হেসে বললে, বয়ে গেছে। ওই গেঁয়ো ভূতটার সঙ্গে কথা কইতে হলে আমার জ্বর এসে যেত। ও জানে কী। ওর আছে কী।

সুরজিৎ অনুচ্চকণ্ঠে বলল, শরীর আছে। প্রকাশ্যে চিররুগ্না এই মেয়েটিকে সান্ত্বনা দেবার ছলেই ঈষৎ আদর করল।

একটু পরে ললিতা বললে, বেড়াতে যাবে আজ? আমার শরীরটা আজ ভাল লাগছে বেশ।

ললিতা সাজলে অনেকক্ষণ ধরে, ঘটা করে। দু'জনে মিলে

নিচে নামছে, সিঁড়ির মুখে চারুর সঙ্গে দেখা। চারু এরই মধ্যে কখন গা ধুয়েছে, গাঢ় কালোপেড়ে ফর্সা শাড়ি পরেছে একটা।

ললিতা যে স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে এই গর্বেই টস্‌ টস্‌ করছে। সেধেই চারুর সঙ্গে একটু আলাপ করলে, কী চারু, কী করছ। অর্থাৎ চারু দেখুক ললিতার ঐশ্বর্য। কেবল স্বাস্থ্যই নেই ললিতার, আর সব আছে। বহুমূল্য শাড়িতে আর গহনার জলুসে বুড়িয়ে যাওয়া দেহটাকে মুড়ে দেবার ক্ষমতা আছে। যুবক স্বাস্থ্যবান স্বামী আছে।

সুরজিৎ বললে, চারুও চলুক না, আমাদের সঙ্গে? কলকাতার কিছু ত দেখেনি, দেখে আসবে।

ললিতার মুখখানা নিষ্প্রভ হয়ে গেল। কিন্তু প্রকাশ্যে অমতই বা করবে কী করে। সুতরাং চারুও গেল।

ভবানীপুরে গাড়ি আসতেই ললিতা বললে, আমার বুকটা কেমন ধড়ফড় করছে। আমি আর যাব না। এখানে গীতাদের বাড়ি নামব।

গীতা ললিতার বোন। শ্বশুরবাড়ি ভবানীপুরে। সুরজিৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শরীর খারাপ হয়েছে ললিতার? কী কাজ তবে বেড়িয়ে। গাড়ি ঘুরিয়ে নিক সুরজিৎ।

ললিতা বললে, না। চারু শখ করে এসেছে।

সুরজিৎ বললে, কখন এসে তোমায় ফের তুলে নিয়ে যাব?

ললিতা বললে, এসে কাজ নেই, একটু সুস্থ হলে আমি নিজেই বরং একটা গাড়ি নিয়ে ফিরে যাব।

সুরজিৎ সন্দিগ্ধ চোখে ললিতার দিকে তাকাল। ললিতার চোখে সেই দৃষ্টি—যে-দৃষ্টি নিয়ে লোক জুয়ায় শেষ বাজি ধরে। 'চারুর শরীর আছে'—সন্ধ্যাবেলা সুরজিতের অনুচ্চকণ্ঠের এই কথা ক'টি ললিতা শুনতে পেয়েছিল নাকি! আজ অবিশ্বাস্য উদারতা দেখিয়ে ললিতা প্রমাণ করতে বসেছে যে শরীরের প্রতিযোগিতায় চারুর কাছে হার মানলেও, মনের প্রতিযোগিতায় সে অনেক ওপরে।

সুরজিৎ একটু ইতস্তত করছিল, কিন্তু লোভই শেষ পর্যন্ত জয়ী হল। ললিতাকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিলে গড়ের মাঠের দিকে।

যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই চারু এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। সেই যে নিঃশব্দে এসে গাড়ির পিছনের সীটে বসেছে তো বসেই আছে।

সুরজিৎ বললে, কত আলো দেখেছ চারু। মাঠের দিকে চেয়ে দেখ মালার মত তুলছে। হেসে বলল, তোমাদের দেশে এত আলো নেই, কী বল।

চারু জবাব দিলে না।

সামনে এসে বসবে চারু? কী চমৎকার লাগবে দেখো। গাড়ি থামিয়ে সুরজিৎ বললে।

নিরুত্তর চারু পাশে এসে বসল। মাঠের মধ্যে গাড়ি খুব আস্তে চলছিল। সুরজিৎ একটা হাত স্টিয়ারিংয়ে রেখে অপর একটি হাতে চারুর কটি বেষ্টন করলে। চারুর দিক থেকে প্রতিস্পন্দন এলো কি? কিন্তু অত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব করার অবসর কই সুরজিতের। তাকে আর এই স্বল্পবাক গ্রাম্য মেয়েটিকে নিয়ে নতুন যে নাটক জমে উঠেছে এই নির্জন প্রান্তরের পটভূমিতে, ললিতা নিজেই তার সূত্রধার। আর কাউকে পরোয়া করে না সুরজিৎ।

প্রায় আধঘণ্টা স্থায়ী উন্মত্ততা জুড়িয়ে এলে চারুই প্রথম কথা বলল।

—ফুরিয়ে গেলেন?

সুরজিৎ ফুরোয়নি, দম নিচ্ছিল মাত্র। অপলক দৃষ্টিতে সে চারুর দিকে চেয়ে রইল। জিভে বড় ধার চারুর।

ঘাসের দিকে তাকিয়ে চারু বলল, ভাবছি আমাকে নিয়ে কি করবেন। এখনও হয়ত সম্পূর্ণ ফুরিয়ে যায়নি, যেটুকু আছে,

আশ্রয়ের বিনিময়ে সেটুকু আপনাকে নিঃশেষে দিতে পারব। কিন্তু তারপর ?

সুরজিৎ বলল, নাটক নভেল পড়ে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে চারু। এ জিনিসটাকে ওভাবে নিচ্ছ কেন। অত্যন্ত স্বাভাবিক যে প্রয়োজন, আমরা তার ডাকেই সাড়া দিয়েছি।

বাড়ি ফিরে সিঁড়ির মুখে মার সঙ্গে দেখা হল। একদৃষ্টে দু'জনের দিকে চেয়েছিলেন তিনি। চারু ঘরে ঢুকে গেল। সুরজিতের বুকটা কিন্তু দুরদুর করতে লাগল। প্রথম দিন লুকিয়ে সিগারেট খেয়ে বাড়িতে এসে যেমন করেছিল।

মা কিন্তু কিছু বললেন না। শুধু বললেন, ললিতা আজ আসবে না খবর পাঠিয়েছে। তোমার ভাত টেবিলে ঢাকা দেওয়া আছে, খেয়ো।

চারু অনুভব করছিল, এ বাড়িতে ওর সমীহ কিছু বেড়েছে। চারুর মা অন্নদা তো রীতিমতো ভয়ই করেন মেয়েকে। সুরজিতের মা ও চারুর মা কী চাই-না-চাই সেদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন।

বিকেলবেলা ললিতা আজকাল ওকে ডেকে নিয়ে সাজাতে বসে।

চুল বাঁধা সারা হলে ললিতা যখন ওকে হালকা সবুজ রঙের একটা শাড়ি পরিয়ে দিতে আসে, চারু বিব্রত হয়ে পড়ে। এ সবটাই যেন বড়ো বেশি প্রকাশ্যভাবে ঘটছে, চারুর মনে হয়। প্রথমটাই যেন পটের আড়ালে থেকে ফিসফিস না করে, নিজেই মঞ্চের সমুখে এসে তারস্বরে চীৎকার করতে শুরু করেছে। সুরজিতের সঙ্গে চারুর যে সম্পর্ক তা যেন বড়ো বেশি বে-আব্রু। সকলে জানে, সকলে বোঝে, এমন কি সবার সম্মতিক্রমেই যেন ঘটছে। চারুর মা অন্নদা খুশি, তার

কারণ বোঝা যায়। মেয়ে যদি বাড়ির মালিকের সুনজরে পড়ে তবে বাড়িতে তাঁর আসন পাকা। এরই মধ্যে তিনি নিজের আধসের দুধ বরাদ্দ করে নিয়েছেন। আবার পুজোর পর গিন্নীর সঙ্গে তীর্থে যাবেন বলে বায়নাও ধরেছেন।

সুরজিতের মার মনস্তত্ত্ব খানিকটা বোঝে চারু। রুগ্না একটা স্ত্রী নিয়ে চিরকাল সুরজিতের মত সুস্থ, সবল ছেলেকে ঘর করানো অসম্ভব হবে; তার চেয়ে যদি ছেলে চারুকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে, করুক না। ঘরে তো থাকবে। খেলনা দিয়ে ছেলে ভোলাতে হয়, চারু সুরজিতের মায়ের হাতের সেই খেলনা।

আর ললিতা। ললিতাকে সবটা বোঝে না চারু। কী স্বার্থ আছে ললিতার সুরজিৎ আর চারুকে নিয়ে এমন সর্বস্বপণ জুয়া খেলায়। চারুকে বিকেলে যখন সাজাতে বসে ললিতা, তখন যেন বড়ো বেশি নির্লজ্জ হয়ে ওঠে। প্রতিটি সজ্জা নিজে হাতে পরিয়ে দেবার জন্য ললিতা যখন পীড়াপীড়ি করে, তখন বড়ো বিব্রত বোধ করে চারু। হোক না ললিতা মেয়েমানুষ, তবু অপরের সমুখে অতটা অনাবৃত হতে চারুর কেমন অসস্তি লাগে। আর ললিতা যখন মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারুর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে, শিউরে ওঠে চারু! সে দৃষ্টিতে কেবল ঈর্ষাই থাকে না। বিমুগ্ধ চাটুবাক্যও না। নিজের বিগতযৌবন দেহটাকে সহস্র প্রয়াসেও ললিতা যে অপরূপ করে তুলতে পারে না, চারুকে সাজিয়ে সেই ক্ষোভ যেন মেটাতে চায়। চারুর প্রসাধন-পুষ্পিত দেহের মধ্য দিয়ে ললিতা সুরজিতের কাছে পৌঁছতে চায়। কেননা, দেহ তো সবটাই চারুর নয়। ওর রূপের, ওর অপরূপ সম্ভাবনাময় স্বাস্থ্য-চিক্কণ দেহের যে মোহ, তার খানিকটা তো ললিতারও সৃষ্টি! মানুষ-ললিতার প্রয়োজন সুরজিতের ফুরিয়েছে, কিন্তু চারুকে সে যখন সপ্রশংস হৃদয়াবেগে কাছে টেনে নেয় তখন বুঝি আর্টিস্ট-ললিতাকেও মনে মনে তারিফ করে! সেইটুকুই ললিতার।

আর সুরজিৎ যেন ক্ষেপে উঠেছে। প্রথম প্রথম যেটুকু দ্বিধা ছিল, সংশয় ছিল, সেটুকুও আর নেই। ওর স্পর্শে চারু ফুটে উঠেছে, সেই উন্মাদনাই সুরজিতের যথেষ্ট। শরীরসর্বস্ব একটা জড়পুত্তলী মাত্র ছিল, সুরজিৎ তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছে। প্রতিদিন সিনেমা, বিকেলে বেড়ানো, হোটেলে খাওয়া। চারুর ঘর এখন দোতলায়। গভীর রাতে সেখানে চুপে চুপে গিয়ে দরজায় ঠক ঠক করার মধ্যে অপরূপ উত্তেজনা। উত্তেজনা, কিন্তু আশংকা নেই। মা জানেন, বামুনমাসি জানে, ললিতাও জানে। এইভাবেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে নাকি সুরজিৎ। সামাজিক প্রয়োজনে ললিতা আর শারীরিক প্রয়োজনে চারু। মনে মনে সুরজিৎ হিসেব করে। মন্দ কী!

চারুর মনে কিন্তু সংশয় জমে উঠেছিল। এত অপর্যাপ্ত পাওয়ার মধ্যে আক্ষেপের একটু অঙ্কুর কোথায় যেন লুকিয়ে আছে। সুরজিৎ তাকে অজস্র দিয়েছে, কিন্তু এই কি চারুর পুরো দাম? দু'ডজন শাড়ি আর দু'সেট গহনা? এত সস্তা চারু!

বাড়িতে বন্ধুরা এলে তারা চারুর কাছে আসে না, ললিতার ঘরেই যায়। ঠাট্টা করে, ইয়ার্কি করে। ললিতা সব খুইয়েছে, কিন্তু ঐ একটুখানি কর্তৃত্ব অবশিষ্ট আছে। এ বাড়িতে ললিতাই গৃহিণী। বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে সুরজিৎ চারুর সঙ্গে তাদের আলাপ করিয়ে দেয় না তো! চারুকে একটু দাঁড়াতে বলে সরে যায়। বন্ধুর সঙ্গে দু'দণ্ড আলাপ করে ফিরে আসে।

একটুখানি ক্ষোভ জমে ওঠে চারুর মনে। কিন্তু স্থায়ী হয় না। সুরজিতের আবেগের বন্যায় ধুয়ে যায়!

সেদিন একজন বন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। সাগ্রহে সে সুরজিতের হাত দু'টো ধরে বার তিনেক ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, অনেকদিন বাদে তোকে পাকড়ানো গেছে।

চারু একটু আড়ালে সরে গিয়েছিল। ওদের কথা স্পষ্ট শোনা

যাচ্ছিল। নানা কথার পর বন্ধু বললে, মিসেসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি না?

চারু লক্ষ্য করল, সুরজিৎ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। আমতা আমতা করে সুরজিৎ বন্ধুকে বললে, তুই ভুল করছিস। মিসেস নয়।

চোখ টিপে বন্ধু বলল, বিবাহের চেয়ে বড়ো কিছু বুঝি।

চারু স্পষ্ট শুনতে পেল, সুরজিৎ বলছে,—দুর, ওসব কিছু নয়। আমাদের বামূনীর মেয়ে।

বন্ধু সকৌতুকে হেসে বললে, খাসা জুটিয়েছিস কিন্তু মাইরি। তোর লাক্ আর প্লাক্ দুই-ই আছে।

সেদিনও ওরা হোটেলে গেল, কিন্তু কোনো ভোজ্যদ্রব্যই মুখে রুচল না চারুর। সিনেমা হলেও সব কিছু বিস্বাদ লাগল। ফেরবার পথে গাড়িতে বসে সুরজিৎ যখন চারুর অঙ্গস্পর্শ করল, চারু ততক্ষণ মনঃস্থির করে ফেলেছে।

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল চারু। সুরজিতের হাতখানা ঠেলে দিয়ে বলল, আপনি আমায় বিয়ে করবেন সুরজিৎবাবু?

সুরজিৎ হতভম্ভ হয়ে গেল। চারু হঠাৎ বলে কী!

—বিয়ে? তোমাকে?

কঠিন ব্যঙ্গের সুরে চারু বললে, কেন, আমি যোগ্য নই, না? আমাকে নিয়ে সব পারেন, বেড়াতে, সিনেমা দেখতে, একতলার ঘর থেকে দোতলায় প্রমোশন দিতে, পারেন না শুধু বিয়ে করতে, না? বামূনীর মেয়েকে বিয়ে করতেই শুধু বুঝি মান যায়?

বাড়িতে যখন ফিরে এল চারু, তখনও ওর তাপ জুড়োয়নি। কোনক্রমে পোশাকগুলো ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ওর মা ডাকতে এসে সাড়া পেল না। খানিক পরে চারু নিজেই উঠে অন্নদার কাছে গেল।

—এখান থেকে চলে যাই, চল মা।

মা তখন রান্না করছিলেন। হাতের খুন্তি স্তব্ধ হয়ে গেল। বললেন, সেকি ?

চারু মা'র কাছে এসে ঝরঝর করে ঝরে পড়ল। কোনো কথা বলল না, খালি মা'র বুকের মধ্যে মুখ ঢেকে বলল, এসব ঐশ্বর্য চাইনে মা, তুমি শুধু এখান থেকে আমাকে নিয়ে চল। দেশে গিয়ে বরং গরীবের একটি ছেলে ডেকে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিয়ো ; কিন্তু এখানে নয়।

অন্নদার সমস্ত অঙ্গ কঠিন হয়ে উঠল। সর্বনেশে এ-কী কথা বলে চারু। বেশ তো চলছিল এখানে। দেশে খাওয়া পরার কী যে সুখ এক বছরে তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন। এক বেলা ভাত জোটাতে লোকের দরজায় দরজায় ফিরতে হয়েছে, সে স্মৃতি ভোলেননি তিনি। তারপর বয়স্কা মেয়ে নিয়ে সেই ভাঙা বাড়িতে গিয়ে ওঠার সাহস নেই তাঁর। একটা আগল পর্যন্ত নেই। পাড়ার ছেলেরা এসে শিস দিতে, ঢিল ছুঁড়তে শুরু করেছিল। এতদিন দেশে থাকলে কুকুরেরা সব চেটে-পুটে খেতো। এখানে তবু দেবতার ভোগে লাগছে। দেবতাই তো। সুরজিৎ দেবতা নয়ত কী। তাদের থাকতে দিয়েছে, পরতে দিয়েছে। চারুকে তো রাজরানী করে রেখেছে। বিয়েই খালি হয়নি। তা দু'টো মন্তরই কি সব ? আজ চারুর মা'র এই যে ঘৃতপক্ক হবিষ্যান্ন জুটছে, এসব দেশে আসত কোথা থেকে। দু'দিন একটু সুখে আছে, চারুর আর সেটা সইছে না। দেশে জাতও যেত, পেটও ভরত না। এখানে জাত যায়নি, পেটও ভরছে। এখনও চারুর মাকে রান্নাটা করতে হচ্ছে বটে, কিন্তু আশা আছে চারু আরেকটু জেঁকে বসলে কিছুই করতে হবে না।

মায়ের যুক্তির বহরে চারু স্তম্ভিত হয়ে গেল। ওর দীপ্ত চোখ দু'টি অনেকক্ষণ কেবল ঘৃণা বর্ষণ করল। তারপর কখন চারু আস্তে আস্তে উঠে গেল।

পরদিন সকালে চারুকে দেখা গেল না। চারুর মা ক্রমাগত কাঁদতে থাকল। দুর্বুদ্ধির জন্যে বার বার অভিশাপ দিল মেয়েকে। সুরজিৎ প্রথমটা একটু চকিত হল, ক'দিন বাদে সব ভুলে গেল। বন্ধুরা পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিলে, বেড়ে বাগিয়েছিলি, ফস্‌কে গেল? ওসব মেয়ের নামে সুখমস্তি। ভুমাতেই সুখ। আরও শাড়ি চাই, গাড়ি চাই, বাড়ি চাই। রক্তের স্বাদ একবার পেয়েছে, আর কি একজনে মন ওঠে চারুর। সুরজিৎ ভাবলে, হয়ত তাই।

ললিতার শরীর ক্রমশই খারাপ হয়ে পড়ছিল। হার্টের ট্রাবল বেড়েছে যেমন, ভক্তিও বেড়েছে তেমন। ললিতাকে নিয়ে তীর্থে তীর্থে দিনকতক ঘুরলো সুরজিৎ। এককালে কলেজের ক্ষুর-রসনা, বহু তর্কযুদ্ধের বিজয়িনী ললিতা শুধু যে ধর্মপ্রাণা হয়েছে তা নয়, টোটকা, মাদুলি, জলপড়া, অবধূত, সব কিছুতে তার অচল বিশ্বাস। বিশ্বাস নেই শুধু ডাক্তারি চিকিৎসায়।

১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সুরজিৎ আর ললিতা উত্তর ভারতের যে শহরে ছিল, সেটা প্রাচীন শহর হিসাবে যেমন দর্শনীয়, পীঠস্থান হিসাবে তেমনি পবিত্র। ক'দিন ললিতার অল্প অল্প জ্বর হয়েছিল; মন্দিরে আসতে পারত না। সুরজিতের কাজ হল রোজ মন্দিরে এসে শান্তি জল নিয়ে যাওয়া।

মন্দিরের কাছাকাছি আসতেই সুরজিৎ দেখল, একটি পাণ্ডা ওকে অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছে। শাঁসালো শিকার ভেবেছে বোধ হয়। সুরজিৎ ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে যাচ্ছিল, লোকটা এসে নমস্কার করলে।

—আজ্ঞে আমি বিষ্ণুপদ।

বিষ্ণুপদ? এ নামে পরিচিত কাউকে সুরজিতের মনে পড়ল না। মুখটা একটু চেনা চেনা বোধ হচ্ছে বটে।

—আমি কলকাতায় আপনাদের পাশের বাসায় দিনকতক রাঁধুনি বামুনের কাজ করেছিলাম বাবু।

—তাই নাকি। হবে। সুরজিৎ নিরাসক্ত ভাবে জবাব দিলে।

—আমার দোকানে আসবেন? দেবীদর্শন করিয়ে দেব। দেব শান্তিজল…

সুরজিৎ ভাবলে মন্দ কী। আরেকটু এগিয়ে গেলেই তো হাজারটা পাণ্ডা এসে ছেঁকে ধরবে, তার চেয়ে আগে থেকে একজনের হাতে আত্মসমর্পণ করা অনেক নিরাপদ।

বিষ্ণুপদ বললে, আমার বাসায় ডালি সাজানোই রয়েছে। কাছেই বাসা। আসুন না বাবু—

গোটাকতক গলিতে গোলক-ধাঁধার মত ঘুরে সুরজিৎ যে-বাসার সমুখে এসে দাঁড়াল, সেটা একটা জীর্ণ, অন্ধকার, খাপ্‌রার দোচালা। কড়া ধরে নাড়তেই যে স্ত্রীলোকটি এসে দরজা খুলে দিল, তাকে নিষ্প্রদীপের মধ্যেও সুরজিৎ চিনতে পারল। চারু।

শতচ্ছিন্ন একটা লালপেড়ে শাড়ি পরে আছে চারু। মাথায় সামান্য অবগুণ্ঠন। স্বাস্থ্যের সেই প্রাচুর্য আর নেই, কিন্তু কৃশ মুখখানার ওপর সিঁথির সিঁদুরের গভীর রেখা প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিষ্ণুপদ বললে, আমার স্ত্রী।

এই নতুন পরিবেশে চারুকে কল্পনা করতেও সুরজিতের অদ্ভুত লাগছিল। কোথায় ছিল চারু দ্বিতল হর্মে, ঐশ্বর্যের স্তূপে, রাজরানী হয়ে। মোটরের চাকায় দিনগুলো গড়িয়ে যেত। আর এ কোথায় নেমে এসেছে। গড়াতে গড়াতে চাকা শেষে এসে ঠেকল কি এই সংকীর্ণ গলির শেষে বস্তির বিষ্ণুপদ পাণ্ডার কুঁড়ে ঘরে? কোথাও এতটুকু শ্রী নেই, চারপাশে শুধু পুঞ্জীভূত দারিদ্র্য।

সুরজিৎ ভেবেছিল, চারু ওকে দেখে চমকে উঠবে, লজ্জায় মিশিয়ে যাবে মাটিতে। ঘর ছেড়ে একদিন পালিয়ে এসেছিল,

সেই লজ্জাতেই শুধু নয়, সব কটা ধাপ নেমে এসে আজ এই হতশ্রী পরিবেশের মধ্যে সুরজিৎকে অভ্যর্থনা করতে হচ্ছে, সেজন্যও।

আশ্চর্য, চারুকে কিন্তু মোটেই বিব্রত দেখাল না! মাথার ঘোমটা অল্প একটু টেনে দিয়ে এগিয়ে এল, নমস্কার, চিনতে পেরেছেন ?

অল্প একটু কাষ্ঠহাসি হেসে সুরজিৎ বলল, পারা একটু শক্ত বটে। তুমি পেরেছ ?

চারুর ঘরে বসবার কিছু আসবাব ছিল না। ঘরের কোণে ছিল ছেঁড়া একটা মাদুর, নিঃসংকোচে সেইটে টেনে এনে সুরজিতকে বসতে বলল।

সুরজিৎ বলল, বসব না। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, বিষ্ণুপদ আশে পাশে নেই। সুরজিৎ বলল, তোমাকে কিন্তু এভাবে দেখব আশা করিনি চারু।

একটু আগে চারু ছেঁড়া একটা সেমিজ সেলাই করছিল বুঝি। সেটাকে হাতে ফের তুলে নিয়ে বলল, কেন, মন্দ কি দেখছেন।

বিষ্ণুপদ স্নান করছিল বোধ হয়। সেই অবসরে চারু অনেক কথা অনর্গল বলে গেল। মাসিমা কেমন আছেন ? মারা গেছেন ? কবে ? ললিতাদি ?

সুরজিৎ দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, তার আর থাকা না থাকা। বেঁচে আছে এই পর্যন্ত।

হঠাৎ সুরজিৎ করল কি,- চাপা গলায় অথচ আবেগের সঙ্গে বলল, তোমার মা কিন্তু এখনো আমাদের কলকাতার বাসাতেই আছেন চারু। ফিরে যাবে আমার সঙ্গে ?

যে মাথায় ছেঁড়া ঘোমটার ফাঁকে সীমন্তের সিন্দূর জ্বল জ্বল করছে, সেই মাথা উঁচু করে তাকাল চারু। সহজ, দীপ্ত, নিঃসঙ্কোচ।—আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে,—শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে চারু বলল, নইলে একথা বলতে পারতেন না। দেখছেন

এখানে সংসারে জড়িয়ে রয়েছি। গেরস্থালি আছে, স্বামী আছেন, সব ফেলে হুট করে যাই কী করে, বলুন? বলে চারু একটু হাসল। স্থির, আয়ত দৃষ্টিতে কল্যাণী-স্নিগ্ধতা। সুগভীর তৃপ্তি। সুরজিতের মনে হল, দৃষ্টিতে সামান্য একটু অহংকারও বুঝি আছে। অবাক লাগল। এই অহংকার এলো কোথা থেকে চারুর। কী দিয়েছে তাকে এই অর্ধশিক্ষিত দরিদ্র পাণ্ডা বিষ্ণুপদ, সুরজিতের কাছে চারু যা পায়নি?

চলে আসবার সময় চারু বলল, আসবেন মাঝে মাঝে। আমার স্বামীর সঙ্গে তো আলাপ হল, আমার বাসাও চিনে গেলেন—

আমার বাসা। আমার স্বামী। চারুর এই ছোট দু'টি কথার মধ্যেই সুরজিতের মনে হল ওর সমস্ত বিস্ময়ের জবাব রয়েছে।

রাস্তায় নেমে এসেও সুরজিৎ একবার পিছনে ফিরে চাইল। তিরিশ-দুই-এক-এফ কৃপাশংকর বাই লেন। দরজার কপাটে খড়ি দিয়ে লেখা আছে, পাণ্ডা শ্রীবিষ্ণুপদ শর্মার নাম। সুরজিতের কেমন সন্দেহ হল, হয়ত বিষ্ণুপদর সঙ্গে আজকের সাক্ষাৎটা আকস্মিক নয়। হয়ত চারুই চেয়েছিল ওকে ডেকে আনতে। মুখোমুখি এনে জব্দ করতে। চৌকাটের ওপর এখনো দাঁড়িয়ে আছে চারু। বামুনমাসির মেয়ে নয়,—এই জীর্ণ স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার খোলার ঘরে চারু সম্রাজ্ঞী।

দুই কাননের পাখি

[এক পক্ষ]

"হুজুর ধর্মাবতার, আমার মক্কেল শ্রীমতী করবী রায়ের বিবাহ-বিচ্ছেদের দরখাস্ত মঞ্জুর করতে আজ্ঞা হয়।

"আবেদনকারিণীর বয়স সাতাশ বছর, তিন মাস, ষোল দিন। জন্ম খিদিরপুরে। পিতা মৃত রজনীকান্ত রায়। বর্তমান ঠিকানা ষাট নম্বর শ্রীমন্ত মল্লিক স্ট্রীট, কলিকাতা পনের। আবেদনকারিণী একজন পাশকরা নার্স। কিছুদিন একটি মিশনারী হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে করুণাময়ী নার্সিং হোমে যোগ দেন। ঠিক এখন অবশ্য তিনি কোনো হোম বা হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত নন।

"ঠিক এক বছর চার মাস পূর্বে উল্লিখিত নার্সিং হোমের ডাক্তার সুভদ্র রায়ের (যাঁকে অতঃপর প্রতিবাদী বা অপর পক্ষ বলে উল্লেখ করা হবে) সঙ্গে আবেদনকারিণীর বিবাহ হয়। সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট অনুসারে এই বিবাহ সিদ্ধ এবং সরকারী ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের উপস্থিতিতে প্রয়োজনীয় ফর্ম ইত্যাদি স্বাক্ষরিত হয় (একজিবিট নং এক)। অনুষ্ঠানে তিন জন সাক্ষী ছিলেন সুব্রত সরকার—(১৪নং সাইপ্রেস রো, কলিকাতা), নলিনী রক্ষিত (৪৮ বি হালদার বাগান লেন, কলিকাতা) এবং অপূর্ব আচার্য (মেডিকেল লজ, ইষ্ট-এণ্ড প্লেস)। তিন জনই লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক এবং জীবিত, প্রয়োজন হলে হুজুর এঁদের সাক্ষী হিসাবে তলব করতে পারেন।

"প্রতিবাদী ডাঃ সুভদ্র রায়ের সঙ্গে আবেদনকারিণীর পরিচয় দুই বছর আগে, করুণাময়ী নার্সিং হোমে। ঐ বছরই মে মাসে আবেদন-কারিণী নার্সিং হোমে কাজ নিয়ে আসেন। প্রতিবাদীর সঙ্গে

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেসে তাঁকে কাজ করতে হয়। ডাঃ রায়কে তিনি কয়েকটি জটিল অপারেশন এবং ডেলিভারি কেসেও সহায়তা করেন। এ ক্ষেত্রে বলা সমীচীন, প্রতিবাদী স্ত্রীরোগে অভিজ্ঞ একজন যশস্বী চিকিৎসক, এই তরুণ বয়সেই বার দুই বিদেশ ঘুরে এসেছেন। প্রথমবার বৃত্তি নিয়ে, দ্বিতীয়বার আপন খরচে—ব্যাপকতর অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানার্জনের বাসনায়।

"ঘনিষ্ঠভাবে এক সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ, কাজের প্রয়োজনে দৈনন্দিন সাহচর্য উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার সৃষ্টি করে। একই রোগী বা রোগিণীর শিয়রে জাগরণে দু জনের রাত্রি কেটেছে। উৎকণ্ঠা, সংশয় উভয়েই বহন করেছেন সমানভাবে, সাফল্যের কৃতিত্ব ভাগ করে নিয়েছেন, অসফল হলে একে অপরকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। করবী সুভদ্রর বিচক্ষণতা, বিশ্লেষণী ধী এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতায় বিস্মিত হয়েছেন। সুভদ্র করবীর উপস্থিতবুদ্ধি, কর্মনৈপুণ্য এবং নিষ্ঠার তারিফ করেছেন মনে মনে।

"একে অপরকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছেন, সেই শ্রদ্ধা, ধর্মাবতার, পরে অনিবার্য এবং অবশ্যম্ভাবী প্রীতির রূপ নিয়েছে। প্রতিবাদী ডাক্তার প্রথম তেসরা আগষ্টে লিখিত এক পত্রে আবেদনকারিণীর কাছে এই প্রীতির কথা ব্যক্ত করেন। (একজিবিট নং দুই)।

"হুজুর পড়লে বুঝবেন, এই চিঠির সবটাই মামুলী প্রেমনিবেদন নয়। আদর্শের কথা আছে, যৌথভাবে সমাজকল্যাণ-ব্রত গ্রহণের সংকল্প আছে। অবশ্য ব্যক্তিগত কথাও কিছুকিছু আছে। প্রতিবাদী শৈশব থেকেই মাতৃহারা, অনাথাশ্রমে মানুষ, পরে মিশনারী স্কুলে লেখা-পড়া শেখেন। জীবনে গুরু বা লঘু বেশী নারীর সংস্পর্শে আসেন নি। রোগিণী ছাড়া ঘনিষ্ঠভাবে কোনো মহিলাকে দেখেন নি। আবেদকারিণীই প্রথম নারী, যিনি তাঁর জীবনে আবেগের আলোড়ন তুলেছেন। তাঁর পায়ের কাছে সুভদ্র আপনার অন্তর উজাড় করে যে ডালি সাজিয়ে রাখলেন, দেবী তা তুলে নেবেন এমন

দুরাশা তিনি করেন না, অর্ঘের দিকে দেবী স্মিতকৃতার্থ দৃষ্টিপাত করলেই ভক্ত কৃতার্থ হবেন।

"অবশিষ্ট অংশে, হুজুর, আবেদনকারিণীর রূপের বর্ণনা এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে, বাহুল্যবোধে সেটুকু পড়লাম না।

"এই চিঠিটি প্রতিবাদী আবেদনকারিণীর হাতে তুলে দেন। পরদিন আবেদনকারিণী এর জবাবও দিয়েছিলেন ডাকযোগে। সে চিঠির নকল তাঁর কাছে নেই, অপর পক্ষ ইচ্ছা হলে দাখিল করতে পারেন।

"উভয়ের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ তো হতই, এবার পত্র বিনিময় শুরু হল। যা মুখে বলতে বাধত, এঁরা তা লিখে জানাতেন। এই রকম এক ডজন চিঠি আবেদনকারিণীর কাছে আসে (একজিবিট নং তিন—চৌদ্দ)।

"প্রতিবাদীর কাছ থেকে পাকাপাকিভাবে বিবাহের প্রস্তাব আসে আরেকটি পত্রে, যেটি পনের নম্বর একজিবিট। ডাঃ সুভদ্র রায় তখন দার্জিলিঙে গিয়েছিলেন। আবেদনকারিণী তখন ওয়ালটেয়ারে। ডাঃ সুভদ্র রায় এই চিঠিতে মুখবন্ধ হিসাবে হিমালয়ের কিছু বর্ণনা দিয়েছেন। চিঠিতে আছে: 'তুমি (অর্থাৎ আবেদনকারিণী) ওখানকার সমুদ্রের কথা লিখেছ। আমিও এখানে সমুদ্র দেখছি। না, কথাটাকে নিছক কল্পনা মনে কর না। একটু কবিত্বের ছিটে হয়ত আছে। জান, পাহাড়ও আসলে সমুদ্র। হয়ত খুব প্রাচীন সমুদ্র। তারও তরঙ্গমালা আছে, যত দূরে চাও দেখবে চূড়া আর চূড়া, ঢেউয়ের পর ঢেউ। তবে সমুদ্রের ঢেউ উচ্ছল, সতত চঞ্চল; পাহাড়ের স্থির, কঠিন প্রৌঢ় ঢেউ। যেন অনেক যুগের আগের একটিমাত্র কম্পন, একটি শিহরণকে ধরে রেখেছে। যদি পাহাড়ের সঙ্গে কোথাও দেখা হয় সাগরের, সাগরকে সে বলে, আমিও একদিন তোমার মতই ছিলুম, এখন জুড়িয়ে গিয়ে স্তব্ধ আর শক্ত হয়েছি। তুমিও একদিন আমার মতোই হবে। সমুদ্রই কি মৃত্যুর পর

পর্বত হয়, শীতল, গম্ভীর, স্থির? অচল কি অতলেরই রূপান্তর? কে জানে।

'যাক, ডাক্তারের এত কবিত্ব সাজে না। এ সব ভয়ে ভয়ে যা বলব করবী, তাও কি সাজবে? কী জানি! কিন্তু বলতেই কি হবে? তুমি কি বোঝনি।'

"এর জবাবে আবেদনকারিণী শুধু একটি কথা লিখেছিল, 'বুঝেছি'।

"পাহাড় থেকে নেমে এল সুভদ্র, সমুদ্রতীর থেকে ফিরল করবী। ধর্মাবতার, তার দেড় মাসের মধ্যেই দস্তুরমত নোটিশ দিয়ে, নাম সই করে ওদের বিয়ে হয়ে গেল।

"বিয়ের সাক্ষী ছিল তিন জন। প্রীতি-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল আরও কয়েকজন অন্তরঙ্গ সখী আর বন্ধু। ডাঃ সুভদ্র রায় নতুন ফ্ল্যাট নিয়েছিলেন লেক-অঞ্চলে। ফ্ল্যাটটি আপন রুচিমত সাজিয়েছিল করবী। দুজনেই বয়সে তরুণ, দুজনেই সঙ্গী থেকে শুরু করে সবই পছন্দমত বেছে নিয়েছে। সুতরাং ওদের সুখী হতে বাধা ছিল না।

"তবু, ধর্মাবতার, এই বিয়ে সুখের হয়নি। হলে আজকের এই আবেদনের প্রয়োজন হত না। আবেদনকারিণী কেন বিচ্ছেদের এই মামলা এনেছে, সহজে তা বোঝানো যাবে না।

"বিবাহ-বিচ্ছেদের মামুলী যে কারণগুলো থাকে, তার কোনটিই এ ক্ষেত্রে খাটে না। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো, প্রতিবাদী সুভদ্র রায় অন্য স্ত্রীলোকে আসক্ত নন, মাত্রাতিরিক্ত পানাসক্তি তাঁর নেই। আবেদনকারিণীকে তিনি কোনোরকম শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করা দূরে থাক্‌, কখনও একটি কটু কথাও বলেননি।

"তবু আবেদনকারিণী এই বিবাহের বিচ্ছেদ চায়। একটিমাত্র কথায় তার কারণটি বলা যেতে পারে: যে সম্পর্ক স্থাপিত হলে একটি বিবাহ সম্পূর্ণ হয়, এক্ষেত্রে, এই দম্পতির মধ্যে আজও তা

ঘটেনি। ওদের মিলনের প্রমাণ শুধু একটি চুক্তিপত্রের দুটি স্বাক্ষর এবং কিছুকাল একত্র বসবাস।

"ত্রুটি কার বলা কঠিন। আবেদনকারিণীর ডায়েরিতে (একজিবিট নং ষোল) ওদের প্রথম একত্র রাত্রি যাপনের কথা লেখা আছে। তার থেকে খানিকটা যাদ পড়ে শোনাই, হুজুর হয়ত ব্যাপারটা কিছু বুঝবেন

"আবেদনকারিণী লিখছেন : 'আয়োজনে কোনো ফাঁকি ছিল না। দক্ষিণখোলা ঘর, কোণে-কোণে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, কিছু বিছানাতেও ছড়ানো। মৃদু-সুরভিত বাসরে একটি স্নিগ্ধ-নীল আলো। বন্ধুদের বিদায় দিয়ে আমরা সেই ঘরে এলাম। আমাদের চার চোখ এক হল।

'কিন্তু যা স্বাভাবিক, তা ঘটল না। আমি এক পা দু'পা করে পিছিয়ে গেলুম। যেন হঠাৎ বিশ্রী গরম পড়েছে, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

'সাজপোশাকে বিলাসের যেটুকু বাড়াবাড়ি ছিল, আড়ালে গিয়ে সে সব খুলে সহজ হয়ে এলাম। ঢিলে জামা-কাপড় পরে খানিকটা স্বস্তি যেন ফিরে পেলাম। বাঁধা চুলের রাশিও এর পর দিলাম খুলে, চিরুনি হাতে বসলাম আয়নার সামনে।

'আড় চোখে ওকে দেখছিলাম। চেনা সেই মানুষটি সহসা কেমন যেন অচেনা, যেন দূরের হয়ে গিয়েছে। দৃষ্টি অপলক—এই দৃষ্টিকে আমি চিনি না। একবার ভাবলাম, ও এবার আমাকে কাছে ডাকবে, কিংবা নিজেই কাছে আসবে। তাই ত' হয়ে থাকে জানি। কিন্তু সে সব কিছু আমাদের বেলা হল না। ও হেলান-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে নির্বিকার ভাবে সিগারেট টানছিল, টানতেই থাকল।

'সে দিনই মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে যে আমার স্বামী হয়েছে, তার এই আচরণ একটু অদ্ভুত ঠেকল। সে হাসি-খুশি-হৈ-চৈ-করা

মানুষটাকে আমি চিনতাম, সে কই! এই কি সেই। কী জানি! আমি ভয় পেলাম। অপরিচিত একটা মানুষের সঙ্গে একলা একটা ঘরে, এই রাত্রে ঢুকে পড়িনি ত! সেই মুহূর্তে যেন একটি হিমপ্রবাহ নেমে এল, গুঁড়ো গুঁড়ো সাদা বরফে সেই ঘর, সেই বাসর ছেয়ে গেল। আমার সব পেশী কঠিন হল।

'চিরুনিটা টেবিলের কাঠে ঠুকে ঠুকে ভুতুড়ে ভয়টাকে দূর করলুম। নিজেকে ধমক দিয়ে বললুম—এ কী ছেলেমানুষি করছ! তুমি না নার্স! কত পুরুষের শিয়রে বসে কত রাত ত কাটিয়েছ। পরিচর্যা করেছ। এই অর্থহীন সঙ্কোচ ছাড়। ও যদি না আসে, তুমি এগিয়ে যাও '

'শেষ সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়ে ও হেলান-চেয়ারটায় ফের শুয়ে পড়ল। হাত দিয়ে চোখ ঢাকা, একটু পরে দেখলুম, ওর ঘাড় কাত হয়ে পড়েছে।

'এই নীল-নিস্প্রভ আলোটাও কি ওর চোখে লাগছে? সুইচ হাত দিয়ে মৃদু আলোটাকে যেন ছারপোকার মত টিপে মারলুম। ঘর একেবারে অন্ধকার হল না, সে দিন যে শুক্লা-পঞ্চমী। অতি অস্পষ্ট আলোয় ওর অস্তিত্বের খানিকটা কায়াই রইল, বাকীটা ছায়া হয়ে গেল। হঠাৎ মনে হল, ও যেন বড় রুগ্ন। কঠিন অসুখে ভুগছে, একটু ছোয়া পেলে, যত্ন পেলে, পরিচর্যা পেলে বেঁচে যাবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে সব সাহস, সব আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম। এগিয়ে গেলাম, হাত রাখলাম ওর কপালে। আমার নিজের সত্তা ফিরে পেয়েছি। স্পর্শে মমতা, কণ্ঠে মায়া ভরে দিয়ে বললাম—কী হয়েছে তোমার! কী কষ্ট! আমাকে বল।

'ও যেন চমকে উঠল। হাত সরিয়ে নিল চোখ থেকে। বলল কিছু না। কিছু নয়। তুমি—তুমি শুয়ে পড়।

'আমি শুয়ে পড়লাম। বিছানার একটি ধার ঘেঁষে। ভেবেছিলাম, ও এখুনি আসবে। এল না। তখনও গুমোট ছিল,

গরম লাগছিল। জামা-কাপড় আরও ঢিলে করে দিলাম। কাজটা হয়ত নির্লজ্জের মতো হল। কিন্তু লজ্জাই বা কী! ঘর ত প্রায় অন্ধকার। একটু দূরে যে বসে আছে, সে দেখছে? দেখুক না, সে ত আমার স্বামী। আমাদের সব ভাবে দেখার অধিকার ত ওর আছেই।

'অপেক্ষা করে রইলাম। ও হয়ত আসবে। যে শয়তানীটা আমার মধ্যে আছে, সে ফাঁদ পেতেছে, ও কাছাকাছি আসুক, চেয়ে দেখুক আমাকে, আমার অকুণ্ঠিত রূপকে; ওর জড়তা ঝরে পড়বেই। ও স্বাভাবিক হবে।

'ভাবতে ভাবতে হয়ত কখন তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ জেগে দেখি, ও সত্যিই এসেছে। বিছানার পাশে টেনে এনেছে চেয়ারটা। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমার বুক দুরদুর করছিল। এর পর কী হবে, কী হবে! কিছু হল না, শুকনো যান্ত্রিক গলায় ওকে বলতে শুনলুম দেখি, তোমার হাতটা দেখি।

'ওর স্পর্শে কোনো জাদু নেই। গলায় ঈষৎ আদেশের ভঙ্গী বাজল ডাক্তার যে ভাবে রোগিণীকে আদেশ করে। আমার সমস্ত মন আর দেহ বিস্বাদে ভরে গেল। মনে পড়ল, চিকিৎসক হিসেবে এরও আগে শত শত রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে ও দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে দেখেও ওর মনে কোনো বিকার হয়নি। প্রত্যেকের দিকেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে ও বলেছে—দেখি হাতটা দেখি। আজও সেই নিপুণ, নিতান্তই প্রফেসনাল সুরের প্রতিধ্বনি শুনলাম। সেই মুহূর্তে একটা সন্দেহ আমার মনে বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠল, অসংখ্যবার সব রকমে দেখে ছুঁয়ে নারীরূপ সম্পর্কে ওর মনে কোনো মোহ নেই। সব মেয়েই ওর কাছে রোগিণী। এই লোকটি কোনো দিনই স্বামী হতে পারবে না।'

"ধর্মাবতার, আবেদনকারিণীর প্রথম রাত্রির ডায়েরি এখানেই শেষ। আরও কয়েকদিনের অভিজ্ঞতার কথা এর পরে আছে। আপনাকে সে সব পড়ে শোনাতে চাই না। কেননা, সামান্য খুঁটিনাটির তফাত

থাকলেও ঘটনা মোটামুটি এক। প্রায় এক মাস ধরে প্রতি রাত্রে এই প্রহসন চলেছিল।

"আবেদনকারিণী এর পরে বিবাদীর ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে আসে। অসত্য দাম্পত্য জীবনের ওপর ওখানেই যবনিকা পড়ে।

"এখানে প্রতিবাদীর দৈহিক পটুতা সম্পর্কে স্বতই সন্দেহ হতে পারে। কিন্তু আবেদনকারিণী সেই অভিযোগ আনতে চায় না; কেননা প্রতিবাদী নিজেই একজন ডাক্তার। দুরারোগ্য কোনো দৈহিক অক্ষমতা থাকলে সে নিজেই জানত এবং নিশ্চয়ই বিয়ে করত না। এ বিয়ের ব্যর্থতার অন্য এব গূঢ়তর কারণ আছে: হয়ত আবেদনকারিণী তার প্রথম রাত্রির ডায়েরির শেষাংশে যা অনুমান করেছে, তাই। যাই হোক, সে কোনো অভিযোগ আনতে চায় না। শুধু একটা মিথ্যা বন্ধন থেকে মুক্তি চায়।

"হুজুর তার বিনীত আর্জি মঞ্জুর করুন।"

[অপর পক্ষ]

"হুজুর, ধর্মাবতার, আমার মক্কেল ডাঃ সুভদ্র রায় (বয়স তেত্রিশ বছর তিন মাস ছয় দিন) অপর পক্ষের আবেদনের মর্ম অবগত আছেন। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে বা কোনো বাধা উপস্থাপিত করতে চান না। আবেদন মঞ্জুর হোক, বা হুজুর তাঁর ন্যায়নীতি বিবেচনা প্রয়োগ করে যে কোনো রায় দিন, আমার মক্কেল মাথা পেতে নেবে।

"আমার মক্কেল স্বীকার করবেন, অপর পক্ষের দরখাস্তে বর্ণিত বিষয় সমূহ বহুলাংশে সত্য। নার্স করবী রায়ের সঙ্গে তাঁর সত্যিই প্রথমে সম্প্রীতি এবং পরে বিবাহ হয়েছিল। দরখাস্তে প্রদত্ত বিবাহের তারিখ, সাক্ষীদের নাম-ধাম ইত্যাদি ঠিক। এই বিবাহ আইনত সিদ্ধ হলেও সম্পূর্ণ বা সার্থক হয়নি, বাদিনীর এই বিবৃতিও ঠিক।

"আমার মক্কেল লক্ষ্য করেছেন, অপর পক্ষের আবেদনে তাঁর

বিরুদ্ধে ব্যাভিচার, পানাসক্তি বা কোনো প্রকার নৃশংসতার অভিযোগ আনা হয়নি। এজন্য তিনি বাদিনীর প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁর দেহগত পটুতার বিষয়েও অপর পক্ষের আবেদনে সন্দেহ প্রকাশ বা কটাক্ষ করা হয়নি দেখে তিনি স্বস্তিবোধ করছেন। সত্যিই তাঁর কোনো অক্ষমতা নেই। তবু এই বিবাহ সফল হয়নি। কেন হয়নি সে-সম্পর্কে তাঁরও কিছু বক্তব্য আছে। সেটা আমার মক্কেলের নিজের জবানীতেই দাখিল করছি। এটিও এই মামলা সংক্রান্ত নথিপত্রের অন্তর্ভুক্ত হোক, আমাদের পক্ষের এইমাত্র প্রার্থনা।

"আমার মক্কেলের জবানবন্দী এই : 'বিয়ের পরে প্রীতিভোজে অল্প কয়েক জনকেই বলেছিলাম। ছোট ফ্ল্যাট, আমাদের পছন্দ দিয়ে সাজানো। বন্ধুরা আমাদের রুচির প্রশংসা করল। আমাদের দু'জনকে নিয়ে হালকা ঠাট্টাও করেছিল। হেসেছিলাম আমরাও। তখনও জানতাম না, সমস্ত ব্যাপারটাই প্রচণ্ড রকমের একটা ঠাট্টায় দাঁড়াবে। ওরা চলে যাবার পরেই নিষ্ঠুর একটি নাটকের অভিনয় শুরু হবে।

'কেন? পরে আমি অনেকবার ভেবেছি, এক-একটি যন্ত্রণা-কণ্টকিত বিনিদ্র রাত কেটেছে আর ভেবেছি, কেন সমস্ত জিনিসটাই এমন ব্যর্থ হল! বাধাটা আসলে কোথায়! ঠিক ঠাহর করতে পারিনি। সেই রাত্রিটার অনুভূতি স্মৃতি সব মিলে মিশে মনে একাকার হয়ে আছে।

'ও যখন পাশের ঘর থেকে পোশাকী পরিচ্ছদ বদলে ফিরে এল, আয়নার সম্মুখে বসল চিরুনি নিয়ে তখনও ওকে আমি কামনা করেছি। একবার ভেবেছি কাছে ডাকি। কিন্তু ডাকিনি। কী খেয়াল মাথায় চাপল, ভাবলুম, আমি যাব কেন, ওই আসুক না। একটু নতুনত্ব করা যাক। আমি এখানে এই দূরের হেলান-চেয়ারটাতে শুয়ে থাকি, দেখি ও আসে কি না! যেই আসবে, যেই আমাকে স্পর্শ করবে, আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে টেনে নেব। চোখ বুজে এই সব ভাবছিলুম, আসন্ন অসহ সুখানুভবের কল্পনায় আমার রোমাঞ্চ হয়েছিল।

'হয়ত এই বিচিত্র খেলার খেয়ালেই সব এলোমেলো হয়ে গেল। অস্বাভাবিক কিছু করতে গিয়েই বিপত্তি ঘটল। জানতুম মেয়েদের সহজাত সঙ্কোচ বেশী; অগ্রসর হতে হয় পুরুষকেই। নিয়মের ব্যতিক্রমে পরীক্ষাটা সফল হয় কি না চোখ বুজে তারই প্রতীক্ষা করে রইলুম।

'ও আসে না। ঘড়ির টকটক শুনছি, ঝিরঝিরে হাওয়ায় জানালার বাইরের শিরীষ গাছটা থেকে অনেক শুকনো পাতা ঝরে পড়ল, করবী এল তারও অনেক পরে। কানের কাছে শাড়ির খসখস শুনলুম। ও এসেছে। তখনও চোখ খুললুম না। দেখি না কী হয়, ও কী করে।

'শুনতে পেলাম, ও বলছে—কী হয়েছে তোমার! কী কষ্ট, আমাকে বল।

'এ কী গলা! ম্রিয়মাণ, যান্ত্রিক। আমি কি এরই প্রতীক্ষা করে ছিলুম!

'ও আমার কপালে হাত রাখল। নিরুত্তাপ হাত, হিমশীতল। এ ত আমি চাইনি। ঠিক কিসে আমার আশা ভঙ্গ হল বোঝাতে পারব না। আমি নিজেও ঠিক বুঝতে পারিনি। সে কি ওর কণ্ঠস্বরে নিপুণা একটি নার্সকেই শুনতে পেলুম বলে! ও প্রথমেই কষ্টের কথা তুলল কেন! ও ত নার্সদের বাঁধা আর অভ্যস্ত বুলি। আজকের রাত্রির গোড়ার কথা কি এই হওয়া উচিত?

'মিটমিট করে চাইলাম। হয়ত ভুল বুঝেছি, কিন্তু যে ভাবে ও চেয়েছিল তাতে সেদিন পাতালের এক ঝলক জলের মত একটা কথা মনের ওপরের স্তরে উঠে এসেছিল: আমি একজন পাসকরা পেশাদার ধাত্রী বা সেবিকাকেই বিয়ে করে এনেছি, ও কোনোদিন রক্তমাংসের স্ত্রী হতে পারবে না।

'তাই নিরাবেগ গলায় ওকে বলেছি—কিছু হয়নি। শুয়ে পড়।

'করবী দরখাস্তে বলেছে—পরে আমার মধ্যে, আমার আচরণেও

ও নারীদেহ বিষয়ে মোহ-বিকারহীন একজন চিকিৎসককেই দেখতে পেয়েছে।

'হয়ত ওর কথাও ঠিক। হয়ত ও যা বলেছে আমি তাই। আবার আমি যা ভেবেছি, ও নিজেও তাই হতে পারে। এটাই খুব সম্ভব সত্য যে আমরা দুজনেই ঠিক ভেবেছি ও বলছি। নিপুণা নার্স আর অভিজ্ঞ ডাক্তার মিলবে না কেন, মিলবে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে তারা ভালো জুটি। কিন্তু পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়। নিভৃত একান্ত জীবনে দুজনেই অন্য রকম সঙ্গী চায়। অন্যের কথা বলতে পারিনা, অন্তত আমরা তাই চেয়েছি! এই বিবাহটা একেবারে মিথ্যে হয়ে গিয়েছে সেই কারণে। এর চেয়ে বিচ্ছেদ শ্রেয়।'

"ধর্মাবতার, আমার মক্কেলও তার জবানন্দীর শেষে বলেছে, 'বিচ্ছেদই শ্রেয়।' অতএব অপর পক্ষের অর্থাৎ করবী রায়ের দরখাস্ত মঞ্জুর হোক, এ পক্ষের আপত্তি নেই।"

সমীকরণ

স্বদেশবাবু জেনেছেন, মেয়েটির নাম ঝিনুক। অন্তত এই নামে ওকে ওর মা ডাকে, বাবা ডাকে, পিসি ডাকে; ও সাড়া দেয়। স্বদেশবাবু ডাকলেও, যদি তিনি ডাকেন, যদি ডাকতে কোনোদিন তার সাহস হয়, হয়ত সাড়া দেবে। স্বদেশবাবু ঠিক জানেন না। কেন না, আজও পরখ করে দেখেননি। তিনি শুধু জেনেছেন। শুধু নামটুকু, মানে ডাক-নামটুকু। তোলা নামও নিশ্চয় একটা আছে, বইয়ের পাতায় বা স্কুল কলেজের খাতায়, সেটা জানবার সুযোগ স্বদেশবাবুর হয়নি। আট ফুট পরিসর গলির এ-পাশে কান খাড়া করে অতটা জানা যায় না। জানতে হলে কথা বলতে হয়, কথা বলতে হলে হাতছানি দিতে হয় বা চোখে চোখে ইসারা করতে হয়। ওসব কাজ যারা মরীয়া, যারা নাম লেখান বদমাস, তারা পারে অনতিনবীন অধ্যাপকেরা পারেন না, বিশেষত সেই অধ্যাপকেরা, যাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা আছে, সুনাম আছে। যাঁরা পথে বেরুলে, সিগারেট পিছনে লুকিয়ে ছাত্ররা বিনয়াবনত নমস্কার করে।

সেই সব অধ্যাপকেরা অতএব আটফুট চওড়া গলির এ-পাশ থেকে কান খাড়া করতে পারেন, বড়জোর হঠাৎ যেটুকু চোখে পড়ে, সেটুকু দেখতে পারেন।

দেখতে পারেন, যে-মেয়েটির নাম ঝিনুক, অন্তত ওই নামে যে সাড়া দেয়, সে সকালে উঠেই একবার পূবের বারান্দায় আসে। তখনও তার শাড়ি অগোছাল, তখনও তার চোখ ফোলাফোলা। সেই চোখ মুছে মুছে সে চাউনিকে সহজ করে, তারপর রেলিংয়ে কনুই রেখে বিস্ফারিত চোখে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে থাকে। কী দেখে সে জানে। রোজই ভোর হয়, সে জানে, কিন্তু জানে না কেন হয়, তা

রোজই বিভোর হয়ে ভাবে। একটি একটি করে পাখি রাস্তায় ও-পাশের ঝাঁকড়া-চুল দৈত্যের মতো দেখতে গাছটার আশ্রয় ছেড়ে আকাশে উড়ে যায়, ঝিনুক কি তাদের গোণে! কেন না ঠিক তখনই সে ঘরে ফিরে যায়, যখন আর পাতলা আড়ালের বাসা থেকে একটি পাখিরও উড়তে বাকি নেই।

ঝিনুককে আরও একবার দেখা যায়, খুব কম সময়ের জন্য। মুখটুখ ধুয়ে, সম্ভবতা চা-ও খেয়ে, যখন সে ফিরে আসে। তখন দৃষ্টির অস্বচ্ছতা ঘুচে গিয়েছে, সে খোলা জানালার সামনে এক মুহূর্ত দাঁড়ায়। তারপর রোগা সাদা একটা হাত বাড়িয়ে পরদা টেনে দেয়। এ জানালাটা পূবমুখী, এখন সকাল, রোদ ঠেকাতে ঝিনুক আবরু রচনা করেছে। জানালার ওদিককার টেবিলে বসে ঝিনুক বোধ হয় পড়া তৈরী করে।

ন'টা অবধি। তখন সে আবার বারান্দায় আসে, হাতে একমুঠো চাল, ছোলা বা খৈ, সেগুলো রাস্তায় ছড়িয়ে দেয়।

ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা আসে, গোল হয়ে বসে, ঠুকরে ঠুকরে খায়, আবার নিজেদের ঠোকরায়। ওদের যেমন রেষারেষি, তেমন ঘেঁষাঘেঁষি। খাওয়া শেষে সব পায়রা ফের উড়ে যায়। তখন সেই মেয়েটি, ঝিনুক, হাতের তেলো দিয়ে এলো চুল ঘষে।

এখন তার স্নানের সময়, নইলে কাঁধে কেন তোয়ালে থাকবে আর কনুইয়ের ভাঁজে শুকনো শায়া, ব্লাউজ, শাড়ি।

স্নান সেরে সেই মেয়ে আবার ফিরে আসে। অন্য সময় তার যে চুল কাঁপা কাঁপা আর ফাঁপান লাগে, সেই চুলই কালো চুলের মতো পিঠে ছড়ান, ভিজে, টান টান, কিন্তু আরও যেন ঘন। শুকনো শাড়িটাই পরণে, কিন্তু পরিপাটি করে পরা নয়, শিথিল করে জড়ানো। চোখ দুটি আরও বিশাল, নিষ্পাপ আর আয়ত। তখন পায়ের ওপর ভর দিয়ে আরও একটু লম্বা হয় ঝিনুক, সামনের তারটায় ভিজে জামা-কাপড় মেলে দেয়।

সে নিজেই তখন আড়ালে পড়ে যায়, সে বোধ হয় চলেও যায়। স্কুলে কিংবা কলেজে। স্বদেশবাবু ঠিক জানেন না। তাঁর নিজেরও তখন কলেজে যাবার তাড়া কিনা।

খুব কাছাকাছি থেকে দেখেছেন মোটে দু' একবার। ট্রাম-স্টপে। কথা হয়নি। হওয়া সম্ভব নয়। স্বদেশবাবুর তখন চোখে চশমা, মুখে মুখোস। প্রতিবেশী নতুন ভাড়াটেদের মেয়েটি যে তাঁর চেনা, ভাবলেশহীন মুখে তার আভাস মাত্র দেখা যেত না।

বরং তাকে বিকেলে দেখতেই ভালো লাগত। ক্লান্ত শরীর আর হেলান চেয়ারটা টেনে স্বদেশবাবু যখন ছোট ছাদটাতে বসতেন। বসতেন আগেও, তখন শুধু এক একটি বিকেলের রক্তাক্ত মৃত্যু আর সন্ধ্যার বিষণ্ণ জন্ম প্রত্যহ চেয়ে চেয়ে দেখতেন। ঝিরঝিরে হাওয়া দিত, স্বদেশবাবু চোখ বুঁজে ঘ্রাণ নিতেন। যেন চিনতে চাইতেন কোন গন্ধ, কোন ফুলের। দু' একটি সুতো ছেঁড়া ঘুড়ি পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ত, অনেক দূরে বেতারের ভুতুড়ে খুঁটিতে হুঁশিয়ারি জ্বলত। একটি নীলোজ্জ্বল সলজ্জ বিন্দু আকাশের কোণে কাঁপত, তার নাম সন্ধ্যাতারা। তারপর হালকা আর ভারী, সাদা আর ধূসর নানা রকমের মেঘে ভর দিয়ে আকাশটাই ধীরে ধীরে নীচে আনত।

আকাশকে যারা স্থির বলে জানে তারা ঠিক জানে না স্বদেশবাবু এটা অনেকদিনই লক্ষ্য করেছেন। এমনিতে টলটলে, নীল, গভীর, তখন যে অনেক উঁচুতে চলে যায়, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে সে ধ্যানমৌন। আবার কখনও চঞ্চল হয়, নীচে নামে, মনে হয় হাত বাড়ালে তাকে বুঝি ছোঁয়া যাবে।

সেই বিকেল আর আকাশ আর ঝিনুক, এই তিনে মিলে এখন এক হয়ে গিয়েছে। কলেজ থেকে ফিরে এসেছে ঝিনুক, অনেকক্ষণ কলঘরে গিয়ে বুঝি গায়ে জল ঢেলেছে। খোঁপা সে বাঁধে না, কিন্তু এই সময়ে চিরুণী টেনে টেনে চুলগুলো সুবিন্যস্ত করে। মুখে পাউডারের হালকা একটি প্রলেপ থাকে, কমলা, বা কামরাঙা রঙের

শাড়ি পরে। একটু পরিপাটি এখন মেয়েটি। ছাদে উঠে কার্নিসে হাত রাখে। এই সময়ে তাকে খুব নিঃসঙ্গ লাগে। সে যত কাছের ততই দূরের। ঝিনুক তখন ঘরে ফেরা পাখিদের গোণে। তারা গোণে। ছাদের টবে সতেজ কয়েকটি ফুলের চারা, তাদের পাতা আলগোছে ছোঁয়, একটি কি দুটি কুঁড়ি তুলে চুলে পরে। তারপর রাত এসে মেয়েটিকে মুছে দেয়, তখন স্বদেশবাবু ওঠেন।

স্বদেশবাবু ঘুলঘুলিটাও বন্ধ করে দিলেন। তাঁর বুক দুরদুর করছিল কান আরক্ত হয়েছিল। পা কাঁপছিল। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল বলে জল খেলেন, কিন্তু জানালার পাশে কে যেন আবার তাঁকে টেনে নিয়ে এল। আবার সন্তর্পণে একটুও শব্দ না করে খড়খড়ি তুললেন।

জোর হাওয়া দিয়েছে বাইরে, ও বাড়ির জানালার পরদা কয়েকবার উড়ে হঠাৎ একটা শিকের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। ওদের ঘরটাই এখন যেন বড়ো বেসামাল আর বে-আব্রু।

ঘরটা তো নয়, ঘরের ভেতর যে শুয়ে আছে, সে।

রবিবারের দুপুর, নিজের নিরিবিলি ঘরটিতে শুয়ে শুয়ে কী একটা বই পড়ছিল। সে তো আর জানে না, হঠাৎ হাওয়া উঠবে, জানালার পরদাটা করবে বেইমানি, তার বিবশ, বিবেশপ্রায় রূপটি এমন অসতর্ক-ভাবে অন্যের চোখে পড়ে যাবে।

স্বদেশবাবু লজ্জা পেয়েছিলেন। নিজের দিকের জানালাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু খড়খড়ির চোখ বোঁজে না যে। সেটা ধরে টানাটানি করতেও আরও খানিকটা সময় গেল। গড়িয়ে পড়া গ্লাসের জল যেভাবে ঢালু দিকেই বয়ে যায়, স্বদেশবাবুর দৃষ্টিও তেমনি আরও কয়েকবার ওদিকেই—ছিঃ!

কৃশ, নীরব পাণ্ডুর একটি মেয়ে শুধু ক্লান্ত, করুণ আর শিথিল শোবার ভঙ্গিতেই এত সুন্দর হতে পারে! দুটি পায়ের পাতা যেন সাদা দুটি পদ্মফুল। অনাবৃত পায়ের ডৌলটি আবৃত। হাতের বইটি

খসে পড়েছে, অসাবধান বুকের ওঠা-পড়ার ছন্দটি এখান থেকেও যেন অনুভব করা যায়। লিক্‌লিকে ছুটি হাত দেখে যা মনে হয় তত অপুষ্ট নয় তো। এলানো চুলের একটি গুচ্ছ শুভ্র গ্রীবাতটে, যেন সানুদেশের নিকষ কালো নদী।

স্বদেশবাবু নিজেকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এলেন। আরও এক গ্লাস জল খেতে হল।

মাথার ওপরের রডটা চেপে ধরেও ঝাঁকুনি সামলাতে পারেন নি স্বদেশবাবু, টলে পড়ছিলেন, আর টাল সামলাতে হল বলেই দেখতে পেলেন।

ঝিনুক নামে মেয়েটিও এই বাসেই আছে। শুকনো মুখ, বোধ হয় কলেজ থেকে ফিরছে। এক হাতে বই, অন্য হাতটা রেখেছে সীটের পিঠে। বসতে হয়নি। লেডীজ সীট খালি নেই একটিও।

আড় চোখে চেয়ে চেয়ে যতটুকু বুঝতে পারলেন স্বদেশবাবু, এভাবে চলা ফেরা করতে মেয়েটি অনভ্যস্ত। রোজই বোধ হয় পায়, আজ পায়নি। আজ ভিড় কিছু বেশি। বিকেল থেকেই গুমোট হয়েছে, বৃষ্টি যেন নামে-নামে। কোঁচার খুঁটে স্বদেশবাবু কপালের ঘাম মুছলেন।

আবার বাস থামল, আবার ঝাঁকুনি খেলেন স্বদেশবাবু, খেতে খেতেই টের পেলেন, আরও লোক উঠল। ঝিনুক মেয়েটি এখনও বসতে পায়নি, কেউ নামেনি, আগের মতই লজ্জিত ভঙ্গিতে একটা সীটের সঙ্গে এক রকম মিশে দাঁড়িয়ে আছে। ওর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এল কত জন, ভীরু বিব্রত মেয়েটাকে কনুই দিয়ে সরিয়ে, হয়ত বা পা মাড়িয়ে সামনে এল। ওরই মধ্যে সূক্ষ্ম দেহধারী আত্মার মত কন্‌ডাক্‌টর চলা ফেরা করছে। মায়া বোধ করলেন স্বদেশবাবু, তিনি নিজেও যে দাঁড়িয়ে, নইলে মেয়েটিকে ডেকে নিজের আসন

ছেড়ে দিতেন। যারা বসে আছে, যারা ঠেলাঠেলি করে সামনে আসতে চাইছে, তাদের স্বদেশবাবু মনে মনে তিরস্কার করলেন, 'তোমরা অভদ্র ; তোমরা পশু, তোমরা মেয়েদের প্রাপ্য সম্মান দিতে জান না।'

কালো বলিষ্ঠ লোকটাকেও তিনি কিছুক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিলেন। কোথায় ছিল কে জানে, লোকটা একটু একটু করে এগিয়ে ঝিনুকের পিছে এসেছে, পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। পরণে হাফ শার্ট, বুকের বোতাম খোলা, চুল ফেরানো মাথা, একটু লাল্‌চে চোখ, কিন্তু বড়ো বড়ো। ঝিনুকের কাঁধের আঁচল এই ভীড়ে সামান্য সরে গিয়েছে, লোকটার লুব্ধ একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ সেখানেই ; যেখানে দু'টি বিনুনি-প্রবাহের প্রয়াগ।

ঝিনুকের হাত সীটের যেখানে, লোকটা সেখানেই হাত রাখল। ঝিনুক হাত সরিয়ে নিল। কপালে ঘামের ফোঁটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, শুধু গরমে বোধ হয় নয়, অস্বস্তিতে। স্বদেশবাবু একবার যেন শুনতে গেলেন, ঝিনুক অস্ফুট গলায় বলে উঠল, 'উঃ'! এদিক ওদিক চাইল। ওই বদমাসটা কী করেছে, পায়ে চাপ দিয়েছে নাকি মেয়েটার ? স্বদেশবাবুব কপালের রগ দুটি স্ফীত হয়ে উঠল। অসহায় মেয়েটি কাউকে কিছু বলতে পারছে না। মুখ বুঁজে সয়ে যাচ্ছে, এখনও কি তাঁর পোষাকি ভদ্রতার মুখোস এঁটে রড ধরেই ঝুলতে থাকবেন স্বদেশবাবু ? প্রবীণ প্রতিবেশী হিসেবে, সুস্থ নাগরিক হিসেবে তাঁর করণীয় কিছু কি নেই।

রড ছেড়ে স্বদেশবাবু আস্তে আস্তে পিছিয়ে আসতে চেষ্টা করলেন।

তারপর কী ঘটেছিল ঠিক মনে নেই। টাল সামলাবার ছুতোয় দুঃসাহসী লোকটা বুঝি ঝিনুকের কাঁধেই হাত রেখেছিল। কখন থর

থর রাগে স্বদেশবাবু তার গালে এক চড় বসিয়ে দিয়েছেন। কিচ্ছু খেয়াল নেই। দাঁতে দাঁত চেপে বোধ হয় বলেছিলেন, 'অসভ্য বর্বর, পশু।' দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন, প্রৌঢ় বয়সের ভারসাম্য, সংযম কিচ্ছু ছিল না।

মনে আছে, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ একটা হৈ-চৈ হয়েছিল। বাসশুদ্ধ লোক কী করে পলকে ব্যাপারটা টের পেয়ে গিয়েছিল। আরও কিল চড়, ঘুষি এই লোকটার বুক, পিঠ মাথা লক্ষ্য করে এক পশলা ঝড়-বৃষ্টির মত ভেঙ্গে পড়ল। একজন বলল পুলিশে দাও, আর এক জন বলল, পুলিশে কাজ কী, আমরাই উচিত মতো শিক্ষা দিচ্ছি ওকে, মেয়েদের গায়ে হাত দেবার সুখ পেয়েছে, এবার ধোলাই কাকে বলে জানুক, সুখের সুদটুকুও পেয়ে যাক। একজন লোকটার চুলের মুঠিও ধরেছিল।

তবু লোকটাকে বাহাদুর বলতে হবে, মাথা নীচু করে কয়েকটা মার এড়িয়ে গেল, এবং সমবেত আক্রমণেও বিহ্বল বা বুদ্ধিভ্রষ্ট হল না। পিছলে সরে সরে একবারে চলন্ত বাস থেকে লাফিয়ে পড়ল। যাত্রীরা চেঁচিয়ে বললেন, ধর, ধর, পালায় যে, এই কনডাকটর বাঁধকে। কিন্তু গাড়ি বাঁধল না, নামতেও গেলেন না কেউ, সকলেরই তখন বাসায় যাবার তাড়া। একটা গলির মধ্যে লোকটা পলকে অদৃশ্য হল।

স্বদেশবাবু হাঁপাচ্ছিলেন। বাস থেকে নেমেছেন বাসার কাছাকাছি স্টপে, মেয়েটিও নেমেছে। এতক্ষণ ও একটি কথাও বলেনি। বসবার একটু জায়গা পরে পেয়েছিল। এক কোণে আড়ষ্ট হয়ে ছিল। কোলের বইয়ে লুকিয়েছিল মুখ।

একটু দাঁড়ালেন স্বদেশবাবু, আসুক, ও আসুক, আজ ও উত্তেজিত, ভীত, বিব্রত, আজ এই রাস্তাটুকু ওর সঙ্গে সঙ্গে কারুর থাকা ভালো।

ওর দিকে একবার চাইল ঝিনুক, পরক্ষণে চোখ নামাল।

স্বদেশবাবু দেখলেন, তখনও ওর গালে ছোপছোপ লাল, পায়ের পাতায় শাড়ি কেবলই জড়িয়ে যাচ্ছে।

'তুমি তো আমাদের পাশের বাসাতেই থাক?' স্বদেশবাবুই প্রথমে কথা বললেন, 'তোমরা নতুন এসেছ, না?'

ঝিনুক ঘাড় কাত করে জানাল, 'হাঁ!'

'আজ খুব বেঁচেছ', স্বদেশবাবু আবার বললেন, গলাটা পরিষ্কার করে, 'মেয়েদের একলা চলাফেরা করায় সত্যিই অনেক বিপদ। কত ভদ্রবেশী শয়তান যে লুকিয়ে থাকে। একটু সুযোগ পেলেই—'

'আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন', ঝিনুক বলল নম্রস্বরে, কালো কৃতজ্ঞ দুটি চোখ তুলে।

উৎসাহিত হয়ে স্বদেশবাবু বলে চলেছিলেন, 'না না, এমন আর কী। ওটুকু তো আমার কর্তব্য। যাক, জানোয়ারটা আচ্ছামতন সাজাই পেয়েছে।'—বলতে বলতে হঠাৎ থমকে গেলেন। মেয়েটির চোখে নিজের ছায়া হঠাৎ দেখতে পেয়ে চমকে গিয়েছেন। স্বদেশবাবুর মুখের সব রক্ত কেউ যেন নিমেষে শুষে নিল।

মুখে আর কথা ফুটল না, স্বদেশবাবু মনে মনে বললেন, 'কাকে জানোয়ার বলছি। আমিও কি লুকিয়ে লুকিয়ে ওকে কতদিন দেখিনি!' ঝিনুক যেদিন অসতর্ক অগোছাল হয়ে ঘরে ঘুমিয়েছিল, সেদিনের কথাও মনে পড়ল। সেদিন তিনি চোখ ফেরাতে পারেননি। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে এক মুহূর্ত তো দেখেছেন। পলকের দুর্বলতা, কিন্তু সেটাও গুপ্ত চৌর্যই।

'আজ', স্বদেশবাবু আবার ভাবলেন, 'আজ এখন ও থরথর করে কাঁপছে, বিকেলের ঘটনাটা ওর স্নায়ুগুলোকে নাড়া দিয়েছে, আমার ইচ্ছে আশ্বস্ত করবার জন্যে ওর কাঁধে একটিবার হাত রাখি, ভীরু মেয়েটিকে ওর সাহস ফিরিয়ে দিই। কিন্তু পারছি না। ভয় করছে, ভরসা পাচ্ছি না। বাসের ওই লোকটা ওকে ছুঁতে চেয়েছিল,

পেরেছিল। আমিও মনে মনে কতবার ওকে স্পর্শ করতে চেয়েছি, সাহস পাইনি।'

তফাৎ এইটুকু, শুধু কি এইটুকু? ভদ্র নাগরিক, সৌম্য প্রৌঢ়প্রায় অধ্যাপক চমকে উঠলেন।

ঘরে ফিরে সেদিন ডায়েরির পাতা খুলে স্বদেশবাবু ঘটনাটি লিখে রেখেছিলেন। কোন কথাটি দিয়ে শেষ করবেন, কিছুতেই ঠিক করতে পারছিলেন না, অনেক ভেবে শেষে খসখস করে লিখেছিলেন, 'আমরা অনেকেই সচ্চরিত্র যেহেতু কাপুরুষ।'

সুচিরাকে

এই লেখাটা তোমার চোখে পড়বে কিনা জানি না সুচিরা, না পড়লে কিন্তু নিশ্চিন্ত হই। অসঙ্কোচে আমার সেই লজ্জার কথাটা বলতে পারি।

এসব কথা অবশ্য লোকে ঘটা করে বলে না। আমরা অনেকেই কিল খেয়ে কিল চুরি করে থাকি কিনা। তবে ঘটনাটা খুব ছোট আর তুচ্ছ আর পুরনো ত, এখন বলতে তাই বাধা নেই। তখনকার আমি আর এখনকার আমি অনেকটাই আলাদা হয়ে গিয়েছি, কাজেই সেই-আমির একটা বোকামি নিয়ে ঠাট্টা করতেও আমার আপত্তি নেই। মনে হবে যেন অন্য কারুর কথা বলছি।

জানতে সাধ হয় সুচিরা, তুমি এখন দেখতে কেমন হয়েছ। তখন ত তুমি— সংস্কৃত করে বলব ?—প্রভা-তরল দ্যুতির মত ছিলে। ছিলে যে, তা তুমিও জানতে। সাজতে ভালোবাসতে। আর আয়নার সামনে বসে নিজেকেই বিভোর হয়ে দেখতে। আর শাড়ির সঙ্গে জামার রঙ ম্যাচ করানোর উপায় জানতে। ধর, সবুজ ব্লাউজ যদি পরেছ তবে বর্ডার হত সোনালী, শাড়ি নীল। পীতে-হরিতে-নীলে মিলে মিশে প্রায় ইন্দ্রধনুর শোভা হত।

জানি না শরীরটাকে এখনও ছিপছিপে রাখতে পেরেছ কি না, জীবনে যে স্বাচ্ছন্দ্য চেয়েছিলে, তার কতটা পেয়েছ। আচ্ছা বল ত, তোমার কি পোষা দুটি কুকুর আছে ? তারা বুঝি অসম্ভ্রান্ত কেউ বাড়ির হাতায় ঢুকলে তেড়ে আসে আর মানী লোক দেখলে শুধু জুতো শুঁকে চলে যায় ? তোমাদের বাগানের কোণে কোণে কি রৌদ্রের দর্পহারী রঙিন ছাতা আছে ? একটু বাড় দেখলেই ঘাসগুলোর মাথা

মুড়িয়ে জল ঢেলে দাও? আর তোমার সব চেয়ে বড়ো শো-পিস,—তোমার ইঞ্জিনিয়ার স্বামী? তিনি কি এখনও তেমনই তুখোড় সাহেব? যিনি হাসেন, হাসি পেয়েছে বলে নয়—ঝকঝকে দাঁতের সারি দেখাতে। তাঁর বিলাতী ধরনের হাসি কতবার দেখেছি। তাঁর কাশিটা শুনিনি, যদিও ঘন ঘন সিগারেট খেতে দেখেছি। সেই দামী সিগারেটে আমার লোভ ছিল। বিচক্ষণ লোক ত, আমার দুর্বলতাটুকু অনুমান করেছিলেন। প্রথম আলাপেই একটা সিগারেট অফার করেছিলেন। তোমার মনে আছে? সেখানে ত তুমিও ছিলে। উলের বলটাকে মাটিতে ফেলছিলে আর তুলছিলে।

স্বচ্ছন্দের কথাটা না হয় ধরেই নিলুম, এবার খুব আস্তে তোমাকে সুখের কথা জিজ্ঞাসা করি। তুড়ি দিয়ে যে ভাবে আয়া-আরদালীকে তলব কর, সুখকেও কি সেইভাবে খুব সহজে মনের মধ্যে ডেকে আনতে পার? অনেক সাধই তোমার পূর্ণ হয়েছে জানি, কিন্তু যা-কিছু চেয়েছিলে, সব কি পেয়েছ?

তোমার অন্তত একটি অপূর্ণ সাধের কথা জানি। সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে নাম করতে চেয়েছিলে। পারনি। তোমার নাম ত কোথাও শুনিনে। বড় জোর আজও পাড়ার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ছোটখাটো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দুধের স্বাদ মেটাচ্ছ।

আমাদের সেই মফস্বল শহরে কিন্তু, সুচিরা, তোমার পাশাপাশি দাঁড়াবার মতনও কেউ ছিল না। এসেই চমক লাগিয়ে দিয়েছিলে। আমরা কূপের সব কটি মণ্ডূক প্রথমে সন্ত্রস্ত হলেও পরে মহানন্দে ডাকতে শুরু করেছিলুম।

ডাকব নাই বা কেন! মেয়ে ত ঘরে ঘরেই আছে, তাদের বেশির ভাগই ভীত, আড়ষ্ট বয়সের ভারে বিব্রত; যেন বয়সটা বেড়ে গেছে। এটা তাদেরই দোষ। মনে রেখো সেই আমলের কথা বলছি, যখন আমাদের সেই মফস্বল শহরে মেয়েরা বাইরে বেশি বেরতে পেত না। তাদের দেখা যেত বাড়ির জানলায়, গবাক্ষে মুখ রেখে করুণ চোখ দিয়ে

তালগাছের মাথায় শকুনের বাসা দেখছে! কাঁঠালপাতায় তেল মাখিয়ে কাজল পরত; বিনুনি ঝুলিয়ে প্রাইমারি স্কুলে পড়ার পাঠ চুকলে পাতা কেটে চুল বাঁধত। বিধিদত্ত যেটুকু রূপ, তাকে ফুঁ দিয়ে বাড়িয়ে তোলার কৌশল প্রায় জানতই না। লুকিয়ে পড়ত নবেল; অনেকে তাও পড়ত না; কেননা বার কয়েক সেজেগুজে পাত্রপক্ষের সামনে পরীক্ষা দিয়ে উতরে গেলেই স্বামীর ঘর করতে চলে যেত। ফিরে আসত যখন, তখন কোলে-কাঁখে ছেলে।

তুমি ত একেবারে আলাদা জগৎ থেকে এসেছিলেন। সাত দিনেই সাড়া পড়ে গেল। কানাঘুষায় শুনলুম, নতুন সব-জজের মেয়েটি একেবারে মেমসাহেব।

মেমসাহেব! যে মেয়ে ঘুরিয়ে জংলা ছাপের সিল্কের শাড়ি পরে, চুল ফাঁপায় আর উঁচু গোড়ালির জুতো পরে মাটির ইঞ্চিখানেক ওপর দিয়ে চলে, তাকে বর্ণনা করার জন্যে আমরা ওই একটি কথা সেদিন খুঁজে পেয়েছিলুম: মেমসাহেব।

দুবার বি. এ-ফেল করে বাড়িতে বসে আছি, দুপুরে তাস খেলি, বিকেলে সাইকেলে চড়ে চক্কর দিয়ে ফিরি, সন্ধ্যাবেলা পাবলিক লাইব্রেরিতে আড্ডা দিই, কিংবা পুজোয় কোন্ ঐতিহাসিক প্লে-টা জমবে সেই পরামর্শ করি।

আমাদের আলোচনার আরও একটা বিষয় বাড়ল, তুমি। আমরা বলাবলি করতুম, 'মেমসাহেব!' মেমসাহেব। তার মানে রঙ কটা? কটা বলতে কটা! সার্কেল-অফিসারের ছেলে নাজির বলত, একেবারে মুর্গীর ডিমের মত কটা, লালচে আভাও আছে। আমরা তখন ফরসা রক্তকে কটা বলতাম। ঠোঁট কেমন? মোরগের ঝুঁটির মতো টুকটুকে। আর চোখ? বলতে পারব না। আমাদের দিকে তাকায় না ত।

নাম? তাও এ দিন জানা গেল। পোস্ট-অফিস থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে একদিন ফিরে এল নীরদ, বলল, জেনে এসেছি।

কী? না, নাম। কী নাম? সুচিরা। একটা পার্শেল

এসেছে তোমার নামে, তার ওপরে বড়ো বড়ো করে ওই নামটাই লেখা আছে।

সুচিরা। সেই কমলা-বিভা-শান্তিদের যুগে তোমার নামটাও চেহারার মতোই চমক-লাগানো।

আলাপ করা যায় না? আমরা বলে উঠলুম, নিশ্চয়ই যায়। কেন যাবে না! আমরাই আবার একটু পরে বললুম, খুব সহজও না। আলাপ হয়ত করবেই না। কলকাতার ফিরিঙ্গী স্কুল থেকে পাস-করা মেয়ে, মফস্বলের কয়েকটি নিষ্কর্মা ছেলেকে আমল দেবে না, এটুকু বোঝবার বুদ্ধি আমাদের ছিল।

তা ছাড়া গিয়ে দাঁড়ানোর ছুতোও ত চাই। কী বলব? একজন বললে, 'ধর, যদি বলি আমাদের ক্লাবের সরস্বতী-পুজোর ফাংশনে আপনাকে গাইতে হবে?

গাইবে কেন? আমাদের অনুষ্ঠান মানে ত শখের থিয়েটার! অর্থাৎ যাত্রা। বেশির ভাগই পৌরাণিক নাটক। সে সবে কি ওরা আসে?

তুমি নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ। ভাবছ, আমাদের রুচি নামে জিনিসটাই ছিল না। অচেনা একটি মেয়েকে নিয়ে কি এত আলোচনা করাটা সুরুচি?

তোমার কাছে স্বীকার করি, আমাদের মধ্যে এইসব আলোচনাই চলত। বেকার ছেলেদের নিরাশ জীবনে ও ছাড়া আর কী-ই বা বৈচিত্র্য ছিল!

বড়াই করে তোমাদের বাসায় গেলুম বটে, কিন্তু গেটের বাইরে সাইকেলটা কাত করে রেখে তোমাদের বারান্দায় যখন গিয়ে দাঁড়ালুম তখন আমার বুক দুরদুর করছিল।

খবর পাঠাতে হবে, কাকে ধরি, কাকে বলি। এ সব অভ্যাস ত আবার আমাদের নেই। আমরা যখন-তখন যার-তার বাসায় যাই, সাইকেলের দুপাশ দিয়ে পা নামিয়ে দিয়ে মাটি ছুঁই, ক্রিং ক্রিং করে

হুট করে চলে যাই একেবারে ভিতরে, 'মাসিমা' বলে একবার হাঁক দিয়ে রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে বসে পড়ি।

সাত-পাঁচ ভেবে হয়ত ফিরেই আসতুম, কিন্তু ভাগ্য ভাল, আপনা থেকেই দরজা খুলে গেল, বেরিয়ে এলে তুমি। একেবারে মুখোমুখি সেই প্রথম দেখলাম। মাথায় চিরুনিটা গোঁজা, খুব হালকা নীল রঙের একটা শাড়ি পরে আছ, পায়ে স্যাণ্ডাল। সহজ পোশাকেও তুমি কত সুন্দর, দেখলুম। টুপি টাঙানোর র‍্যাকটায় ঝুলছিল আয়না, সেটায় আমাকেও দেখতে পেলুম। শাদা টুইলের শার্ট, কলার ফাটা, ইস্ত্রিটাও ভাল করে করা নেই। নিজের চেহারা এবং পোশাকের দীনতার জন্যে সেই প্রথম কুণ্ঠাবোধ করলুম।

জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে বললে, আপনি? ভেবেছিলাম বসতে বলবে। একবারও বলনি। টানা-পাখা চলছিল, কিন্তু টানা-পাখায় গরম যায় নাকি! রুমাল নেই, ধুতিটাকে পরে আছি মালকোঁচা দিয়ে মুখটা একটু সাহস ফিরিয়ে আনব সে উপায় কই!

বললাম, একেবারে নির্বোধের মতো বললাম—আমাদের একটা ক্লাব আছে।

ও বুঝেছি। বাবার কাছে চাঁদা চাইতে এসেছেন?

ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, না, আপনার কাছে।

বলার ভঙ্গিতে নিশ্চয় হাস্যকর কিছু ছিল, তুমি একটুখানি হাসতে গিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছ। মনে হল যেন ভ্রূকুটি করলে। তখনও জানি না যে তোমার ভ্রূকুটি মানে বিরক্তি নয়। ভুরু দুটি কাছাকাছি হলে তোমাকে আরও ভাল দেখায়। তুমি ত সেটা জান।

আমি কিন্তু ভয় পেয়েছিলুম। কোথায় গেল সাহস, মনের ভিতরে চেয়ে তাকে কোথাও খুঁজে পাইনে। ব্যূহে ঢুকে পড়েছি, এখন সশরীরে বেরুতে পারলে বাঁচি। গড়গড় করে বলেছিলুম, আমরা একটা ফাংশন অর্গানাইজ করছি, যদি আপনি পার্টিসিপেট করেন—

তোমাকে মুগ্ধ করতে অনেকগুলোই ইংরেজী শব্দ পর পর বলে ফেলেছিলুম, মনে আছে। তুমি হাসি লুকোতে সেদিন মুখ ফিরিয়ে ছিলে কেন! আচ্ছা, আমার উচ্চারণে কি ভুল ছিল?

উত্তর দিয়েছি, মাঝে মাঝে থিয়েটার করি।

—তার মানে পুরুষেরাই ফিমেল পার্ট করে ত? মাপ করবেন, এ সবের মধ্যে আমি যেতে পারব না। আচ্ছা, নমস্কার। বলেই ভিতরে চলে গিয়েছিলে, আমাকে প্রতিনমস্কার করবার সুযোগও দাও নি

না, সেদিন ঠিক অপমান করেছিলে বলতে পারব না, তবে যে তাচ্ছিল্য তোমার মুখে ফুটে উঠেছিল, সেটা আমি অনেক দিন ভুলতে পারিনি। ভাগ্যিস আমার জামার পিছন দিকটা তোমার চোখে পড়েনি—ওটা ঘামে ভিজে পিঠের সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েছিল

বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার লোভ তখনকার মতো ওখানেই ইতি পড়েছিল। এমন কি, তোমাকে ঘিরে প্রাথমিক চাঞ্চল্যটাও যে একটু থিতিয়ে আসছিল। বড়লোকের মেয়ে তাতে আবার কলকাতা লেখাপড়া শিখছ, তোমার চাল-চলন একটু আলাদা রকমের হবে বই কি। তুমি ত খুটখুট করে জানান দিয়ে রাস্তা চলবেই, রঙিন বেঁটে ছাতাটার আড়ালে রোদে-তাতা মুখখানার আভাস মাত্র দেখা যাবে: মাঝে মাঝে মুখশ্রী মেরামত করতে মাঝপথে দাঁড়িয়েই ছোট আয়নাটা সামনে ধরে পাউডার বোলাবে। আমরা বলাবলি করতাম 'আমরা পাঁচজন দেখছি, ওর লজ্জা করে না?'

আমাদের কেউ আবার বলত, 'লজ্জা আবার কী! এখানকার কাউকে ও আবার মানুষ বলে মনে করে নাকি!'

করে না, সে ত জানি। তবু মনের কাঙালপনা কোথায় যাবে বিকেলে বন্ধুর মনিহারী দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছি, কাজ-টাজ নেই কোন্ চুলোয় বা যাব, তোমাকে সেখানে দেখে আমরা সকলে শশব্যস্ত হয়ে উঠলুম। একেবারে নিঃসঙ্কোচে ভিতরে ঢুকে কাউন্টারের সামনে দাঁড়ালে।—ডি এম সি. সুতো আছে আপনাদের?

—আছে।

কিন্তু যে রঙের নমুনা দেখালে, অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেও তা পাওয়া গেল না। একটু হতাশ, একটু বা বিরক্ত হয়েও বললে, 'কী জায়গা এটা! এই সামান্য জিনিসটাও কলকাতা থেকে আনিয়ে নিতে হবে?'

জায়গার সম্মান রাখতে না আলাপটা ঝালিয়ে নিতে আমি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিলুম, আমি নিজেও জানি না। বললুম, জেলা-সদরে বোধ হয় পাওয়া যেতে পারে। নমুনাটা আমাকে দেবেন? একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি'

পরদিনই জিনিসটা পৌঁছেও দিয়ে এসেছিলাম। সেদিন কিন্তু বিশেষ ভয় করেনি। জিনিসটি পেয়ে তুমি খুশী হয়েছিলে কিনা, মিষ্টি করে হেসেছিলে। দামের সঙ্গে আমার গাড়ি ভাড়াও যখন দিতে চাইলে, নিইনি। বলেছি, সামান্য কাজের জন্যে আবার—

নতুন একটা কাজের ফরমাস নিয়ে সেদিন চলে এসেছি। একটু খারাপ লাগত আমার, যখনই যেতুম, হেসেই কথা বলতে, কিন্তু কোনোদিন বসতে বলনি। কাজটুকু শেষ হতেই বলেছ, 'আচ্ছা নমস্কার।' একটু বসে গল্প করতে দিলে কী ক্ষতি হত, না কি ভাবতে আমাদের ক্লাসেব ছেলের সঙ্গে বসে কথা বলায় তোমাদের মানহানি?

তবু আমাদের শীতকালের থিয়েটারটা দেখতে এসেছিলে বলে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমিই গিয়ে কার্ডটা গছিয়ে এসেছিলুম; দেখতে সত্যিই আসবে এতটা আশা করিনি। এলে কিন্তু, হয়ত আমার খাতিরেই এলে। দুটো অঙ্কের মাঝখানে বিরতির সময় গ্রীনরুমেও এসেছিলে। বলেছ, 'চমৎকার হচ্ছে কিন্তু আপনার অভিনয়। মেয়েদের এত নিখুঁতভাবে নকল করতে পারেন আপনি?'

আমি ফিমেল পার্টে নেমেছিলুম। তোমার প্রশংসা পেয়ে সেদিন প্রাণ ঢেলে দিয়ে অভিনয় করেছি।

কিন্তু তখনও বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনিয়ার অলক মজুমদারকে দেখিনি। যে দিন তার মোটর সাইকেলের সাইড-কারে বসে শহর ঘুরে বেড়াল

সেদিন শহরে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। কে, কে এই লোকটি, যা ট্রাউজারের ভাঁজে কোনো খুঁত নেই, কড়কড়ে কলারের নীচে নিত্য নতুন টাই, জুতোয় একবিন্দু ধুলো নেই, মুখে সিগারেটের নে কামাই? জানতেও দেরি হল না। নাম পরিচয় সব জেনে ফেললুম দূর-সম্পর্কের যে ছুতো ধরে তোমাদের বাসায় এসে উঠেছেন, সেট বেশী দিন দূরে থাকবে না, শীগগিরই কাছে হবে, তার আভাস পেলুম। এমন কি একদিন আলাপও হল। তুমিই করিয়ে দিলে লনে দুজনে বসে ছিলে চেয়ার পেতে। আমাকে সাইকেলে করে যেতে দেখে ডাকলে। বললে, 'অলক, জান ইনি একজন আর্টিষ্ট বেশ ভাল অ্যাক্টর। মেয়েদের পার্ট এমন চমৎকার করেন কী বলব।'

অলকবাবু বললেন, 'সত্যি? মেয়েদের পার্ট করেন আপনি? **I should say that's rather interesting.** কী করে করেন বলুন ত? গলাটাকে মিহি করেন কী করে?'

আমি লজ্জিত বিনীত ভঙ্গিতে হাসলুম।

'একটু শোনাবেন? ছোট্ট একটা পিস্?'

আমার বিবেচনা-বোধ একেবারে তিরোহিত হয়নি। বললুম, 'এখানে কী, এখন কী—পরে শোনাব। আমাদের বড়দিনের প্লে-টা আপনি নিশ্চয়ই দেখছেন?'

'বড়দিন?' দাঁতে ঠোঁট চেপে মজুমদার সাহেব একটু ভাবলেন, মুখে ঈষৎ হাসি খেলে গেল। 'বড়দিন? **But by Christmas we should be in Bombay! Both of us**—না সুচিরা?'

সাহেব চাইলেন তোমার দিকে। তুমি মাথা নিচু করলে। একটু আরক্ত হলে কিনা, বলতে পারব না, কেননা কপোলে কৃত্রিম রক্তিমা তো তোমার বরাবরই থাকে।

সাহেব আমাকে একটা সিগারেট দিলেন। টিনটা ঘুরিয়ে বললেন, 'ফুরিয়ে এসেছে। এখানে কি এই ব্র্যাণ্ড পাব! **I wonder—**'

তুমি বললে, 'জেলা-সদরে বোধহয় পাওয়া যেতে পারে।' জিজ্ঞাসু চোখে চাইলে আমার দিকে। ইচ্ছা ছিল না, তবু হাত পেতে টাকা নিলুম। সিগারেট পৌঁছেও দিয়ে এসেছিলুম। ভয় ছিল, সাহেব খুচরোটা আমাকে বকশিশ না দিয়ে বসেন!

বন্ধুরা ঠাট্টা করতে শুরু করেছিল।—কী রে, খুব ফাই-ফরমাস খাটছিস? বলত, এরাণ্ড-বয়। কথাটা সম্মানের নয়। আমি মানতাম না, মানতে চাইতাম না। জোরে জোরে মাথা নাড়তাম, আর মনে মনে বলতাম, কক্ষনও না, ওরা হিংসুটে, ওরা ছোট, ওদের মন নিচু। ওরা আমাকে ছোট করেছে, তোমাকেও। একদিন ওদের প্রমাণ দিয়ে দেব—

এবার সেই প্রমাণ দেবার দিনটি দিয়ে আমার কথা শেষ করি। তোমার মনে আছে, সেই বিকেলটা? মেঘলা দিনটি কি অপরূপ সুন্দর মৃত্যুর মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছিল। আমি নদীর পাড়ে বসে ছিলাম, আর নুয়ে-পড়া বড়ো বড়ো ঘাসের শিষ ছিঁড়ে জলে ফেলছিলাম। ফড়িংও গুণছিলাম, একটি দুটি করে ওরা উড়ে উড়ে আসছিল। তবে তাদের ধরতে যাইনি, চেষ্টা করিনি, ওদের ধরা যায় না। একটা দুটো বকও সেই নির্জন নদীর তীরে কাশের ঝোপের এদিকে ওদিকে বসেছিল। আমাকে দেখছিল। ভাবছিল, এ-লোকটা এখানে বসে আছে কেন, সবুজ ঘাসের ডগা ছিঁড়ছেই বা কেন!

কেন, তা কি আমিই জানতাম! আমি ভাবছিলাম। আমি তো নদীর কালো জলে মুখ দেখিনি, যে বিকেলটা আরও সুন্দর হতে হতে একটু পরে মরে যাবে, তাকেও ভালো করে অনুভব করিনি। আমি ছোট কয়েকটি নুড়ির মত দুঃখ মনে নাড়া-চাড়া করছিলাম।

সুচিরা, আমাকে সেখানে দেখে তুমি অবাক হয়েছিলে। অস্ফুটস্বরে বলেছিলে, 'আপনি!'

অবাক হয়েছিলুম আমিও। ঠিক এখানে, শহর থেকে এত দূরে, যেখানে পৌঁছুতে চোরকাঁটায় কাপড় ছেয়ে যায়, জুতোটাও কখনও

কখনও খুলে নিতে হয় হাতে, সেখানে তোমাকে ঠিক আশা করিনি। সেই বিষণ্ণ বিকেল, যে নিজে মরবে সেই সঙ্গে কালো নদীর জলধারাকেও রক্তাক্ত করে তুলছে, সেই বিকেলের, সেই নদীতীরের ছমছমে পরিবেশের তুমি তো কেউ নও।

এখানে তোমাকে মানায়নি।

মানায়নি, তবু আশ্চর্য, দেখ, তোমাকে দেখে আমি সব ভুলে গেলুম। দুঃখ-ক্ষোভের নুড়িগুলোকে ফেলে দিলাম জলে, বললুম, 'বসুন!' বলেই কিন্তু শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলুম, তুমি যদি ধৃষ্টতা মনে কর? তুমি আস্তে আস্তে এগিয়ে এলে, একটু পরিষ্কার জায়গা ছিল আমার পাশেই, আলগোছে পা ফেলে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে। বললাম, 'বসবেন না?'

তুমি বললে, 'বসি?' যেন অনুমতি চাইলে।

পা ঝুলিয়ে দিয়েছিলে। নুয়ে-পড়া ঘাসের শিষের ওপর দিয়ে ক্ষীণস্রোত জলে তার ছায়া পড়েছিল। ধবধবে দুটি পায়ের পাতা একটু রক্তাভ, আমি শিউরে উঠেছিলুম। তুমি আলতা পরতে না। তখন মনে হয়েছিল পরলে আরও মানাত।

তুমিও একটি-দুটি ঘাসের শিষ দাঁতে কাটছিলে, ছোট ছোট ঢেলা জলে গড়িয়ে দেখছিলে, কেমন ঢেউ ওঠে। একবার তুমি উঠে দাঁড়ালে, ফের বসলে। একবার মনে হয়েছিল, তুমি যেন উসখুস করছ, যেন কী ফেলে এসেছ। আমি কাঁপছিলাম। তুমি কথা বলছিলে। খুব মৃদুস্বরে, সেই নির্জন পরিবেশ আর ধীরবহ নদীর কল-ধ্বনির সঙ্গে তোমার গলা আশ্চর্যভাবে মিলে গিয়েছিল।

অথচ তুমি এমন কিছু বলছিলে না। এতদিন ধরে আমাকে দেখছ অথচ আমার বিষয়ে কিছুই জান না। এতদিন তো শুধু ফরমাসী কাজ আর দরকারী কথা বলেছ, বিনে কাজের কথা সেই প্রথম বললে। খুব তুচ্ছ কথা—আমার বাসায় কে আছে, কী করি সারাদিন, থিয়েটার-করা ছাড়া আর কী নেশা আমার আছে! আমার কাজ জুটছে না

কেন, কোথায় চেষ্টা করেছি, কোথাও করেছি কি না! নিজে থেকেই বললে. তোমার বাবাকে বলে আমার একটা সুবিধা করে দেবে।

তুমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করছিলে, আমি আস্তে আস্তে জবাব দিচ্ছিলুম। কী যে ভাল লাগছিল! জবাব দিচ্ছিলুম আর অবাক হয়ে ভাবছিলুম, এই কথাগুলো জিজ্ঞেস করবে বলে কী তুমি এতদূর এসেছ! তুমি কি জানতে আমি এখানেই থাকব! কী করে পথ চিনে এলে!

যে-আনন্দে আমার মন কানায় কানায় ভরে দিয়ে ছাপিয়ে পড়ছিল, তাকে কৃতজ্ঞতাও বলতে পার। আপসোসও হয়েছিল। এই সময়ে আমার বন্ধুরা এখানে নেই। নেই, ভালোই। তবু কাছা-কাছি থাকলে ভালো হত। তারা নিজেদের ভুলটা টের পেত। আমাকে তুমি শুধু ফাই-ফরমাস খাটানোর প্রয়োজনেই ব্যবহার করনি, মানুষ বলেও স্বীকার করেছ। আমার নিভৃত দুঃখের পাপড়িগুলোকে আঙুল দিয়ে ছুঁয়েছ। যে বিলাসিনী, সেই আবার করুণাময়ী।

তাই বলে ভেব না, সেই মুহূর্তে আমার বিচার-বিবেচনা বিসর্জন দিয়েছিলাম। পাশে এসে সুখ-দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করেছ বলেই ভাবিনি যে তুমি আমারই হয়ে গেছ। আমি জানতাম তুমি যার, তুমি তারই। তুমি যেখানকার, সেখানেই ফিরে যাবে। মনে মনে নিজেকে বারবার বললুম, 'শুধু এই দিনটি আমার, এই ক্ষণটি আমার; এই বিকেলটুকু আমাকে দেবে বলেই ত এতদূর এসেছে।'

চারধার অন্ধকার হয়ে এসেছিল। সব যেন আরও চুপ। ঝোপের আড়ালে ঝিঁঝিঁ ডাকছিল। শিকারী বকেরা উড়ে গেছে কখন, ফড়িং ক'টাকেও আর দেখা যায় না।

গাঢ় গলায় বলে উঠলুম, 'একটা গান শোনাবেন?'

'গান?' তুমি যেন চমকে উঠলে, বললে, 'গান?' হাতের ছোট্ট ঘড়িটা দেখলে একবার, চারদিকে চাইলে। মাথা নিচু করলে। আমি অপেক্ষা করে রইলুম, কখন সুরের একটি লীলায়িত রেখা এই

নৈঃশব্দ্যকে পরম মমতায় পাকে পাকে জড়িয়ে একেবারে নিজের করে নেবে।

ঠিক তখনই পিছনে শুকনো পাতায় খস খস শব্দ হল, তুমি আবার চমকে উঠলে। পিছনে ঝাউগাছটার আড়ালে একটা দীর্ঘ ছায়া দেখা গেল। এক পলকের জন্য হাসি ফুটে উঠল তোমার মুখে। একটু লজ্জিত ভঙ্গিতে বললে, 'ও এসেছে।' উঠে দাঁড়ালে, পায়ের পাতা আবার জুতোর স্ট্র্যাপে ঢাকা পড়ল, বললে, 'এবার যাই? আর একদিন গান শোনাব।'

ঝাউগাছের আড়ালের সেই ছায়ার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে। ফিসফিস করে বললে, 'এত দেরি করলে? অন্ধকার হয়ে গেছে, আমার যা ভয় করছিল!'

ছায়াটাও কী যেন বলল, ঠিক শুনতে পেলাম না।

আবার তোমারই গলা শুনলাম, 'আজকের বিকেলটাই মাটি হল। কাল থেকে আমরা কিন্তু নতুন একটা জায়গা খুঁজে বার করব। এখানে,—বলতে বলতে যেন একটু ইতস্তত করলে, বললে, 'এখানে অনেকে আসে।'

তোমরা চলে যাচ্ছিলে। দু'টি ছায়া কখনও পাশাপাশি, কখনও এক হয়ে মিলে।

সুচিরা, তোমরা চলে যাবার পরও আমি সেদিন বসেই ছিলাম। অনেক—অনেকক্ষণ ধরে।

অনেক—অনেকক্ষণ। পাড়ের ঝুরঝুরে নরম মাটি ভেঙে ভেঙে ছুঁড়ে ফেলছিলাম। সুচিরা, তোমার পাশের অন্য ছায়াটিকেও আমি চিনি। জানতুমই তো, তোমার সব দিন সব রাত্রি, সমস্ত জীবনটাই তার। আমি ভেবেছিলাম, শুধু এই একটি দিন, দিনও নয়, একটি বিকেল, বিকেলের একটি ক্ষণ বুঝি আমার! মাথা নেড়ে নেড়ে নিজের ছায়াটাকে বার বার বললুম, 'না, না, একটি মুহূর্তও তোমার না।'

আড়াল

অনেক লিখে লিখে যখন ক্লান্তি আসে, তখন, যে-সব গল্প এখনও লেখা হয়নি, সে-সবের কথা ভাবি। কয়েকটার কাঠামো তৈরি করে রেখেছি। কিন্তু কাঠামো আর প্রতিমা এক নয়। প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কথা না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু অন্তত খড়-মাটি আর রঙের প্রলেপ তো চাই।

তবে গল্প যদি না-ও হয়, তবু তার খসড়াটা অন্তত লিখে দিতে পারি। তাতে ভাবনার ভার হালকা হয়, কায়িক শ্রমও বাঁচে।

নীলিমাকে নিয়ে যে-গল্পটা ভেবে রেখেছি, তার খসড়াটা এই রকম :

রোজই বিকেলে গা ধুয়ে নীলিমা ধোয়া একটা শাড়ি পরে কপালে কুঙ্কুমের ফোঁটা দিয়ে মনে মনে বলে, 'এই যে আমি টিপ পরলুম, তোমারই কথা ভেবে। আমি যখনই যেটুকু সাজ করি, তোমার চোখে সুন্দর হব বলে।'

ঘড়িটার দিকে চেয়ে বলে, 'ছ'টা বাজল। তুমি এইবার আসবে। এই তো, সিঁড়িতে তোমার পায়ের শব্দ শুনছি। তুমি নেমে যাও তাড়াতাড়ি, ওঠ আস্তে আস্তে। একটা একটা করে ধাপ ভেঙে ভেঙে ওঠ, আমি শুনি। এক, দুই, তিন, চার,...আঠার, উনিশ, কুড়ি। তুমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছ, এইবার কপাটে টোকা দেবে। আমি বলব, এস।'

কপাট ফাঁক করে ঘরের ভিতরে একবার উঁকি দিয়েই রজত মাথা টেনে নিল।

নীলিমা বলল, 'আসছ না যে? ন-যযৌ হলে কেন।'

ফিসফিস করে রজত বলল, 'তোমার স্বামী নেই?'

নীলিমা হেসে ফেলল দেখে, 'নেই, নেই, নেই। তুমি তো জান, এই সময়ে সে কোনো দিন থাকে না। টুইশনি করে, নয়তো লাইব্রেরিতে যায়।'

রজত তখনও পাপোষে জুতো ঘষছে।

নীলিমা বলল, 'তোমার চোর-চোর ভাব গেল না।'

রজত ভিতরে এসে বসল, বিছানায়, পা ঝুলিয়ে। হাত বাড়িয়ে রেগুলেটর ঘুরিয়ে দিল। ঘামটা মরুক, গেঞ্জিটা শুকোক, সে আবার তার সাহস, পৌরুষ, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি ফিরে পাবে।

ফিরে পেলও। উঠে গিয়ে ফুলদানি থেকে একটি চাঁপাফুল তুলে নিল, নাকে ধরল, শেষে পরিয়ে দিল নীলিমার চুলে। পুরনো কথার জের টেনে বলল, 'কী বলছিলে যেন তখন? চোর-চোর ভাব, না কী যেন? তা চোরই তো। কাজটা তো চুরিই। না বলিয়া পরের দ্রব্য নেওয়াকে কী বলে?'

সকোপ ভঙ্গিতে চেয়ে নীলিমা বলল, 'আমি বুঝি একটা দ্রব্য।'

'না, স্ত্রী—পরস্ত্রী'

রজতের গালে আলগোছে টোকা দিয়ে নীলিমা বলল, 'পরস্ত্রী-হরণ কি চুরি? বাহাদুরি।'

অতএব রজতকে একটু বাহাদুরিই করতে হল। নীলিমাকে খাটের কাছে টেনে এনে বলল, 'ব'স।' কোলে মাথা রেখে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

নীলিমা বলল, 'আগে মুখে রা ছিল না। চোর থেকে একেবারে ডাকাত? যদি ও এখুনি এসে পড়ে?'

'তোমার স্বামী?' শূন্যে দৃষ্টি আস্ফালন করে রজত বলল 'ভয় করিনে।'

ঘুম পাড়ানি ভঙ্গিতে ওর কপালে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে

নীলিমা বলল, 'খুব বাহাদুর। থাক আর বীরত্ব দেখিয়ে কাজ নেই, চুপচাপ শুয়ে এবার ঘুমোও দেখি।' আর অবাধ্য শিশুর মতোই রজত সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'আমি কি এখানে ঘুমতে এসেছি?'

একজোড়া জুতো দ্রুত নীচে নেমে যায়, আরেক জোড়া ওপরে উঠে আসে, পরে, আরও পরে! খুব ক্লান্ত ভাবেই অত্যন্ত সসঙ্কোচে।

মাঝের এই সময়টুকু নীলিমার হাতে কোনো কাজ থাকে না। একবার গিয়ে রেডিওটা খুলে দেয়, গান শোনে। ভাল লাগে না, কেন যে রজত ওটাকে এখানে রেখে গেছে কে জানে। ওটা নিয়ে কম মিছে কথা তৈরি করতে হয়নি নীলিমাকে। স্বামীকে বলেছে, জিনিসটা তার এক বান্ধবীর, ছুটিতে বেড়াতে গেছে, নীলিমার হেফাজতে সখের জিনিসটা রেখে। কিন্তু সেও তো আজ সাত মাস হয়ে গেল, এখনও জিনিসটা ফেরত যায়নি। স্বামী যদি জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার বন্ধুর ছুটি কি এখনও ফুরায়নি?' নীলিমা কী বলবে।

মনে মনে কী বলবে তার মহড়া দেয় নীলিমা, সাহস সঞ্চয় করে। বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, আকাশে মেঘে মেঘে যোগবিয়োগের খেলা দেখে আর বলে, 'ভয় কী! কিসের ভয় আমার! যদি জিজ্ঞাসা করে, তবে বলব: যা সত্যি তাই বলব। বলব রজত দিয়েছে।'

'যদি বলে, রজত আসে কেন? বলব, আসবেই বা না কেন। আমার বউদির ভাই, ওর সঙ্গে আলাপ যে অনেক দিনের। আমাদের বিয়ের ঢের আগে থেকেই। আমরা বন্ধু। শুধু বন্ধু।'

'শুধু' শব্দটি নীলিমা বলে একটু জোর দিয়ে। শুধু বন্ধু? বন্ধুই তো। আমরা একটি সুন্দর সম্পর্ককে আজও টিকিয়ে রেখেছি। তাকে ঘর-গৃহস্থালীর ধোঁয়ায় ধুলোয় কালো করে ফেলিনি।

যদি অসীম, ওর স্বামী, বলে, 'কিন্তু তোমরা যা করছ, তা যে অন্যায়।' নীলিমা বলবে, 'তোমার আর আমার ন্যায়ের মাপকাঠি এক নয়।'

তবু মানুষটা যখন অনেক রাতে ঘরে ফেরে, চাপা দেওয়া ভাত

চুপ করে খেয়ে যায়, তখন নীলিমার বুক দুরদুর করে, কাল্পনিক মহড়ার সংলাপ কিছুমাত্র মনে পড়ে না। ভয়ে ভয়ে নীলিমা ঘরের চারদিকে চোখ বুলায়। না, কোথাও সিগারেটের টুকরো পড়ে নেই, বিশৃঙ্খলা বা অসাবধানতার চিহ্ন নেই এতটুকু। আসবাব থেকে শয্যা অবধি প্রতিটি বস্তু যথামত, যথাস্থানে। শুধু ফুরফুরে একটু গন্ধ লেগে আছে ওর নিজেরই আঁচলে, কিন্তু আতর তো নীলিমা নিজের জন্যেই একটু মাখতে পারে। কুঙ্কুমের টিপটা আছে এখনও। দোষ কী, এয়োস্ত্রী যে, তার টিপ পরায় দোষ কোথায়।

খাওয়া সেরে অসীম শুয়ে পড়ে বিছানায়। আস্তে জিজ্ঞাসা করে, 'কেউ কি এসেছিল ?'

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মুহূর্তের জন্যে যেন রুদ্ধ হয়, নীলিমা বলে, 'না, কই, না ত ?'

'কেউ আসেনি ?' তেমনি ক্লান্ত আর হতাশ ভঙ্গিতে অসীম বলে, 'জোন্‌স্ মরিস্‌নে কাজের চেষ্টা করছি, আজ যে ওদের খবর দিয়ে যাবার কথা ছিল।'

নীলিমা স্বস্তি পায় তখন। জানে না, লোকটা জানে না। টের পায়নি। কিছুমাত্র সন্দেহ করেনি।

অতি ধীরে, অতি নিয়মিত তালে অসীমের শ্বাস পড়ছে। সারা দিনের ক্লান্তির পর নিমেষে ঘুমিয়ে পড়েছে।

নীলিমার বুকের ভিতরটা তখনও কাঁপে—ভয়ে নয়, মমতায়। সংসারের স্বাচ্ছল্যের জন্য যে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছে, তার প্রতি গভীর মায়ায় মন ছেয়ে যায়।

কিন্তু মায়া আর ভালবাসা তো এক নয়। দ্বিতীয়টি আছে যার জন্যে, তার কথা ভেবে নীলিমা বেলা পড়তে নিজেকে যে একটু সুন্দর করে তুলবেই, আঁচলে সুরভি ঢালবে, সযত্নে পরবে টিপ, চোখে অপরূপ ভ্রূভঙ্গি আনবে।

অসীম ঘরে ঢোকেনি। চৌকাঠে অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওরাও টের পায়নি। খুব কাছাকাছি বসেছিল। খুব নিচু গলায় কথা বলছিল।

একবার বা কি কথায় রজত হো হো করে হেসে উঠল। আর তখনই নীলিমা চমকে চাইল পিছনে। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রচালিতের মতো সে ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারায় রজতকে চুপ করতে বলল।

দেখল রজতও। দু'জনের মুখই পলকে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সহজাতবোধের ইঙ্গিতেই দু'জন ছিটকে বসেছে দু'দিকে।

অসীম তখনই ঘরে ঢুকল। কোনো দিকে না চেয়ে গায়ের জামাটা ছাড়ল। পরল আর একটা। কোনো কথা নেই। বেপরোয়া ঘড়িটা ছাড়া কেউ কথা বলছে না। নীলিমা পাংশু, ভীত, বিবর্ণ। আড়চোখে দেখছিল অসীমকে। ওর মুখের কোনো রেখার পাঠোদ্ধার করতে পারে কিনা। রজত দেয়ালে কত ছোট্ট ফুলগুলি কত বড় ছায়া ফেলেছে, একদৃষ্টে তাই দেখছিল। সেই ছায়া আর একজন দেখছে, টিকটিকি। আরেকটু পরে টিকটিকিটা ফুলের ছায়াকে ফুল বলে ভুল করে ঝাঁপিয়ে পড়বে নাকি—ভয়ে বিহ্বল রজত, ভাবছিল।

না—না এই ভয় কোনো কাজের কথা নয়। নীলিমা হঠাৎ মনস্থির করে ফেলল। এই সময়ে সাহস হারালে চলবে না। হারালেই আবার স্বামী পেয়ে বসবে, হয়ত হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

খুক্-খুক্ করে খানিকটা কেসে দেখল গলার স্বর ঠিক আছে কি না। বলল, 'তোমাদের আলাপ নেই বুঝি? আগে কোনো দিন দেখাও হয়নি? কী আশ্চর্য, অথচ রজত তো এখানে প্রায়ই আসে!'

এই ছুটিতে

ব্রজনাথবাবু, আপনার গা-ঢাকা দিয়ে থাকবার আর প্রয়োজন নেই, ফিরে আসুন। জানি না ত, আপনি এখন কোথায়, আপনার ঠিকানা কী, অগত্যা তাই বেতারের শরণ নিতে হল। অবিশ্যি খবরের কাগজেও বিজ্ঞাপন দিতে পারতুম। কিন্তু নিরুদ্দেশের কলমটা আপনার চোখে পড়ত কিনা কে জানে। তাছাড়া, আপনি ত ঠিক নিরুদ্দেশ নন! ইচ্ছে করে, হয়ত সঙ্কোচবশত, গা-ঢাকা দিয়ে আছেন।

কিন্তু গা-ঢাকা দেবার কোনো দরকার ছিল না। আপনি নিজে গা-ঢাকা দিয়েছেন কিন্তু আমাদের চোখে ধুলো দিতে পারেননি। আপনার ধারনা, পেরেছেন। আপনার ইচ্ছে, লক্ষ্মীপুজোর ঠিক পর দিনই আমাদের আড্ডায় এসে হাজির হবেন, হাতে হয়ত একটা সুটকেস থাকবে, বলবেন, এই ত ভাই, রাজগীর থেকে ফিরলুম। স্টেশন থেকে সোজা এখানে আসছি। না, না, বসব না, বাসায় যেতে হবে, চান করব, দেখছ না জুতো ভর্তি ধুলো, চুল উশকো-খুশকো, চোখ লাল। ট্রেন জার্নির ধকল সোজা নাকি? বাব্‌বাঃ, এখন বাড়ি গিয়ে বিছানায় টানটান হয়ে একটানা ঘুম দেব। কাল সকালেই ত আবার অফিস? রাজগীরের গল্প তোমাদের শোনাব বইকি, কাল সন্ধ্যাবেলা এসে শোনাব।

আমরা হয়ত ছাড়ব না, বলব, না ব্রজদা, দশ মিনিট বসে যেতেই হবে। পুজোর ছুটি বাইরে কাটিয়ে এলেন, আপনি ভাগ্যবান। আমাদের অন্তত গল্প বলুন? কেমন ভীড় হয়েছিল এবার রাজগীরে? আপনার বাসাটা কেমন ছিল, ভাড়া কত। তখন হয়ত ব্রজদা, আপনি

পকেট থেকে একটা কাগজ বের করবেন। কিছুটা প্রীত চোখে, সেই চোখে করুণা মিশিয়ে, আমাদের দিকে তাকিয়ে কাগজটা জোরে জোরে পড়তে শুরু করবেন। কাগজ ত নয়, ওটা আসলে কবিতা, সম্ভবত সনেট, চার পাহাড়ের বর্ণনা। বেশ আবেগ দিয়েই আপনি পড়বেন, গলাটা আমাদের অফিসের লিফ্‌টটার মতো ওঠা-নামা করবে। আমরা তন্ময় হয়ে শুনব। শুনব, আর আপনাকে হিংসে করব।

প্রত্যেক বছর যেমন করেছি। গত বছর আপনি আমাদের পুরীর সমুদ্রের বর্ণনা শুনিয়েছিলেন। সেটা অবশ্য কবিতা নয়, ডায়েরির ধরনে লেখা। প্রতিদিনের ছোট-ছোট অভিজ্ঞতা দিয়ে ভরা। কুলীর সঙ্গে স্টেশনেই কী খিটিমিটি হল, হোটেলের ম্যানেজার কেমন সুজন, কবে সমুদ্রে নাইতে গিয়ে একটু নাকানি খেয়েছিলেন, পরে নুলিয়ারা আপনাকে টেনে তোলে, কোনো খবরই বাদ দেননি। এমনকি, বিকালের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছিলেন, সূর্যাস্তের শোভার কথাও ছিল, আর সবচেয়ে শেষে বালু-বেলায় একটি মেয়ের সঙ্গে কী করে আলাপ করলেন, সে কথাও লিখেছিলেন। এই অংশটাও রোমান্টিক—আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলাম। সেই মেয়েটি ছিপছিপে, শ্যামলী, তার চোখ দুটি আয়ত। সে নিঃসঙ্গ—অন্তত সেদিন, সেই সময়ে তার কোনো সঙ্গী ছিল না। সে ঢেউ গুণছিল, কিংবা ঝিনুক কুড়োচ্ছিল, আপনি কী লিখেছিলেন এখন ঠিক মনে পড়ছে না। তার সঙ্গে আলাপেরও খানিকটা নমুনা ডায়েরিতে দিয়েছিলেন। তাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যখন নিজের হোটেলে ফিরে এসেছেন, তার অনেক আগেই সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে, আপনার হোটেলের জানালায় তখন মৃদু হাওয়া, আপনার মনের মধুর একটু স্মৃতি।

তার নাম জেনেছেন, তার কলকাতার ঠিকানা নিয়েছেন। আমরা শুনেছি, সেই মোহের কিছুটা ভাগ নিয়েছি, আর—আর, আপনাকে হিংসে করেছি।

তার আগের বারের পুজোয় তো আপনি দার্জিলিঙের পটভূমিকায় একটা গল্পই লিখে ফেলেছিলেন। সে-গল্প বিশেষ উচ্চশ্রেণীর নয়, বর্ড্রাওনের নবাবপুত্রীর দুরাশার আভাসমাত্রও তাতে ছিল না, হয়ত নানা গঠনমূলক ত্রুটি, শিল্পনৈপুণ্যের ঘাটতি, এবং মনস্তত্ত্বগত ভুল ছিল। কিন্তু ভৌগোলিক ভুল একটি ছিল না, অন্তত আমাদের ভালোই লেগেছিল। আপনার এ-সব রচনা ত কোনো পত্রিকায় ছাপা হবে বলে লেখা নয় ব্রজবাবু, আমাদের মতই জনকয় অন্তরঙ্গ লোককে পড়ে শোনাবার জন্যে লেখা। আমাদের ভালো লাগল, আমরা ওই যে মনোযোগ দিয়ে শুনলুম, তাতেই আপনার পুরস্কার পাওয়া হয়ে গেল। আপনি লেখাটা মুড়ে পকেটে রাখলেন। তার আগে আমরা ফরমাস করে ফিরে ফিরে কয়েকটা ছত্র আর অনুচ্ছেদ শুনে নিয়েছি। অবজার্ভেটরি হিলে ব্রাহ্মমুহূর্তে আপনার আত্মোপলব্ধির কথাটা। সেই কয়েকটি লাইন আমাদের মনেও রসাবেশ এনেছে। আমরা, পরোক্ষভাবে হলেও, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির স্বাদ পেয়েছি।

আর, ব্রজবাবু, মনে মনে আপনাকে হিংসে করেছি।

আপনি, শ্রীব্রজনাথ লাহিড়ি, জোসেফ হিলটন কোম্পানির সামান্য কর্মচারী, মাস গেলে মাত্র দেড়শো টাকা পান, তবে ব্যাচেলর বলে তাতেই এক রকম কুলিয়ে যায়, হয়ত-বা কিছু জমেও। যা জমেই তাই দিয়ে বছর বছর পুজোর ছুটিতে হাওয়া খেতে বাইরে যান। আর আমরা, কম বয়সে বিয়ে-থা করে যারা সংসারী হয়ে পড়েছি, একেবারে নিতান্ত কম আয় নিয়ে দায় আর দায়িত্ব মেটাতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছি, আমরা আপনাকে ঈর্ষা করেছি। কেননা, ছুটিতে আপনি বাইরে যান। আমরা বাইরে যেতে চাই, পারিনে। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা সহজে কোথাও যাইনে, এই শহর ছেড়ে সহসা পাদমেক নড়িনে। সাধ যদি হয় কখনও—কোনোদিন, যদি সে বুকের ভিতরে অবুঝ শিশুর মতো নড়াচড়া করে ওঠে, তাকে অভাব নামে জুজুর ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখি। বলি, ছিঃ, দেখছ না এ-

মাসে ওষুধের বিল কত বেশি, এ-মাসে কি ও-সব শখ-আবদারের কথা তুলতে আছে? সব যদি ভালোমতো থাকে তবে আসছে বছর— আসছে বছর ঠিক আমরা বেড়াতে যাব। হ্যাঁ, পুজোতেই। হিল্লী-দিল্লী না হোক, সাঁওতাল পরগনায় একবার উঁকি দিয়ে আসতে বাধা কী। শিশুর মতো অবুঝ সেই সাধটা তখন মনের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ত। আমরা টাইম-টেবিল নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম, মনে মনে মথুরা যেতাম, দুধের সাধ মেটাতাম ঘোলে।

ব্রজনাথবাবু, একলা আপনি নন। অন্তত আমরা জানতাম, আপনি নন। আমরা আগেকার মত ধোঁয়া ধুলো আর কালিতে ঢাকা সেই শহরে নিত্য ঠেলাঠেলি করে যখন হয়রান হচ্ছি, ঠাসাঠাসি হয়ে বাস করে হাঁপিয়ে উঠছি, তখন আপনি হয়ত সমুদ্রের ধারে কিংবা কোনো পাহাড়ে। সেই সব মনোহরণ বর্ণনার প্রতিটি ছত্র আমাদের মনে পড়ে যেত। আমরা রাগ করতাম আপনার ওপর, খানিকটা ক্লীব, অক্ষম ধরনের। রাগ করতাম আমাদের ওপর: আমরা কেন এমন পারি না। আমরা কেন সারাক্ষণ, প্রতিটি দিন ইঁট-কাঠ, লোহায়-পাথরে গাঁথা এই শহরটার কাছে বাঁধা পড়ে আছি! আমরা নিজেদের ওপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিলাম।

ব্রজনাথবাবু, সেই শ্রদ্ধার খানিকটা আমরা যেন আবার ফিরে পেয়েছি। আপনার ওপর আমাদের আর কোনো রাগও নেই। আপনাকে আমরা এখন বরং করুণা—হ্যাঁ, করুণাই করছি।

যেখানেই থাকুন, আপনি বেরিয়ে আসুন। আর লুকোনর প্রয়োজন নেই। আমরা নিঃসংশয়ে জানি কিনা, আপনি এই শহরেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে আছেন।

কী করে জেনেছি, সেটা আপনাকে বোঝাতে হলে, দু'একটা পুরনো কথা বলতে হয়।

আপনার মনে আছে ব্রজনাথবাবু, এবারও শ্রাবণের শেষে

আকাশের ঢাকনাটা কে মেজে ঘসে একেবারে নীল করে দিল, মাঝে মাঝে বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে সেই নীলেই আমরা ক্ষণে ক্ষণে কাচা সোনার আভাস দেখে চমকে উঠলুম, আমাদের মন খারাপ হয়ে গেল, প্রতিবারই হয়। আমরা একবার আকাশের দিকে চেয়েই টের পেলুম, পূজা কাছে এসে পড়েছে। প্রতিবারই টের পাই। আমরা ক্যালেণ্ডারের দিকে চাইলুম, তার পাতা হাওয়ায় উড়ছিল, সারি সারি কয়েকটা লাল হরফ আমাদের মনের গোপন ইচ্ছাটুকুর মতো টকটকে হয়ে জ্বলছিল। ছুটি এসে পড়েছে। তারপর শ্রাবণ কেটে গিয়ে ভাদ্র এল, ভাদ্রের পর আশ্বিন, বুকের ভিতরে তখন দুরুদুরু করে কাঁপছে, সেই ছেলেবেলাকার সব পূজার স্মৃতি, তার আনন্দ আর বেদনার ফেনা আর ঢেউ নিয়ে যেন আছড়ে পড়ল। বছর-বছর পূজা আসে, এবারও এসেছে। এসেছে কাজ থেকে কয়েকটা দিনের ছুটি। এই সময়ে নানা জিনিস কেনাকাটার ভীড়, দোকানে দোকানে সাজান পসরা, ইস্টিশনে ভীড়। ওরা বেড়াতে যাবে, যাদের সাধ আর সাধ্য দুই-ই আছে। কিন্তু আমরা কোথাও যাবনা, দুরন্ত একটা ইচ্ছা আঁচড়ে কামড়ে মনের ভিতরটা রক্তাক্ত করে ফেলবে, তাকে শান্ত করতে গিয়ে চোখে জল এসে পড়বে, তবু আমরা এখানেই, এই শহরের মাটি কামড়ে পড়ে থাকব।

আপনি অন্যবারের মতো এবারও নতুন টাইম-টেবল আনিয়ে নিয়েছিলেন, দেখছিলেন। আমরা ত কোথাও যাব না, তবু আপনাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলুম, ঝুঁকে পড়ে দেখছিলুম। আপনি বললেন, নাঃ, এবারে আর দূরে যাওয়া হল না, সেই পুরনো গিরিডিতেই ফের যেতে হবে দেখছি। হাতে বেশি টাকা নেই। আমরা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরে এলুম। গিরিডিই বা আমরা যেতে পারছি কই।

তবু পরদিন সুব্রত যখন চুপেচুপে আমাদের জানাল, আমরাও যেতে পারি, আমরা সকলে আহ্লাদে হাত তুলেছিলুম। সকলে,

মানে আমরা তিন জন, সুব্রত, ভবানী আর আমি, যারা আপনার বাসার পাশের মেসবাড়িটার একতলার চার নম্বর ঘরে সারা বছর পড়ে থাকি। আমাদের সঙ্গেই আপনার বেশী ভাব কি না।

আমরা সুব্রতকে জিজ্ঞাসা করলুম, কী করে সুব্রত, কী করে আমরা যাব?

সুব্রত তখন বুঝিয়ে বলল। সে এবার কোথা থেকে বাড়তি কিছু টাকা পেয়েছে, সেটাই আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারে। না, একেবারে দান নয়, ধার। আপাতত, খরচটা সুব্রতই চালিয়ে নেবে আমরাও না হয় সামান্য কিছু কিছু দেব, পরে ধীরে ধীরে সুব্রতকে শোধ করে দেব।

আমরা যেন হাতে স্বর্গ পেলুম। এ-ও অপচয়, একটুখানি অন্যায় বিলাস, কিন্তু মোটে একবারই, এই প্রথমবারই তো? এতে কোনো দোষ নেই। খরচ কতই বা। হিসেব করে দেখলুম, বুঝে চললে মাথাপিছু পঞ্চাশ-ষাটের বেশি পড়বার কথা নয়।

ব্রজনাথবাবু, আপনাকে গিয়ে আমরা যখন বললুম, আমরাও গিরিডি যাব, চলুন না, একসঙ্গেই যাই, আপনি অবাক হয়ে চেয়েছিলেন। পরে আপনার মুখে খুশির কয়েকটি রেখা ফুটে উঠতে দেখেছি। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে আপনি আস্তে আস্তে বলেছেন, 'বেশ।' তখনও বুঝিনি, আপনার হাসিটা মেকি।

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, ব্রজনাথবাবু, আমাদের প্ল্যানটা সঙ্গে সঙ্গে পাকা হয়ে গেল। কবে যাব, কোন্ গাড়িতে, স্টেশনের কোথায় আমরা এ ওর জন্যে অপেক্ষা করব—সব তখনই ঠিক করে ফেললুম। এমনকি, গিরিডির কোথায় বাসা নেব, তা-ও। বাতাসে ছুটি আর শরতের ছোঁয়া লেগেছিল, আমরা সামনের ক'টি দিনের দিকে চেয়ে প্রত্যাশায় অধীর হয়ে উঠেছিলাম।

কিন্তু ব্রজনাথবাবু, আপনি ত আসেননি। সেদিন আমরা আপনার জন্যে বুকিং অফিসের সামনে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে অনেকক্ষণ

অপেক্ষা করেছিলাম। প্রতিটি যাত্রীর মুখে আপনার মুখ খুঁজেছি। কতবার সিগন্যালের লাল আলো পালা করে হলদে আর সবুজ হয়ে ফের লাল হল। আপনি এলেন না। আমরা ফিরে এলাম।

আপনাকে কিন্তু বাসাতেও পেলাম না। চাকর বলল, আপনি গিরিডিতে। শুনে আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাউয়ি করলুম আমাদেরই একজন বলল, 'কই, তিনি ত—'

আমি চোখের ইশারায় তাকে থামতে বললুম। ফিরে আসতে আসতে সুব্রত বলল, 'তবে কি তিনি অন্য কোনো গাড়িতে—'

না, এমন ভুল ত হবার কথা নয়। দিন এবং গাড়ির সময় আপনার নোট-বইয়ে যে টোকা ছিল। আর আমাদের ফেলে আপনি যাবেনই বা কেন।

কিন্তু ব্রজনাথবাবু, আপনি বাসায় ত আর ফিরলেন না? সেদিন না, তার পর দিন না। আজ অবধি না। আজ সকালে আপনার একটা চিঠি পেলাম। হাতের লেখা আপনার, ওপরে লেখা রাজগীর। তারিখ গতকালের। কিন্তু ব্রজনাথবাবু, চিঠিটা ত গিরিডি থেকে লেখা নয়। আপনি চিঠিতে ক্ষমা চেয়ে একটা কৈফিয়ত দিয়েছেন, হঠাৎ কেন আপনাকে পরেশনাথ পাহাড়ে অসুস্থ আত্মীয়কে দেখতে যেতে হল। সেখান থেকে সোজা গিয়েছেন তাকে নিয়ে রাজগীর। আমাদের খবরটাও দিয়ে আসতে পারেননি। ক্ষমা চেয়েছেন সেই জন্যে। জানতে চেয়েছেন, আমরা গিরিডি গিয়েছি কি না।

না, ব্রজনাথবাবু, আমাদের যাওয়া হয়নি। সুব্রতর যে ক'টা টাকার ওপর ভরসা করে আমাদের এত প্ল্যান, সেই টাকাটার প্রায় সবটাই ওকে হঠাৎ বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হল কি না! ওর বিধবা বোনটির একমাত্র ছেলে টাইফয়েড অসুখে পড়ল। তার ওপর পূজার নানা জামা-কাপড় কিনতে গিয়ে কখন কী করে টাকাটার প্রায় সবটাই খরচ হয়ে গেল, সে নিজেও টের পায়নি।

আমরা বুঝতে পেরেছিলুম, আমাদের যাওয়া হবে না! সেদিন

তবু স্টেশনে যে গিয়েছিলুম, সে শুধু যেতে পারলুম না, আপনাকে ওই কথাটা বলতে।

ব্রজনাথবাবু, আপনিও ত যাননি। তবে অমন কাঁচা কাজ করলেন কেন, কেন মিথ্যে চিঠিটা লিখলেন। আমরা যে ডাকঘরের মোহরটাও দেখেছি—চিঠিটা রাজগীর থেকে আসেনি, কলকাতারই কোনো জায়গা থেকে আপনি ওটাকে পোস্ট করেছেন। আপনি কেন যে গা-ঢাকা দিয়ে আছেন, তাও বুঝতে পারছি না।

লজ্জা? লজ্জা কী, ব্রজনাথবাবু, এই পুজোর ছুটিতে বাইরে যেতে ত আমরাও পারিনি। আমরা জানতুম, আমরাই পারি না, আজ জেনেছি, পারেন না আপনিও। আসলে আমরা, যারা কায়ক্লেশে কোনো মতে এই শহরটায় মাথা গুঁজে পড়ে থাকি, আমরা কেউই পারি না। তবু প্রতি বছরই যখন আশ্বিনের শেষে হাওয়ায় শিউলির গন্ধ লাগে, মেঘে আর বকের পাখায় রঙের তফাৎ থাকে না, তখন আমাদের মনের ভেতরে একটা সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। কে যেন কেবলি বলে, 'চল, চল। এই ধোঁয়া আর ধুলোর বাইরে পালিয়ে গিয়ে অন্তত দু'দিনের জন্যে প্রাণভরে নিশ্বাস নিয়ে এস।' শেষ পর্যন্ত কিন্তু কেউই যাই না। টাকার টান পড়ে, প্রয়োজনের চাকার নিচে শখটা গুঁড়িয়ে যায়। আমরা সঙ্গতিহীন নাগরিকেরা, তখন শুধু টাইম টেবিলের পাতা ওলটাই, আপনি মিছামিছি গা-ঢাকা দেন।

সুব্রতরা চটে গেছে ব্রজনাথবাবু। আপনাকে ওরা বলেছে 'জালিয়াত', বলেছে, 'মিথ্যেবাদী'। আমি কিন্তু তা মনে করি না। মিথ্যে কোন্‌টা? আপনার চিঠির শিরোনামার 'রাজগীর' কথাটা অবশ্য মিথ্যে। কিন্তু প্রতি বছরই এই সময়ে আপনার মনে যে বাইরে ছুটিটা কাটিয়ে আসবার সাধ জাগে আমাদের সকলের মনেই জাগে সেটুকু তো মিথ্যে নয়। সেই সাধটা অত্যন্তই খাঁটি। তার দামই বা কম কী।

ব্রজনাথবাবু, আপনার লজ্জা পাবার তাই কোনো হেতু নেই। কিংবাআপনার লজ্জা আমাদের সকলেরই। আজ বিজয়া। আজ আপনি কেন দূরে থাকবেন। আপনাকে অকপটে ডাকছি, আপনি ফিরে আসুন।



নীরদ ভয় পায়নি। কমলার হিম চোখের স্থির মণি দু'টির দিকে চেয়ে থাকতে না। সিঁদুর-লেপা ভীষণ সুন্দর আর ঠাণ্ডা কপালটা ছুঁতেও না। পায়ের দিকে চোখ নামিয়েছে : আঙুলগুলো কঠিন, একটু-বা বাঁকান, আলতায় ছোপান। বুক তবু কাঁপেনি। রাশি রাশি তাজা ফুল মরা শরীরটায় নিজেই ছড়িয়ে দিয়েছে।

পথে নেমেই ওরা কর্কশ গলায় হরিধ্বনি তুলেছিল। নীরদ চমকে উঠেছে, কিন্তু ভয়ে নয়। ওরা বরং চুপ করে থাকলে ভালো হত। এক পশলা বৃষ্টিতে ভেজা পিচের রাস্তায় ওদের খালি পায়ের ছপছপ শব্দ শোনা যেত।

শ্মশানেও ওরা বড়ো বেশী হল্লা করছিল। কোথা থেকে টেনে টেনে এনে ছুঁড়ে ফেলেছিল কাঠ, ঘিয়ের ভাঁড় উপুড় করে ঢালছিল। বিড়ি ধরিয়ে খুকখুক করে কাশছিল কয়েকজন, একজন বিশ্রী একটা গান ধরেছিল। শীতার্ত একটা কুকুর ফিরে ফিরে এসে চিতাটিকে প্রদক্ষিণ করে শরীরটা সেঁকে নিল, নাক উঁচু করে উৎকণ্ঠ গন্ধ শুঁকল হাওয়ার, তারপর মট করে একটা হাড় ফাটতেই কেঁউ করে পিছিয়ে গেল। শোকার্ত অশথগাছটির পাতা চুঁইয়ে তখনও জল ঝরছে।

একজন বলল, 'কী ঠাণ্ডা মাইরি, আর খানিকটা থাকতে হলে বুকে সর্দি বসবে, ওখানেই শুতে হবে।'

ইশারায় সে চিতাটা দেখিয়ে দিল।

আর একজন ভরসা দিয়ে বললে, 'না, বেশীক্ষণ লাগবে না।' বলেই উপরের দিকে তাকাল। 'আর বৃষ্টি যদি না হয়, তবে বড়ো জোর আধ ঘণ্টা।'

'বউটা কী হালকা আর রোগা। ভাল করে খেতে পেত না নাকি?' বলেই তৃতীয় একজন আড়চোখে নীরদের দিকে চেয়েছে।

নীরদ একটু দূরে বসে ছিল। ঘাটের সিঁড়িগুলো ধাপে ধাপে নেমে যেখানে জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে, তার কাছাকাছি। দশ-বারো বছরের একটা ছেলে তখন থেকে চোখের জল মুছছে। বোধ হয় মা মারা গিয়াছে। ওকে নিয়ে এসেছে মুখে আগুন দিতে হবে বলে। যেটুকু করবার, করা হয়ে গিয়েছে, ছুটি পেয়ে এখন ছেলেটি কাঁদছে। শুধুই কাঁদছে না, মাঝে মাঝে চোখ খুলে ভাটির দিকে ভেসে-যাওয়া কচুরির গাঢ় সবুজ পাতা আর বেগুনী ফুল অবাক হয়ে দেখছে। হয়ত ঘাটের সিঁড়ি গুণছে। কিন্তু যে কটা ডুবে আছে, তার আর হিসাব পাবে না। যে কচুরিপানাগুলো ভেসে গেল, জোয়ারের টানে তার কিছু হয়ত এই ঘাটেই ফিরে আসবে, কিন্তু তার মা আর ফিরবে না। কিন্তু এসব কথা কি ছেলেটি ভাবছে? ওই বয়সের ছেলেরা কি কিছু ভাবে, ভাবতে পারে?

আসলে, গায়ের চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নীরদ টের পেল, তার নিজের ভাবনাই সে ছেলেটির উপর আরোপ করেছে। কমলা আর ফিরবে না। কাল রাতে ছিল, ভালোবেসেছিল, আজ সকালে ছিল, ঝগড়া করেছিল। এক সঙ্গে খেতেও বসেছিল দু'জনে।

হঠাৎ জল খেতে গিয়ে কমলা বিষম খেল, নীরদ ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'সব কাজে তোমার তাড়াতাড়ি।'

হাত থেকে খসে গ্লাসটা তখন মেঝেয় খান খান হয়ে পড়েছে। সেই কাচের টুকরো আর জলের মধ্যেই শুয়ে পড়েছে কমলা, ছটফট করছে।

তাড়াতাড়ি পাখাটা জোরে চালিয়ে দিল নীরদ, জানালা-দরজা খুলে বাইরের রোদ আর হাওয়ার কাছে সাহায্য চাইল।

'বড় কষ্ট।'

কমলার মাথাটা নীরদ তুলে নিল কোলে, ওর জামা-কাপড় ঢিলে করে দিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

ওরই ফাঁকে একবার উঠে নীচের দোকান থেকে ফোন করে ডাক্তারকে খবর দিতে পেরেছিল।

ডাক্তার ঘরময় ছড়ান জল আর কাচের টুকরোগুলোর দিকে তাকালেন, চশমার আড়ালে সন্দিগ্ধ ভ্রূ কুঞ্চিত হল, বিরক্ত ঠোঁট উল্টে নাড়ি দেখলেন, মাথা নাড়লেন আস্তে আস্তে।

কমলার চোখের অপলক মণি ততক্ষণে স্থির হয়ে এসেছে।

নীরদ তখনও ভয় পায়নি।

অশত্থগাছের পাতা থেকে টুপটাপ করে জল ঝরছে, কনকনে হাওয়া চিতার আগুনটাকে ঝুঁটি ধরে নাড়ছে, আর জ্বালা জুড়তে নিস্তব্ধ নীল একটি নদীর জলে ঘাটের কয়েকটি সিঁড়ি ডুব দিয়েছে—একটু ছমছমে ভাব, কিন্তু একে ভয় বলে না।

পিঠে কে হাত রেখেছে! নীরদ চমকে ফিরে চাইল। পাশের বাড়ির ভদ্রলোক। উদ্যোগী হয়ে তিনিই সব ব্যবস্থা করেছেন, ডেকে এনেছেন শ্মশানবন্ধুদের।

'ফুরিয়ে গেছে। জল ঢেলে দেবেন আসুন।'

সম্মোহিত নীরদ ভদ্রলোককে অনুসরণ করেছে।

সব ধোঁয়া নিবে গিয়েছে, সব ছাই ধুয়ে গিয়েছে।

নীরদ চলে আসবে, সেই ভদ্রলোকই ওর হাত ধরে টেনেছেন।

'ওদের কিছু দিন। পরিশ্রম হয়েছে, ওরা চা খাবে।'

নীরদ বাক্যব্যয় না করে একটা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়েছে।

'আমি এবার যাই।'

'কোথায় যাবেন?'

'বাসা—বাসাতেই যাব।'

'একটু দাঁড়ান। আমিও আসছি।'

নীরদ অন্য সময় হলে হেসে উঠত। ভদ্রলোক ওকে একা

ছাড়তে ভরসা পাচ্ছেন না। যথাসাধ্য নম্র গলায় নীরদ বলল, 'না, আমি একাই যাব।'

ওর স্থির, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভঙ্গি দেখে ভদ্রলোক হয়ত একটু ভয় পেলেন। বললেন, 'আচ্ছা আসুন।'

তখন পায়নি, কিন্তু নীরদ পেয়েছে পরে, বাসায় ফিরে এসে।

প্রথমে অভ্যাসবশে বিজলী ঘুন্টির বোতাম টিপেছিল। দরজা খুলল না, হালকা চটিপরা, পায়ের পরিচিত শব্দ শোনা গেল না, নীরদ ভয় পেল। সে ভয়টা মাছির মতো উড়ে এল, একটু অস্বস্তি হল, কিন্তু তাকে তাড়াতেও সময় লাগল না। কমলা নেই, দরজা খুলবে কে! ভয় গেল, তবু ফোকর খুঁজে চাবি পরাতে গিয়ে নীরদকে গলদঘর্ম হতে হল। ঝিমবে বলে আয়েসী একটা বিড়াল প্যাসেজের নিরালা কোণটি বেছে নিয়েছিল। আলোয় বিব্রত, পায়ের শব্দে চকিত হয়ে সে ছিটকে তাকটার উপরে গিয়ে বসেছে। শোবার ঘরে পা দিতে না দিতে কয়েকটা প্রগল্‌ভ চড়ুই ফরফর করে জানালার বাইরের আকাশে ফেরারী হয়েছে।

চোখে আলো লাগছিল, নীরদ দু'হাতে পর্দা টেনে ঘরে ছায়া বিছিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ভয়ে নয়, শরীরের সব ক-টি পেশী সহসা যেন কঠিন হয়ে গেল।

এতক্ষণ বেশ ছিল ঘরটা; ছড়ান, গড়ান, চওড়া। হঠাৎ ছোট হয়ে গেল। এই রকমই হয়, নীরদ জানে। আলোয় দেয়ালগুলো আলাদা হয়ে সরে সরে থাকে, যেন কেউ কাউকে চেনে না। কিন্তু যেই একটু একটু করে অন্ধকার ঘনায়, দেয়ালগুলো পা টিপে টিপে তখন এগিয়ে আসে। ওদের ষড় আছে, নিশুতি রাতে একে অপরের গা ঘেঁষে দাঁড়াবে। অন্ধকারে আলাদা থাকতে কি ওদেরও ভয়!

আলো নিবলেই তাই নীরদ হাত বাড়িয়ে কমলাকে ছুঁয়ে থাকত। এই ছ'-মাস ধরে। রোজ।

বিছানাটা পাতাই ছিল; নীরদ ইচ্ছে হলে শুয়ে পড়তে পারত। কিন্তু যাকে ছুঁয়ে থাকবে সেই মানুষটা কই! এই বিছানার চাদরটার মতোই নীরদের অভ্যস্ত জীবন আর নিয়মকে এলোমেলো করে দিয়ে সে চলে গিয়েছে।

তবু বালিশে মুখ ডুবিয়ে দিতে তারই যেন খানিকটা ফিরে এল। চুলের গন্ধের সঙ্গে থেঁতলান বেলফুলের গন্ধ মাখামাখি হয়ে মিশে আছে। শুধু ফুল কেন, চুল কেন, ভাবতে ভালো লাগছে না। তবু সত্যি, একটু ঘামের গন্ধও আছে; এই তিন মিলে কমলা। তার শরীর, তার ব্যক্তিত্ব। তাকে চেনবার চিহ্ন। তিনেরই এক কাজ, একজনকেই মনে করিয়ে দেয়। তাকে ছায়া-ছায়া ঘরে ডেকে আনে

আনে বটে, কিন্তু ঠিক তাকে নয়, তার মায়াকে। তাকে তখন ছোঁয়া যায় না, কাছে টানা চলে না। সে থাকে দূরে দূরে, সরে সরে, অলৌকিক কণ্ঠস্বরে।

'কষ্ট হচ্ছে না তোমার?'

'হচ্ছে। খুব।'

কনুইয়ে মুখের আধখানা ঢাকা, নীরদ শুয়ে শুয়ে শুনতে পেল।

'কী করবে তুমি এখন?'

'ঘুমব।'

'সারা বিকেল'?

'সারা বিকেল। সারা রাত্রি।'

মিছে কথা। একটা মরা মানুষকে মিছে কথা দিয়ে নীরদ ভোলাবে না। সে ঘুমতেই ত চায়, কিন্তু পারছে কই? পেয়ালায় যেমন করে চা জুড়য়, এক আকাশ রোদ তেমনই জুড়িয়ে ঠাণ্ডা আর হলদে হয়ে এল, নীরদ তখনও বিছানায় শুয়ে আছে পিপাসা পেয়েছে মেটাতে পারেনি, কুঁজো আছে, জল নেই, কেননা কমলা নেই। সারা ঘরে ভাঙা কাচের টুকরো ছড়িয়ে সে চলে গিয়েছে।

দেয়ালে অবশ্য এখনও তার ছবি আছে—সে ত কেবলই ছবি। তবু নীরদ তাকেই নালিশ জানাল, 'এই দেখ না, আমি এখনও সেই জামা-কাপড়েই আছি, যা পরে শ্মশানে গিয়েছিলাম। তুমি আমাকে শুকনো কাপড় এগিয়ে দিচ্ছ না। আসল কমলা হলে দিতে।

'আসল কমলা হলে এতক্ষণ স্টোভে কাপ দুই চা-ও গরম হয়ে যেত। বারান্দার টবটাতে এতদিন ফুল ফুটেছে, সেখানে বেতের চেয়ার টেনে বসতাম দু'জনে। কথা বলতাম। কিই বা বলতাম! হয়ত কিছুই বলতাম না। অন্তত কথা দিয়ে বলতাম না।

আসল কমলা হলে এতক্ষণে ঘাড়ের নীচে, যেখানে ভাঙা খোঁপা-চোয়ান তেল, পাউডার আর ফুল বিচিত্র একটা উত্তেজক গন্ধ সৃষ্টি করেছে, সেখানে মুখ রাখতাম। ঘ্রাণ নিতাম। আমার নাক কাঁপত, ঠোঁট স্ফুরিত হত, কলজে অতি সচল হত, আঙুলের ডগা শক্ত।

'কিন্তু তুমি, ছবির কমলা, তোমাকে নিয়ে আমি কী করব! হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারি, তার বেশী কিছু না। বড় জোর বুকে চেপে ধরতে পারি, কিন্তু সেখানেও কাঠের ফ্রেমের বাধা, কাচের আড়াল। বাসনার পেষণে ঠুনকো কাচটা চুরচুর হবে।'

'তোমাকে নিয়ে কী করি; কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা হ'ল, কী করি আমার নিজেকে নিয়ে!'

যতক্ষণ বেদনা ছিল কমলার জন্যে, ততক্ষণে নীরদ নিজেকে শক্ত রাখতে পেরেছে। কিন্তু যেই নিজের কথা মনে পড়ল, অমনই চেতনার আকাশ কান্নার কুয়াশায় ছেয়ে এল। কী করি, কী করি! আজ রবিবার। অন্য অন্য রবিবারে আমরা বেড়াতে যেতাম। কমলা হাঁটতে চাইত। জুতোর স্ট্র্যাপ যতক্ষণ না এই-ছেঁড়ে এই-ছেঁড়ে হত, ততক্ষণ হাঁটতেই থাকত। শো-কেসে সাজান বেসাতি চোখ দিয়ে চাখত। যেদিন বেড়ান ছিল না, সেদিন গান-শোনা ছিল, কিংবা ছবি দেখা, কিংবা কিছু না, শুধু বসে থাকা। আমার সব কটি বিকেলের

স্বত্ব ওকে বিনা শর্তে দান করেছিলাম। সেই বিকেল আমার হাতে অফুরন্ত অনন্তকাল হয়ে জমে রইল, একে নিয়ে কী করি!

যখের-ধন-পাওয়া দিশাহারা মানুষের মতো নীরদ বারান্দায় এসে দাঁড়াল। একটা সিগারেট ধরিয়েছিল, নির্নিমেষ চোখে চেয়ে রইল তার ধোঁয়ায় দিকে। যেন ওর সব প্রশ্নের জবাব ওই ধোঁয়ার লেখায় রেখায় লেখা হয়ে যাচ্ছে।

সিগারেটের ধোঁয়ায় কখনও মুখের ছায়া পড়ে না, কিন্তু মনটাকে স্পষ্ট পড়া যায়, কিন্তু একথা নীরদ এর আগে ত কোনোদিন ভেবে দেখেনি।

আবার দরজায় তালা দিল নীরদ, রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

বেলা বলল, 'আরে, নীরদবাবু যে! আসুন, আসুন। তারপর, পথ ভুলে নাকি?'

পর পর কয়েকটা সিগারেট টেনে আর খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিয়ে নীরদের স্নায়ু শক্ত হয়েছিল। হেসে বলল, 'ভুলে নয়, চিনে।'

এসব জায়গায় জুতসই জবাব দেওয়াই রীতি।

বেলা ভ্রূভঙ্গি করল, মুচকে হাসল একটু, শেষে বলল, 'আপনি বসুন, এখুনি আসছি।'

বলেই ওঘরে গেল, যেতে যেতে দু' ঘরের মাঝের পরদাটা টেনে দরজা-জোড়া করে দিতে ভুলল না। পরদাটা টানবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে একটু হাসল।

সে-হাসির যা-খুশি-তাই মানে করা যায়। কোনো মানে নাও থাকতে পারে।

অবশ্য মানে নিয়ে ব্যস্ত হবার দরকার নীরদ বোধ করেনি। কেননা মাথার উপরে পাখাটা অনলস এবং বিশ্বস্ত, ঘুরছিল। চেয়ারটা হেলান অতএব আরামপ্রদ, আর হাতের কাছেই সচিত্র একটা সিনেমা-কাগজ আধ-খোলা। ব্যস্ত হাওয়া, যার পড়বার ফুরসুত নেই একটার পর একটা পাতা উল্টে যাচ্ছিল। হয়ত একটু আগে পত্রিকাটা ছিল

তন্দ্রাতুর বেলার হাতে। সেও সম্ভবত এক বর্ণ পড়েনি, শুধু ছবি দেখেছে। হাওয়া পড়ে না, পড়তে জানে না। মেয়েরা জানে তবু পড়ে না। ছবি দেখে। থাকলে।

যে-হাওয়া নিরক্ষর এবং অন্ধ, শুধু পাতা ওল্টায়, তার আবর্তে সিগারেট ধরান দুঃসাধ্য। কিন্তু নীরদ অভ্যস্ত, কোন অসুবিধা হ'ল না। দীর্ঘ একটা টান দিয়ে সে চাইল পরদাটার দিকে। হাওয়া ত চপল আর উৎসুকও—সে কি পরদাও মাঝে মাঝে সরায় না? একবারও কি তার সাধ হয় না, ও-ঘরে উঁকি দিতে? যে-ঘরে বেলা গিয়েছে?

বেলা এ-ঘরে নেই। এখন নেই। নীরদ আছে। বসে আছে। একটু আগে বেলা এখানেই ছিল, নীরদ ছিল না। নীরদ এল, বেলা রইল না। ও-ঘরে গেল।

আসলে, ক্ষয়ে-আসা সিগারেটটার দীপ্ত ডগা ইতিমধ্যেই নীরদকে বুঝিয়ে দিয়েছিল বেলা এখন ও-ঘরেও নেই। কলঘরে গিয়েছে। মুখ-টুখ ভাল করে ধোবে, ঢুলুঢুলু চোখে জল ছিটিয়ে, ফোলা-ফোলা গাল প্রথমে সাবানে পরে শুকনো তোয়ালের, আরও পরে স্নো পাউডারে ঘষে ঘষে ঘুমের সব আদরের ছাপ মুছে ফেলবে।

মেয়েদের এসব সঙ্কোচের কোনো মানে কি আছে! যেন ঘুম দ্বিতীয় একটা পুরুষ, যাকে নিয়ে বেলা এতক্ষণ ভর-দুপুরে দরজা-ভেজান ঘরে ছিল; যার চিহ্ন মুখে-চোখে মেখে নীরদের সামনে এসে দাঁড়াতে বেলার এখন লজ্জার অবধি নেই। যতক্ষণ এ-ঘরে ছিল, ততক্ষণ তাই মুখের আধখানা আঁচলে ঢেকে রেখেছিল।

বেলার কাছে যে ঘুম পুরুষ, নীরদের কাছে সেই আবার মেয়ের বেশে দেখা দিতে পারে, 'চোখ বোজ ত', বলেই মনের সব ভাবনার আলো নিবিয়ে দিয়ে, বুকের ভিতরে মুখ লুকিয়ে, মিশে গিয়ে, সত্তাকে অবশ করে দিতে পারে। ততক্ষণ বেলা কলঘরে জল ঢালুক, কিংবা পা টিপে টিপে পাশের ঘরে ফিরে জামা বদলাক, পাটভাঙা শাড়ির

চকচকে খোলসে নতুন হোক। তখন কৌতূহলী হাওয়া পরদা সরিয়ে ও-ঘরে যত-খুশি উঁকি দিক না, ক্ষতি নেই।

'ঘুমিয়ে পড়লেন?'

চকিত নীরদ চোখ মেলল। বেলা স্নান সেরে এসেছে। কনুই রেখেছে ওর চেয়ারের হাতলে, ছোট্ট মোড়াটা টেনে মুখোমুখি বসেছে। মুখ টিপে হাসছিল কিনা নীরদ বুঝতে পারল না। চোখ রগড়ে সোজা হয়ে বসল, তবু জড়তা গেল না, তখন হাই তুলল।

'ঘুমইনি ত। চোখ বুজে ছিলাম।' এইটুকুই যথেষ্ট হত, তবু নীরদ যোগ করল, 'ভাবছিলাম।'

'আজকাল আর দেখতে পাই না যে! ডুমুরের ফুলটি হয়েছেন।'

'না ত।' নীরদ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তবে হ্যাঁ, এই, কাজ থাকে।'

'বুঝেছি।' বেলা বলল, 'বউ বকে? নীরদবাবু, তুমি ত বিয়ে করেছিলে, না? তা বউ কোথায়?'

নীরদ ফস করে বলল, 'নেই।'

'নেই?'

একবার ঢোঁক গিলল নীরদ, বলল, 'মানে, এখানে নেই।'

'বাপের বাড়ি বুঝি?'

নীরদ ঘাড় কাত করল।

'হঠাৎ বুঝি?'

নীরদ বিরক্ত হয়ে উঠছিল, ঘামছিল। এই জেরার যেন শেষ নেই! ঘরে ছায়া নেমে এসেছে, বিকালের রোদের গায়ে পাকা পেয়ারার রঙ ধরেছে, নীরদের মনে হ'ল সেটা থকথকে বুড়োটে— নরম, বিস্বাদ। নীরদ নিজেও যেন অক্ষম হয়ে পড়েছে, ফোকলা মাড়িতে পেয়ারাটাকে চেপে ধরতে চাইছে, পারছে না, লালায় মাখা-মাখি হয়ে পেয়ারাটা কেবলই ফসকে ছিটকে পড়ছে।

অস্থির হয়ে নীরদ হাতের সময়-লেখা ঘড়িটার দিকে চাইল,

তারপর বেলার সময়হীন চোখে। বলল, 'চল না, যাই, একটু ঘুরে আসি।'

সে কথা বেলা শুনতে পেল না, অন্তত ভান করল না-শোনবার। কুনুইটা এগিয়ে এনে এবার রাখল নীরদের হাঁটুতে, আর এক হাতে গাল রেখে বলল, 'বললে না ত নীরদবাবু, বউ হঠাৎ বাপের বাড়ি গেল কেন?'

'না, ঠিক হঠাৎ নয়,' এখন ঘাম নেই, তবু নীরদ রুমাল বার করে কপাল মুছল।—'না, ঠিক হঠাৎ নয়। শরীর খারাপ হ'ল, মানে এই সময়ে প্রথমবারে ওরা সবাই বাপের বাড়ি যায়।'

'ও', বেলা বলল পা দোলাতে দোলাতে। চোখ ছোট করে বলল, 'বুঝেছি।'

তাড়া-খাওয়া চোরের মতো দ্রুতত্রস্ত হাওয়া হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়ল, কাঁপতে থাকল পরদার আড়ালে, লুকল খাটের নীচে, চাদরের ঝালরটা শুধু থেকে থেকে কাঁপতে থাকল।

জানলা বন্ধ করে দিয়ে এল বেলা, এবারে চেয়ারের হাতলে বসল। হয়ত স্বেচ্ছায়, হয়ত ভার সামলাতে একটা হাত রাখল নীরদের কাঁধে। পায়ের বুড়ো আঙুল একবার বাঁকাল, সোজা করল, ফের বাঁকা করল, তারপর শাড়ির পাড়ে সবটাই ঢেকে ফেলল। নীরদ আড়চোখে চেয়ে দেখতে পেল, বেলার চোখে এখনও দুষ্টুমি। আস্তে আস্তে ওর কাঁধ ধরে, ঝাঁকুনি দিয়ে বলছে, 'বল না নীরদবাবু, এ সময়ে তোমাদের বউয়েরা কী করে! বাপের বাড়ি যায়, আর কী? খুব ঘুমোয় পড়ে পড়ে, না? যাচ্ছে-তাই সব জিনিস খুঁটে খুঁটে খায়?'

'খায়।'

'আর তোমরা, তোমরা তখন আমাদের কাছে আস, কেমন?'

হাততালি দিতে গেল বেলা, ভার সামলাতে পারল না, কেননা শাড়ির পাড় দিয়ে সম্পূর্ণ করে ঢাকা পা দু'টি তখনও ছিল উঁচুতে,

গড়িয়ে পড়ছিল, নীরদ হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল। ধরল, কিন্তু ফেলল না, বরং টানল, টানতেই দু'হাতের অঞ্জলি একটি নরম মসৃণ মুখের স্পর্শে ভরে গেল।

তারপর, তারও অনেক পর, অন্ধকার নামল। নামল, নাকি বেরিয়ে এল ঘরেরই কোণ থেকে, যেখানে দু'খানি ইঁটের উপরে তোরঙ্গ আর সুটকেস সাজান; রোজ ভোরে অন্ধকার ভয়ে ভয়ে সরে সরে তোরঙ্গের নীচে লুকিয়ে রোদের থাবা থেকে গা বাঁচায়। আবার সন্ধ্যা হতেই ভীতু কচ্ছপের মতো গলা বাড়িয়ে দেয়। আস্তে আস্তে তার সাহস বাড়ে, ক্রমে নিজেকে ছড়ায়, গোটা ঘরখানাই ছেয়ে ফেলে। এই পৃথিবীটাও নিমেষে একটা অতিকায় কচ্ছপ হয়ে যায় নাকি, নীরদ নরম তলপেটে আলো লুকিয়ে একপিঠ অন্ধকার নিয়ে কাঁপে?

কান পাতলে শোনা যায়, নীরদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই এখন শুধু অনুভূতি আর শ্রুতি হয়ে গিয়েছে। তাই সেও শুনতে পেল, সেই অন্ধকারও এক সময় গুনগুন করে ওঠে। অন্ধকার নয়, বেলা। বেলা গুনগুন করছে।

নীরদ নিজেকে বলতে শুনল, 'একটা গান করবে?' কোলের শীতলে ডুবিয়ে রাখা মুখ তুলে বেলা বলল, 'এখন, এইভাবে?'

'এইভাবে।'

নীরদ দৃঢ়, গাঢ় গলাতেই বলেছিল, তবু বেলা শুনল না, হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আলো জ্বেলে দিল, ঘরের কোণ থেকে নিয়ে এল একটা বাজনা। নীরদ তখন দু'হাতে চোখ ঢাকল।

খানিক পরে গান থামিয়ে বাজনাটা ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, আবার সেই আগের মতোই নীরদের খুব কাছে এসে বলল, 'নীরদবাবু, তোমার বউ গান জানে?'

'জানে।'

'গায়? শোনায় তোমাকে?'

'শোনায়।'

'রোজ ?'

নীরদ বলল, 'রোজ।'

বেলাকে আবার প্রগল্ভতায় পেয়েছে। দু'হাত বাড়িয়ে গলা জড়িয়ে ধরল নীরদের, আধ-আধ গলায় বলল, 'তোমার বউ রোজ আর কী করে নীরদবাবু ?'

'রান্না করে খাওয়ায়।'

'কখন বাড়ি ফিরবে, সেই জন্যে বসে থাকে ?'

'থাকে।'

'বিকেল হতে না হতে গা ধোয়, খুব সাজগোজ করে ?'

'করে।'

'রোজ ?'

'রোজ।'

ওর বুকে তর্জনী দিয়ে টোকা দিতে দিতে বেলা বলল, 'আর কী করে ?'

'আর', নীরদ হঠাৎ প্রবল আবেগে বেলার মুখখানা বুকে চেপে ধরে বলল, 'আর, অনেক, অনেকক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে এইভাবে মিশে থাকে।'

সোজা উঠে এসে দরজার ফোকরে চাবি গলিয়ে দিল নীরদ, আর ভয় করল না। একেবারে শোবার ঘরে ঢুকে আয়নার সমুখে দাঁড়াল। চোখের মণি এখনও কি বিস্ফারিত, নাকের ডগা স্ফীত ? ঠিক বুঝল না। কাচটা যেন ঘষা-ঘষা।

পকেটে হাত দিল, উঠে এল বেল-ফুলের মালা। কখন বেলার খোঁপা থেকে ওর আঙুল মালাটা খুলে নিয়েছে, মনে নেই ত। ফুল-

গুলো তুলে নাকের কাছে ধরল, জানা-জানা গন্ধ। কার? বেলার না, কমলার? ঠিক চেনা গেল না।

কমলার ছবিটার দিকে চোখ পড়ল তখন। প্রথমে চমকে উঠেছিল, দু'পা পিছিয়েও গিয়েছিল ভয়ে, কিন্তু পর মুহূর্তেই সাহসে ভর করে নীরদ এগিয়ে গেল। মালাটা ঝুলিয়ে দিল ফ্রেমে। জোর করে হাসল। তারপরে খুব কোমল, অবুঝকে লোকে যে সুরে বোঝায়, সেই সুরে বলল, 'জানি, তুমি আমাকে অবিশ্বাসী ভাববে, রাগ করবে। বলবে, একটা দিনও তোমার তর সইল না? কিন্তু এ রাগের কোনো মানে হয় না। বোকা মেয়ে, কিচ্ছু বোঝ না। আমি ত এতক্ষণ তোমার সঙ্গেই কাটালাম।'

কাচের উপরে আঙুল ঘষে আদর করতে করতে নীরদ আবার বলল, 'ওই দেখ, তুমি বিশ্বাস করছ না। বলছ, তোমার সঙ্গে নয়, বেলার সঙ্গে? বেলা নয়, সত্যি বলছি, তুমি, তুমি, তুমি। আর কেউ নয়। রোজ ঘরে ফিরে তোমাকে পাই, আজ পেলাম না। সব ফাঁকা ঠেকল। ঠেকল বলেই ত—'

নীরদ হঠাৎ থেমে গেল। সে বুঝতে পেরেছে। বেলা ত নয়ই, কমলাও নয়। কেউ নয়। অভ্যাস।

তাড়াতাড়ি সরে এল নীরদ, বারান্দায় দাঁড়াল। বৃষ্টি-ভেজা পিচের পথে ওর আসল মনের ছায়া পড়েছে। সেই ছায়া সব জানে। তাই নীরদ তাকেই জিজ্ঞাসা করল: আমরা কি তবে বিশেষ কাউকে নয়, আসলে কয়েকটা অভ্যাসকেই ভালোবাসি? হঠাৎ একটা দাঁত পড়লে ফাঁকা লাগে, গালের ভিতরে জিভ ঘুরিয়ে হারানো দাঁতটাকে খুঁজি। সিগারেট ফুরিয়েছে জেনেও পকেটে হাত ঢুকিয়ে প্যাকেট হাতড়াই। সবই কি তাই!

নির্ভয়, নির্ভার নীরদ আলোটা নিবিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদা

রোজ ওরা চেয়ে চেয়ে দেখে!

যে চোখের পলক পড়ে না, সেই চোখ দিয়েই হাসে। দু'একজন বিশ্রীভাবে কাশেও। কেউ হালকা সুরে, নিচু পরদায় গান ধরে। আরেক জন মোটা সোটা মহাভারত সাইজের বইটা কোলে টেনে নিয়ে তবলা বাজায়।

ময়না শোনে, ঠুকরে ঠুকরে ছোলা খায়, ছাতু খায়, ঠোঁট দিয়ে খাঁচার শিক ঠোকরায়। কিন্তু কিছু বলে না! শোনে, মুখ বুঁজে শোনে।

রুনির লজ্জা কেন, ও বোঝে।

লজ্জা হবে না? রুনির এখন সেই বয়স, যে বয়সে লজ্জাই ভূষণ। রুনির বয়স যদি হত দশ কিংবা বারো, তবে ওদিকের ঘর থেকে কে তাকে দেখছে না দেখছে, তাতে তার বয়েই যেত। যখন শরীর ভরেনি, চাউনি বাঁকা হয়নি, পায়ের গোছ বলে বস্তুই নেই, তখন যে খুশি দেখুক, যত খুশি দেখুক, দেখুক না। আবার, বিয়ে যদি হয়ে যেত রুনির, সে কোলের বাচ্চাকে অনায়াসে নাচাতে নাচাতে বারন্দায় এসে দাঁড়াতে পারত। ঘরে ঢুকে বাইরের দিকে পিছন ফিরে বসে আঁচল আড়াল করে তাকে দুধ দিত। একবার বাচ্চা হ'লে একটু আধটু অসাবধান হতে দোষ নেই। লোকের নজরে শুচিবাই তখন থাকেই না।

রুনির বউদিরও নেই। নিচের কলতলায় স্নান সেরে সে ভিজে কাপড়ে, বড় জোর বুকের ওপর একটা গামছা আড়াআড়ি ফেলে যত অসঙ্কোচে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে, রুনি তা পারে না।

অভিজ্ঞ ময়না ছাতু খায়। ধোঁকে, আব ভাবে রুনি পারে না।

রুনির বয়সী কোন মেয়েই পারে না। না বাচ্চা, না মাঝ-বয়সী—এই সময়ে মেয়েরা কিছু জড়োসড়ো হয়। চলতে গেলে পায়ে শাড়ি জড়ায়। যেন আলগা ফুলটির মতো, টোকা দিলে ঝরে পড়বে।

রুনিকে ময়না তাই সহানুভূতির চোখে দেখে। রুনি ওর বউদিকে কি বলে, জানে।

বলে, রুনি রোজ বলে।

'বউদি, দাদাকে বলেছ?'

'হ্যাঁ ভাই বলেছি।'

'কি বললে?'

'বলল ত যে, বলবে।'

সংক্ষেপে সারা কথা। অন্য কেউ হলে ভাবত, সাঙ্কেতিক ভাষা। অথচ আসলে তেমন কিছু নয়; ময়না জানে। সেই যে এ বছরের প্রথম ঝড়ে—যখন ইলেকট্রিকের তার-সুদ্ধ, পাখিদের বাসা-সুদ্ধ পিঁপড়েয় খাওয়া গাছটা কাত হয়ে পড়ল, খাঁচাটা ভীষণ ভাবে দুলতে দুলতে দড়ি ছিঁড়ে নীচের নর্দমায় গড়াগড়ি খেল, ময়নাটা তবু মরেনি;—তখনই ত কবাটের কবজা আলগা হয়ে গেল। রুনিদের ঘরের দরজার। মুণ্ড থেকে আধখানা খসা ধড়ের মতো কবাট দুটো ঝুলতে থাকল। তখন থেকে ঝুলছে ত ঝুলছেই। ওরা কোনো মতে ঠেকনা দিয়ে সামলায় বটে, কিন্তু একটু হাওয়া উঠলেই দরজাটা ফের আলগা হয়ে যায়, ক্লান্ত জীবের মুখের মতো হাঁ হয়ে যেন হাঁপায়।

রুনির ইচ্ছা, দরজাটা মেরামত করা হোক। ওরা দাদা বাড়ীওয়ালাকে বলুক।

ও বলে বউদিকে। বউদি যদি বলে অসুবিধে হচ্ছে, তবে দাদার গরজ বেশী হবে। বউদি বলে দাদাকে। দাদা রাজী হয়। বাড়িওয়ালাকে বলবে বইকি, নিশ্চয়ই বলবে। কিন্তু বলে না।

বলে না কারণ, আসলে ভয় পায়। যে মাসে দরজাটা আলগা হয়ে পড়ল, সেই মাস থেকেই ত ওদের বাড়ী ভাড়া বাকী পড়ে আছে,

রুনি জানে। দাদার পার্টটাইম কাগজটা গেছে। বউদির কথায় দাদা মাথা নেড়ে যতই সায় দিক না কেন, বাড়িওয়ালাকে মুখ ফুটে বলবার মতো সাহস ওর কোনো দিনই হবে না। বললেই হয়ত ভাড়ার তাগাদা আনবে। কেঁচো খুঁড়ে সাপ বার করে কাজ কী।

রুনি এসব জানে। ওই ময়নাও জানে। ও ঘুমোয় না যে। ঝিমোয়, আর দেখে। দেখে, দেখে, দেখে।

রুনির ইচ্ছে, এই বারান্দাতেও পুরনো শাড়িটাড়ি যা হয় তাই দিয়ে একটা পরদা ঝুলিয়ে দেওয়া হোক। বউদি তা চায় না। পুরনো কাপড় কই। যদি দু'চারখানা জমেও, তবে কাঁথা তৈরীর কাজে লাগবে। কিংবা বাসনওয়ালাকে দিয়ে নেওয়া যাবে কাপ, ডিশ, গেলাস। পরদা-টরদা ওসব হল বাজে সৌখিনতা, পরদা রোদে জ্বলে, বর্ষায় ভেজে। শেষে পচে খসে ছিঁড়ে পড়ে!

বাইরে পরদা দিলে এই রোদ্দুরটুকুও পাব না যে। এখানে আমার বাচ্চাটাকে শুইয়ে দিই। তেল মাখাই। রোদটুকু গেলে কোথায় যাব? বউদির আপত্তি অনেক।

রোদটুকুর মায়া রুনির কি নেই, আছে, দক্ষিণের খোলা এই বারান্দাটুকু দেখে সেইত প্রথমে খুশীতে নেচে উঠেছিল। কালো সিমেন্টের ওপর সকালের রোদ যখন এসে পড়ে, মনে হয় প্রকাণ্ড একটা ফুলের তোড়া। তার গন্ধ নেই, রঙ আছে। তাকে শাদা বলব না, সোনালী বলব না, হলদেও না, তিনটেরই কিছু কিছু নিয়ে সে তৈরী। এই তিন রঙই রুনির পছন্দ, আর তিনে মিলে যে রোদ-টুকু তৈরি, তাকে পছন্দ সব চেয়ে।

কিন্তু তবু ত পরদা চাই।

কেননা রাস্তার ওপারেই যে ক্লাবঘর, আর সেখানে যে দিন-রাত আড্ডা চলে, তা তো রুনি আগে জানত না। ওরা তাস পেটে, সিগারেট খায়, গান গায়, নাটকের মহড়া দেয়। বাড়িওয়ালার

ছেলেটাই যে ও দলের পাণ্ডা, রুনি তাও জেনেছে। সাহস ত ওরই সব চেয়ে বেশী।

ময়নাকে ছাতু দিতে দিতে রুনি বলে, 'জানিস, সব চেয়ে বাড়াবাড়ি ওই করে। ক্লাবঘরের দরজা খোলা তো থাকেই, আর যেই টের পায় আমি ঘরে আছি, ওই নির্মলই একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায়। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কবিতা পড়ে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে। আমাদের বারান্দায় পরদা নেই, কবাটের কবজা নেই, আমি একটু গড়াতে পারি না মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে, স্নান সেরে শাড়ি ছাড়তে আমাকে কত যে আড়াল আর আনাচ কানাচ খুঁজতে হয়। অভদ্র লোকগুলো সারাক্ষণ ত দেখছেই। ভিখিরির হাতের মতো ওদের চোখ খোলাই থাকে। বলতো ময়না যাই কোথা ?

ময়না কি পরামর্শ দিয়েছিল কে জানে, রুনি নিজেই একদিন একটা অসমসাহসিক কাজ করে বসল। সে বৃত্তান্তটা নিজেই ময়নাকে শোনালো।

তখনও বুক ধড়ফড় করছে, বলল, 'জানিস, আজ আমি নিজেই ওখানে গেছলুম। বলতো, কোনখানে ?'

রুনি খানিক চুপ করে রইল, যেন ময়না কী বলবে, তার অপেক্ষা করছে। কিন্তু ময়না যখন বলল না, বা বলতে পারলো না, তখন রুনিকে বলতে হল। —'গেছলুম ওখানে। রাস্তা পেরিয়ে, ওই ক্লাবঘরে। ক্লাবঘরে ঠিক নয়, ক্লাবঘরের বারান্দায়। ভাবতে পারিস ? তুই বুঝি বিশ্বাসই করছিস না ? বেশ, তোকে খাঁচা থেকে বার করে নিই, আমার বুকে চেপে ধরি, তা হলে তুই টের পাবি, এখনও আমার বুকটা কী ভীষণ তাড়াতাড়ি ওঠাপড়া করছে। করবে না ? সোজা কাণ্ড করেছি নাকি। গিয়ে দাঁড়ালুম ক্লাবঘরের বারান্দায়। ওরা ছিল, সকলেই ছিল। আমার পা কাঁপছিল, ভাবলুম ঝোঁকের মাথায় এতটা করে ভালো করিনি। ফিরে যাই। কিন্তু ফেরবারও উপায় ছিল না। কারণ, ও আমাকে দেখে ফেলেছে।

বাড়িওয়ালার ছেলে নির্মল। দলের ওই সর্দার কিনা। চেহারাটা ভালো হলে কী হয়, ভারী অসভ্য আর পাজী। ময়না, তোকে আর কি বলব, তুই ত সবই জানিস। ও শিস দেয়, যখন তখন হাসে, রাগে আমার গা রী-রী করা উচিত। উচিত, কিন্তু করে না। সত্যি কথা বলতে কি, আর শুধু তোকেই চুপিচুপি বলছি, আমার একটু মজাই লাগে।'

ময়না অবাক হ'ল। খাঁচার শিক ঠুকরে ঠুকরে ওর বিস্ময় প্রকাশ করল।

রুনি বলে গেল, 'যাক, যা বলতে এসেছিলাম, তোকে সে-কথা বলি। ওরা আমাকে আজ খুব অপমান করেছে রে। অপমানই ত। আমি বললুম ওকে, নির্মলকে, আপনারা এই ঘরের দরজাটা বন্ধ করে রাখতে পারেন না?

'একটু জোর দিয়ে, গলায় একটু রাগ ফুটিয়ে বলেছিলাম। আমি বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। নির্মলই বারান্দায় এল। অন্য যে-কোনো একজন আসতে পারত। কিংবা ওরা সবাই মিলে। কিন্তু এল নির্মলই। উনিই নাটের গুরু কিনা। ভুরু কুঁচকে আমাকে দেখলেন। আহা যা না ছিরি, ভুরু কোঁচকালে ওকে কতই না ভালো দেখায়! নির্মল বলল, আমরা দরজা বন্ধ করে রাখব কেন? বললুম, আমরা ও-পাশেই থাকি, চলাফেরা করি, অসুবিধে হয়। তবু ও বলল, কী অসুবিধে?

'কিছু যেন বোঝেন না। বুঝলি ময়না, যেন ন্যাকা। মেয়েদের কত রকমের অসুবিধে আছে, সব মুখ ফুটে বলা যায় নাকি? এক ঘর পুরুষ এই সরু গলিটার ওপাশেই হাঁ করে চেয়ে আছে জানলে কোন মেয়ে নিশ্চিন্ত মনে শুতে পারে? দরজাটার পাল্লা আলগা, তুই জানিসই তো।

'বললাম, ওকে সব বুঝিয়ে বললাম। ভদ্রলোকের ছেলে ভেবেছিলাম, সব শুনে ওর সহানুভূতি হবে। দূর, দূর। ও মানুষ নাকি?

করল কি, পিছন ফিরে ওর ইয়ারদের দিকে চেয়ে বলল, শুনেছিস, ওনাদের অসুবিধে হবে বলে আমরা নাকি ক্লাবঘরে বসতে পাব না।

'আমি বললাম, বসতে পাবেন না, তা বলিনি। শুধু দরজাটা বন্ধ করে রাখতে বলেছি। জানিস ময়না, একথা শুনে ও বিশ্রীভাবে হেসে উঠেছিল। একটা হো হো আওয়াজকে যেন ডেলা পাকিয়ে আমার মুখে ছুঁড়ে মেরেছে। আমার লেগেছে। মুখ লাল হয়েছে, কেঁদে ফেলিনি কিন্তু চোখ ফুলে উঠেছে।

'ভিতর থেকে ওর বন্ধুদের মধ্যে কে বলে উঠেছে, ওকে স্পষ্ট কথা বলে দে নির্মল, ওসব আবদার এখানে চলবে না।

'নির্মল সত্যিই আমাকে সেই কথাই বলল। বরং একটু বাড়িয়েই বলল। অত সুবিধে অসুবিধে বাছতে গেলে তোমার দাদাকে একটা নির্জন পাড়ায় নতুন একটা বাড়ি তৈরি করে উঠে যেতে বল। সেখানে কারুর নজর পড়বে না। ঠাট্টা ছাড়া কী। আর কী ছোটলোকের মতো ঠাট্টা! যাদের বাড়ি ভাড়া বাকী পড়ে, তাদের বাড়ি তৈরি করে চলে যেতে বলা মানে অন্ধকে অন্ধ, খোঁড়াকে খোঁড়া বলে গাল দেওয়া। না, ময়না? আর শুনলি তো, ও কিনা আমাকে তুমি বলল! আলাপ ছিল না, পরিচয়ও না, হলামই বা ওদের ভাড়াটের মেয়ে, তাই বলে প্রথম সাক্ষাতেই একেবারে তুমি! ও ভদ্রতা শেখেনি। তবু দমিনি, মরীয়ার মত বলেছি, বেশ, আমাদের বাসাটা মেরামত করে দিন। দরজাটায় কবজা লাগান। একটা চোখ ছোট ছোট করে ও তখন আমার দিকে চেয়েছে। '—ওসব কথা আমার বাবা জানেন, তাকে বল।'

'ময়না, তখন আমি চলে এসেছি। আসতে আসতে শুনেছি, ওরা সবাই মিলে হাসছে। একজন বলল, আমার গলা নকল করে বলল, আমাদের অসুবিধে হবে, অতএব আপনারা দরজা বন্ধ করে সেদ্ধ হয়ে মরুন! মরে যাই। আরেকজন বল, খবর্দার নির্মল ওর কথায় কান দিবিনে, ওদের ঘরের দরজাও সারিয়ে দিবিনে। বাবাঃ, দিব্যি এখানে

বসে বসে সকলে মিলে নানান মজার চীজ দেখতে পাচ্ছি। আমাদের নজরে ওদের গায়ে যদি ফোসকা পড়ে, তবে ওরা উঠে যাক। নির্মলকে চাপা গলায় বলতে শুনলুম, উঠবে কী করে, ঘর ভাড়া তা-হলে কড়ায় ক্রান্তিতে মিটিয়ে যেতে হবে না? ময়না, আমি রাস্তা পার হয়ে এসেছি, আমার বুক এখনও কাঁপছে, আমার হার হয়েছে।'

ময়না টের পেয়েছিল, কিন্তু সবটা বুঝে উঠতে পারেনি। সেই যে সেদিন রুনি অতক্ষণ ধরে কাঁদুনি গেয়ে গেল, নালিশ করল বাড়িওয়ালার ছেলেটার নামে, তারই নাম ত নির্মল? ফর্সা, লম্বা, চালিয়াত ছেলেটা? সে যে আজকাল ঘন ঘন যাওয়া আসা শুরু করেছে—সেদিনের পর থেকেই। ময়না তাতে অবশ্য অবাক হয়নি। এসব ছেলের ধরনধারণ সে জানে। যারা ক্লাব ঘরে আড্ডার ছুতোয় সামনের বাড়ির মেয়েদের ওপর নজর রাখে, তারা একটু আলাপের সুযোগ পেলে আর রক্ষা নেই।

ময়না অবাক হয়েছে রুনির ভাবগতিক দেখে। ছোকরা, ওই নির্মল, বারবার সে নানা ছুতোয় আসছে, তাতেও তো রাগ করছেই না, বরং প্রশ্রয় দিচ্ছে। ছি, রুনি, তুমি এমন বেহায়া! ওই ছেলেটাই তোমাকে সেদিন কী অপমান করেছিল, এরই মধ্যে ভুলে গেলে? হলই বা ও বাড়িওয়ালার ছেলে, ওদের অনেক পয়সা, না হয় স্বীকার করলুম ছেলেটা দেখতেও ভাল। কিন্তু তুমি ত জান, ও আসলে রাঙামুলো, ওর হাসি দেখে ভুলে যাওয়া তোমার উচিত হয় নি।

কিন্তু খাঁচায় বন্দী ময়না শুধু দেখতেই পারে, রাগ করতেও পারে, বড়ো জোর খাঁচাটিকে ঠোকরাবে, কিন্তু প্রতিকার করার সাধ্য তার নেই। সে লক্ষ্য করেছে, ওই নির্মল ছোকরা আসে, যখন ঘরে রুনির বউদি থাকে না তখন। বউদি যখন ছাতে গেছে চুল শুকতে কিংবা কলতলায় কাপড় কাচছে, তখনই ও পা টিপে টিপে আসে। সময়গুলো রুনিই ওকে বলে দিয়েছে কিনা কে জানে! রুনি,

তুমি না তেজী মেয়ে, তোমার তেজ কোথায় গেল? নাকি সবই বয়সের রীতি?

ময়নার ঘেন্না ধরে গেল। যে-মেয়ে আধময়লা শাড়ি পরে দিনরাত কাটিয়ে দিত, তার আজকাল সাজগোজের ঘটা কত! চুল আঁচড়ান শেষই হয় না। সম্বলের মধ্যে তো খান তিনেক শাড়ী, তাই কতবার বদলে বদলে পরে, তার ঠিক নেই!

আর কত গল্প নির্মল এলে! ফুসফুস, ফিসফিস, আর কত খিল-খিল হাসি। রুনি, ওই লোকটার ফাঁদে ধরা পড়বার আগে তুমি গলায় কেন দড়ি দিলে না।

সইতে না পেরে ময়নাটা একদিন চেঁচিয়ে উঠল। সবে বুঝি ওরা একজন আরেজনের হাতে রেখেছিল হাত, হয়ত নির্মলের মুখটা রুনির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, ঠিক তখনই ময়না কর্কশ গলায় ডেকে উঠল। দু'জন ছিটকে সরে গেল দু-দিকে, নির্মল তরতর করে সিঁড়ি টপকে পালাল, আর রুনির বউদি আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে ছুটে এল।

'কী হয়েছে, ঠাকুরঝি, কী হয়েছে?

'কই বউদি, কিছু না ত।'

ময়না মনে মনে বলল, মিথ্যেবাদী।

রুনির বউদি বলল, 'পাখিটাকে বুঝি খেতে দাওনি? খুব জোরে ডেকে উঠল কিনা, আমি তাই ভয় পেয়েছিলুম।'

'ওকে খেতে দিচ্ছি বউদি, তুমি রান্না ঘরে যাও।'

খেতে দিতে এসে ময়নাকে ভীষণ বকল রুনি।

'তোকে আমি খেতে দেব না ময়না, দেব না, দেব না, দেব না। তুই কেন চেঁচিয়ে উঠলি? বুঝি, হিংসে, তোর সব হিংসে। আমরা দু'জন আগে সখীর মত ছিলুম, দু'জনেই দুঃখী। এখন আমি একা সুখী হতে চলেছি তুই সেটা সইতে পারছিস না, কেমন? না হয় ও আমার হাত ধরেছিলই, না হয় মুখও নুইয়ে দিয়েছিল, কিন্তু ও একটা

ইয়ে খেলে কী এমন রসাতলে যেত, শুনি? তুই ভাবছিস, ও লোক খারাপ? তা নয়, ময়না, তা নয়। আমিই আগে ওকে ভুল বুঝেছিলুম। ওর মনটা খুব ভালোরে। ওর বাবার, আমাদের বাড়িওয়ালার মতো ও চামার নয়। যাক গে, হবু-শ্বশুর, নিন্দে করব না। ও চাকরি খুঁজছে, পেলেই নাকি আমাকে…। বাবা-মার মত ওই করাবে। আমার মতো মুখ নাকি ত্রিভুবনে দেখেনি। তুই বিশ্বাস করছিস না?'

রুনি এবার খুব রাগ করল। 'তা তো করবিই না। তোর মনে মনে যে হিংসে! ওই জন্যে ত মাঝে মাঝে তোর ওপর খুব রাগ হয়। ভাবছিস আমি লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়েছি, আত্মসম্মান খুইয়েছি। তা নয় রে, পাখি, তা নয়। আমি আমার 'কোট' ছাড়ি নি। ওই দরজা ওরা সারিয়ে দেবে। সে কথা আজ আদায় করে ছেড়েছি। কী হয়েছিল জানিস? ও যেই ঘরে ঢুকে আমার হাত ধরল, তখুনি আমি আঙুলের ইশারায় ওকে দেখিয়ে দিলুম ক্লাবঘরটা। এ-দরজা হাট, ও-দরজা হাট। ওরই চারজন বন্ধু এদিকে ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে আছে। ব্যাস, বাবুর মুখ অমনই কালো হয়ে গেল। কী বলল, বল ত রে?'

ময়না বলতে পারল না।

রুনি বলে গেল, 'বলল ছিঃ, তোমাদের ঘরটায় পরদার বালাই নেই? আমি বললাম, দরজা ত তোমরাই সারিয়ে দাওনি। ও বলল, হুঁ। আরও বলল, ওর বাবাকে বলে দরজাটা সারিয়ে দেবে, ক্লাব-ঘরের দরজাও যতক্ষণ পারে বন্ধ রাখবে। বলল, তোমাকে দ্রৌপদী হতে দেব না আমি। কী দুষ্টু বল্ ত। পুরুষেরা ভারী হিংসুটে। আগে একা দেখতেন। এবার বাবু সবটাই নিজের জন্যে রাখতে চান। পরদা না থাকার জ্বালা টের পেয়েছেন। তুই কি বলিস, এক ঢিলে দুই পাখি মারলুম না?'

খাঁচাটায় আস্তে আস্তে একটি দোলা দিল রুনি। ময়নাও দুলতে

লাগল। আরও কাছে এসে বলল, 'তুই ভাবছিস সব ওদের ধোঁকা? অমন যদি করিস ময়না, দেব একদিন তোর গলা টিপে। কিংবা খাঁচা খুলে উড়িয়ে দেব। তোর অত সন্দেহ কেন রে? বলছিস, ওর সব কথা মিথ্যে, বড়লোকদের কথায় বিশ্বাস করতে নেই? কিন্তু ময়না, তোকে একটা কথা বলি। তুই ত আমাদের ঘরের হাল জানিস, আমার বয়স কত তাও জানিস, আমাদের উপায়ই বা কি? বিশ্বাস না করেও এতদিন ত জিতিনি, না হয় একবার বিশ্বাস করেই ঠকি?'

হোলি

অতি-গভীর আর অতি-তুচ্ছ, এই দুই বস্তুকেই আমার লেখা থেকে দূরে রেখেছি। প্রথমটিকে রেখেছি লেখা যায় না বলে। দ্বিতীয়টিকে অযোগ্য বলে।

যা অকিঞ্চিৎকর তাকে স্থায়ী রূপ দেওয়া কঠিন। কোনকালে কোনো একটি চরিত্রকে হয়ত বিচিত্র মনে হয়েছিল, একটি ঘটনাকে মনে হয়েছিল, দুর্বোধ্য, মনে সামান্য সময়ের জন্যে অস্বস্তির আলোড়ন তুলে তারা নিজে থেকেই মিলিয়ে গিয়েছে। টুকরো টুকরো কয়েকটা নুড়ি নিয়ে পুরোপুরি কিছু গড়া যায় না।

তবু অনেক লিখে লিখে যখন কলম ক্লান্ত হয়, দেহে অবসাদ আসে, তখন এমন অনেক ছোট ছোট কথা, আর ছবি মনে পড়ে, তাদের নিয়ে আজও কিছু লেখা হয়নি। হয়নি আরও এই কারণে যে, সেই সব ঘটনার সবটা আমিও হয়ত বুঝিনি। শিশু-পত্রিকায় ধাঁধাঁ থাকে, তার জবাবও থাকে—অন্য পৃষ্ঠায়। পাতা উল্টে সেটি জেনে নিতে হয়। আমাদের গল্পও, অনেক গল্পই, ধাঁধাঁ, তার জবাবও আমরাই দিয়ে থাকি, গল্পেরই শেষাংশে, বোধ হয় শেষ অনুচ্ছেদে। কখনও স্পষ্ট করে, কখনও আভাসে। অর্থাৎ আপনি বিপদজাল গড়ে তুলে আপনি কেটে দিই। কিন্তু যে ধাঁধাঁর জবাব নিজেরই জানা নেই, পাঠকের সামনে তাকে হাজির করি কী করে।

লিখতে লিখতেই মনে পড়ছে, রেখা আর লেখার কথা। বোধ হয় ওরা যমজ বোন। আমি ওদের এক দিনই দেখেছিলাম, সেই হোলির দিনে। দেখেছিলাম, অনেকটা বুঝেওছিলাম, কিন্তু সবটা বুঝি নি।

আমায় রবিদা ওখানে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আগে রবিদার কথা দু'কথায় বলি। আমাদের চেয়ে বয়সে বেশ

খানিকটা বড়ো। আমরা কলেজের ইয়ার, তিনি তখনই জেন্টলম্যান হয়েছেন, পড়াশোনা ছেড়েছেন অনেক দিন, ফ্লুট বাজাতেন, আমাদের পাড়ার থিয়েটারে হিরোও হতেন। আমরা যখন শার্টের কলার উলটে দেওয়াই চরম চালিয়াতি বলে জানতুম, তিনি তার অনেক আগে থেকেই গিলে-করা ফিনফিনে পাঞ্জাবি আর চুনোট করা ধুতি পরেন।

তাঁর গায়ে রঙ দিতে গিয়েছিলুম। তিনি নিলেন না। বালতি গোলা জল সবটা উবুড় করে ঢেলে দিলেন।

'বাঃ রে, নষ্ট করে দিলেন?'

'এ-সব কেন এনেছিস?'

'আজ যে হোলি। রঙ দেব না? মজা করব না একটু?'

'মজা?' রবিদা বলে উঠলেন, 'মজার তোরা কী জানিস?'

রবিদা একটা বিশেষ ঢঙে হাসলেন, নাটক করে করে ওটা তাঁর মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আর কিছু না বলে ফ্লুটটি তুলে নিলেন।

আমরাও চলে আসছি, রবিদা পিছন থেকে আমাকে ডাকলেন। কাছে যেতে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন—'আসল মজা দেখতে চাস? তা হলে ঠিক তিনটেয় আসিস। তোকে এক জায়গায় নিয়ে যাব।'

ঠিক তিনটেতেই গেলুম। রবিদা তৈরিই ছিলেন। তাঁর সেই অকলঙ্ক সাজ, আজ অধিকন্তু একটা সাদা চাদর।

রাস্তায় নেমে ট্যাক্সি নিলেন।

কোথায় যাচ্ছি। রবিদা তখন ভাঙলেন না, ট্যাক্সিটাকে সোজা যেতে দিলেন কিছুক্ষণ, তারপর ডাইনে, বাঁয়ে ফেরালেন—শেষের দিকে গাড়ি ডাইনে ঘুরছে না বাঁয়ে, কিছুই খেয়াল করতে পারলাম না, কেননা আমার নিজেরই তখন মাথা ঘুরছিল।

যেখানে আমরা নামলুম, পরে শুনেছি সেটা দর্জিপাড়া। রবিদা

তরতর করে একটা বাসার সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন, কড়কড় করে কড়া নাড়লেন। বললেন, 'এটা হল রেখা-লেখাদের বাড়ি।'

'রেখা কে, লেখাই বা কে!'

'কেন, মনে নেই, সেই যে দু'টি মেয়ে আমাদের এখানে নীরবালা আর রূপবালার পার্টে নেমেছিল? এ্যামেচার আর্টিষ্ট হিসাবে খুব নাম করেছে রে।'

'ওরা তবে আর্টিষ্ট?'

দরজা খুলে গিয়েছিল এবং ভিতরে পা দিয়েই রবিদা সহর্ষে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—'আরে বিজন যে, কতক্ষণ? হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। পরিমলবাবুও জুটেছ দেখছি, ব্যাপার কী বল ত, অতি লোভে পরিমল আসিয়া জুটিল?'

ফরাসে যাঁরা বসেছিলেন, তাঁদের একজন বলে উঠলেন—'আজ হোলি।'

'ঠিক! আজ প্রাণটা সারা-রা-রা হয়ে গেছে।'

ফরাসের এক কোণে আমি কুণ্ঠিত ভাবে বসেছিলুন, রবিদা টেনে এনে একেবারে মধ্যিখানে মহারাজ করে দিলেন।—'আমার ব্রাদার। খুব লাজুক, কবি-কবি চাউনি দেখছ না। ধরে আনলুম আজ। চুপচাপ বসেছিল, বললুম, চল ব্রাদার, হোলি সেলিব্রেট করবে, চল।'

বিজনবাবু বললেন—'আর অমনি সুড়সুড় করে চলে এল?'

'এল।' রবিদা চোখ বুজে বললেন।

পরিমলবাবু বললেন—'তোমার ব্রাদারটি অসম সাহসী। দেশ ত এই রকম বীর যুবকদেরই চায়।'

জঙ্গী অভিবাদনের ঢংয়ে ডান হাতটা উপরে তুলে রবিদা বললেন—'টু আওয়ার হোপ, আওয়ার ফিউচার।'

পকেট থেকে গন্ধভরা রুমালে-বাঁধা খানিকটা আবীর বার করে বিজনবাবু আমাকে মাখিয়ে দিলেন। আবীর বেরুল রবিদা আর

পরিমলবাবু পকেট থেকেও। মুঠো মুঠো রক্তচূর্ণ ছড়িয়ে পড়ে হাওয়ায় উড়ে, জাজিমটাকে লজ্জা দিল।

আর তখনই ওদের দু'জনকে দেখলাম। রেখা আর লেখাকে। যেমন রোগা তেমনি ফর্সা আর তেমনি লম্বা দুটি মেয়ে। চোখে সুর্মা, চুলে বেলফুল। পরনে দুটি ফিনফিনে ঢাকাই শাড়ি, কোন খুঁটটা শাড়ির, কোনটা শায়ার, ঠিক বোঝবার জো নেই।

ওরা চৌকাটে দাঁড়িয়েছিল। এ ওর গা টেপাটেপি করে হাসছিল।

বিজনবাবু আবীর হাতে ওদের দিকে এগিয়ে এলেন। পরিমলবাবু বলে উঠলেন—'হে মাধবী, দ্বিধা কেন! এই অ-চিরকুমার সভায় এস।'

ও এল না, তখনই এল না, বিজনবাবুকে আবীর-হাতে এগোতে দেখে যেন ভয়ে পিছিয়ে গেল, কিন্তু গেলও না। চৌকাটে পা ঠেকে, হয়ত ইচ্ছা করেই ঠেকে, পড়তে পড়তে সামলে নিল। কিংবা সামলাতেও পারত না, বিজনবাবুই দু'হাতে দু'জনকে ধরে ফেললেন। খানিকটা খিলখিল হাসি তুবড়ির মতো জ্বলে জ্বলে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল।

হাসি থামতে দেখি ওরাও ফরাসে এসে বসেছে, পায়ের পাতা অবধি মুড়ে নিয়ে, আঁচল সংযত করে নিয়েছে। কিন্তু সাবানে-শ্যাম্পুতে ফাঁপান চুলের ফুলগুলো এলোমেলো হয়ে গিয়েছে।

আরও খানিক আবীর তুলে ছুঁড়ে দিলেন রবিদা, ওদের চুলের বেলফুল পলকে সন্ধ্যামণি হল।

আমি দেখছিলাম। একটু একটু করে সরে এসেছিলাম দেয়ালের কাছে। জানলার তাকে একটা টেবিল ফ্যান ঘুরছে, তার উঁচু আওয়াজ নেই, যেন অনেক দূরে কোথাও জল পড়ছে, কোথাও পাতা নড়ছে, এক ঝাঁক অন্ধ মৌমাছি বাসা খুঁজে মরছে। জানলায় ছিটের পরদা কাঁপছিল, একরাশ শুকনো অসহায় পাতাকে প্রবল ধুলো-হাওয়া

হরণ করে জোর করে উড়িয়ে নিয়ে চলেছিল, জানলা খোলা পেয়ে তারা ঘরে ঢুকে পড়ল।

আমি শুনতে পেলাম, তখন আর যেন কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না, ওদের মধ্যেই কে গদগদ গলায় কী-যেন আবৃত্তি করছে। কণ্ঠস্বরের উত্থান পতন সবই নাটকীয়। খানিকটা শুনে বুঝলাম, নাটক-ই। হাতে-লেখা একখানা খাতা খুলে বিজনবাবু সকলকে পড়ে শোনাচ্ছেন। খানিকটা পড়ে খাতাটা লেখা না রেখা, মোটের ওপর ওদেরই এক জনের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন—'এই জায়গাটুকু তুমি পড়। মেয়ের পার্ট আমার গলায় মানাবে না।'

মুচকি হেসে দুটি মেয়ের একটি মিহি সুরে শুরু করল—'প্রিয়তম, প্রেয়সীরে ত্যাজিয়া বিপিনে—'

আর একটি মেয়ে কখন উঠে গিয়েছিল, যখন ফিরে এল, তখন দেখি, কাঁসার থালায় সাজান চার-পাঁচটা কাচের গ্লাস। রঙ দেখে বুঝলাম সরবত—সিদ্ধির।

তখনও ফিরে ফিরে সেই পৌরাণিক পালা পড়া চলেছে। করুণ, মৃদু, ভাবাকুল; কখনও উচ্চ, কর্কশ, গম্ভীর। ওরা মেতে উঠেছে। অর্জুন-সুভদ্রা, না দুষ্মন্ত-শকুন্তলা ঠিক ধরতে পারছিলাম না।

একটা গ্লাস নিয়ে মেয়েটি আমার সামনে এসেও দাঁড়িয়েছে। মুখে অনুরোধ করছে না, হাসছে। আমি ওর মুখের পাউডারের প্রতিটি শ্বেত রেণু, পায়ের রঞ্জিত নখের উপরে শুকনো ঘায়ের দাগ, সব স্পষ্ট দেখতে পেলাম। পেলাম খুব কড়া একটা সুগন্ধ, বোধহয় আতরের।

রবিদা কাছে এসে বললেন—'খেয়ে নে, দেখবি মেজাজ খুলে যাবে, ম্যাজ-মেজে ভাবটাও ছেড়ে যাবে।'

আমার তবু হাত কাঁপছিল। আমি ত এই পরিবেশটাকেই পান করেছি, আবার সিদ্ধি কেন।

তখনও নাটকের মহলা চলছিল। তখনও ঠিক বুঝতে পারছিলুম

না সীতা কি পাতালে গেলেন, না শকুন্তলা স্বর্গে। বিজনবাবু খাতাটা বুকের কাছে ধরে আবেগরুদ্ধ গলায় হাহাকার করছেন।

রবিদা আমাকে কানেকানে বললেন—'বোগাস, বিলকুল বোগাস। লোকটা এক লাইন লিখতে জানে না, ড্রামা সম্পর্কে কোনো আইডিয়াই নেই ওর, রোল বোঝে না, সিচুয়েশন না, শুধু চ্যাঁচাতে জানে। ভাবে ও একজন মস্ত নাট্যকার। ওই খাতাগুলো নিয়ে থিয়েটারে থিয়েটারে কম ঘোরাঘুরি করেছে? কেউ নেয়নি, কেউ ছুঁয়েও দেখেনি। আর মাল থাকলে ত নেবে? আমরা এ্যামেচার দলেও বার দুই ট্রাই করেছিলুম—ফুঃ, জমলই না। ও-সব পৌরাণিক সীতা-সতী মার্কা মাল এখন কি চলে। যুগটাই বদলে গেছে, জানলি?'

বিজনবাবু নিজের ভাবে নিজেই বিভোর, শোনাতেই এত ব্যস্ত যে কিছুই শুনতে পাননি। নৈলে হয়ত বিপত্তি ঘটত।

নিজের গ্লাসটা শেষ করলেন রবিদা। ফের নিচু গলায় বললেন—'আজকাল ওর একমাত্র কাজ দুপুরে আসা, মেয়ে দু'টোকে ওর নাটক পড়ে পড়ে শোনান। আর কেউ ত শোনে না।'

বললাম—'মেয়ে দু'টোই বা শোনে কেন?'

একটু বোধহয় নেশা হয়েছিল রবিদার, তর্জনীতে বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে ইঙ্গিতে বোঝালেন, টাকা। তারপরে চোখ বড় বড় করে বললেন—'লোভ।'

কিসের লোভ, ঠিক ধরতে পারলাম না।

খাতা বন্ধ করে বিজনবাবু রেখাকে বললেন—'এটা ডায়না থিয়েটার শীগগিরই নেবে।'

'সত্যি বিজনদা, সত্যি?'

বিজনবাবু রেখাকে বললেন—'আমি মিছে কথা বলি? মহলায় পড়ল বলে। তখন কিন্তু রেখা, তোমাকে একটা চান্স আমি পাইয়ে দেব। তুমিই হবে হিরোইন। আচ্ছা, ওই জায়গাটা আবার কর দিকিনি-'মনে যদি পড়ে নাথ—'

রেখা তোতাপাখির মতো বলল—'মনে যদি পড়ে নাথ।'

'আহা, নাথ কথাটা অত চট করে ছেড়ে দিচ্ছ কেন? একটু টেনে বল। দেখছ না, দীর্ঘস্বর?'

লেখা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল—'বিজনদা, শুধু দিদিকেই বুঝি চান্স দেবেন? আমি পাব না?'

বিজনদার আশ্বাসের হাত দরাজ, মাথা নেড়ে নেড়ে বললেন—'পাবে, তুমিও পাবে।'

পানের পিক ফেলবেন, এই ছুতোয় রবিদা বাইরে এলেন। আমাকেও ইশারায় ডাকলেন। এবার একটু গলা চড়িয়েই বললেন—'বোগাস, সব বোগাস। লোকটা মহা চালিয়াত, মিথ্যুক, লায়ার। ওর বই নেবে ডায়না থিয়েটার? কত বড়ো বড়ো লেখক সেখানে ধন্না দিয়ে পড়ে আছে, বিজনটা ত খলসে মাছ।' তাতেও জোর হল না ভেবে বললেন—'পুঁটি। বিজনটা পুঁটি।'

'মেয়ে দুটো বিশ্বাস করছে রবিদা?'

'না করে উপায়? আরে, ওদের ডিসকভার করেছিলুম আমি। য়্যামেচার ক্লাবগুলোর সঙ্গে সেই যে ভিড়িয়ে দিয়েছিলুম, তাই ভাঙিয়েই ত এখনও তবু মাঝে মাঝে দু-দশ টাকা আসছে। বিজনটা কী করেছে ওদের জন্যে, কী করতে পেরেছে, এ্যা?'

রবিদা আমাকেই জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন। আসলে টলছিলেন, ওঁর মাথা ঘুরছিল বোধ হয়, একটু নেশা হয়েছিল। বললেন—'নাথিং, এ্যাবসলিউটলি নাথিং। ওদের ভবিষ্যৎ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওদের পাখা গজাবে, সেই পাখা তারপর পুড়বে, ওরা পুড়বে।'

'পুড়বে, ওরা পুড়বে।' রবিদা আরও একটু আবেগ মিশিয়ে আবার বললেন। কথটা জোরে বলতে পারলেন বলেই রবিদার উত্তেজনা কমে গেল। নরম, ভাবাকুল হলেন। খানিকটা আপন মনেই বললেন—'ওদের দোষ নেই, আমি জানি। য়্যামেচার ক্লাবে নিয়মিত আয় নেই, নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। মেয়ে দুটো তাই এমন কিছু

চায় যার ওপর ভরসা রাখা চলে। বাঁধা, পাকা স্টেজে পাকা বাঁধা মাইনের চাকরি চায়। কেউ যদি—' বলতে বলতে চোখ ছোট করে রবিদা আমার দিকে চাইলেন—'ধর, তুই-ই যদি ওদের একজনকে বিয়ে করবি বলে কথা দিস, ওরা তবে তোর দিকেই ঝুকবে। ওরা, মেয়েরা, এ-সব হল্লা চায় না রে, শান্তি চায়। আমি ওদের জানি।'

সিদ্ধি খেলে শুনেছিলুম, কাউকে হাসিতে পায়, কাউকে গানে। কেউ বা কাঁদে। রবিদাকে হয়ত বক্তৃতায় পেয়েছিল; তিনি আবার বললেন,—'আমি জানি। সারারাত না ঘুমিয়ে প্লে করে সকালে বাসায় ফিরে আসে মেয়ে দুটো, তখনও ওই লোকটা একটু ঘুমুতে দেয় না সারা দুপুর জ্বালাতন করে। আবার নাটক আনে, শোনায়, পড়ায় মুখ বুজে এরা সে-সব সহ্য করে, কিসের লোভে? আমি জানি আমি জানি।'

ওই দুটি মেয়ের প্রতি মমতা, আর বিজনবাবুকে ঈর্ষা রৌদ্র-ছায়ার মতো রবিদার মুখে খেলে যাচ্ছিল।

ঘরে ফিরে রবিদা বললেন—'এবার একটা গান হোক।'

সঙ্গে সঙ্গে টের পেলুম, আবহাওয়াটা আবার সজীব হয়ে উঠেছে। পরিমলবাবুও এক কোণে বসেছিলেন, কতকটা বিমর্ষভাবে। তিনি পকেট থেকে আবার এক মুঠো রঙ বার করে ছড়িয়ে দিলেন। রেখা আর লেখা চোখ ঢাকল, ওদের বেণী দুটো শীতে-নির্জীব সাপের মতো পিঠের ওপর নেতিয়ে পড়ল।

রবিদার কথায় সায় দিয়ে পরিমলবাবু বললেন—'হোক, গান হোক।'

বিজনবাবু একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করে বললেন—'ওদের গলা আজ খারাপ যে।'

রবিদা জনান্তিকে আমাকে শোনালেন—'পার্ট করবার সময় গলা ঠিক থাকে।'

লেখার কানে কথাটা গিয়ে থাকবে। বলল—'সত্যি বলছি রবিদা, গলাটা আজ বসা-বসা। কাল মেঝেয় শুয়েছিলুম, ঠাণ্ডা লেগেছে।'

রবিদা তখন অসমসাহসিক কাজ করলেন। কোন্‌খানটা বসেছে দেখি—বলে ঝুঁকে পড়লেন রেখার দিকে, ওর গলার দুটি কণ্ঠার ঠিক মাঝের জায়গাটুকুতে আঙুল বুলিয়ে সুড়সুড়ি দিলেন।

রেখা খিলখিল করে হেসে লুটিয়ে পড়ল লেখার কোলে। লেখা উপুড় হয়ে পড়ল রেখার পিঠে।

হাসি সামলে রেখা বলল—'সত্যি বলছি রবিদা, গান আজ হবে না।'

'হবে না।' মাথা নেড়ে বিজনবাবু বললেন—'আমি বলছি হবে না। আজ শুধু প্লে হবে।'

রবিদার মুখ থমথম করছিল। পকেট থেকে দুটো দশটাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—'যাও ত পরিমলবাবু, নিচের দোকান থেকে কিছু গরম কচুরি, সন্দেশ আর জিলিপি নিয়ে এস। মিষ্টি না হলে কি বাবা নেশা জমে? আর, সামনের দোকানে পাবে চিংড়ির কাটলেট।'

ওই পরদা টানা ঘরে বসেই বুঝতে পারছিলাম, বেলা পড়ে এসেছে। চৈত্রের বিকেল, মাঝে মাঝে হাওয়াটা খেপে উঠছে, শুকনো ধুলোয় মাখামাখি হয়ে ফরাসেই শুতে চায়। শুধু খ্যাপা নয়, মাতালও। একটা মৃদু গন্ধও নিয়ে এসেছে, যেন বকুল ফুলের। কোথায় গাছটা, দেখতে পাচ্ছি না, জানলার বাইরে, তিনটে ছাতের পারে রক্তাক্ত একটা কৃষ্ণচূড়া, কিংবা রক্ত নয়, সেও আবীর মেখে থাকবে। কিন্তু বকুল-গন্ধের উৎসটাও আশে-পাশেই কোথাও নিশ্চয় আছে।

ঠোঙায় মিষ্টি এল, কচুরী এল, প্লেটে কাটলেট। পরিমলবাবু ফেরত নোট ফরাসেই রাখলেন।—'চিংড়ি নেই, ফাউল এনেছি।'

রবিদা চেঞ্জ গুণলেন না, পকেটে পুরে বললেন—'এবার গান হবে, আলবত হবে।'

পলকে যেন চেহারাটাই বদলে গিয়েছে রবিদার, পকেটের ওই নোট আর সামনে-ছড়ান খাবার ওঁকে আত্মপ্রত্যয় এনে দিয়েছে। বিজনবাবুর চোখে চোখ রেখে দৃঢ় গলায় বললেন—'আলবত গান হবে। আমি খাবার আনালুম। আমার হকের গান আমি শুনব।'

বিজনবাবুর মুখের পেশি কঠিন হয়ে উঠেছিল। দু'হাত মুঠিবদ্ধ করে বললেন—'হক আমারও আছে। আজকের এই ফরাস আর টেবিল ফ্যানটা কে ভাড়া করে এনেছে?'

রবিদা যেন একটু থতমত খেয়ে বললেন—'ফরাস ডেকরেটর কালই তুলে নিয়ে যাবে। ওরা গরমে পচবে। ঠাণ্ডা মেঝেয় শোবে।'

'আর ওই—ওই কাটলেট, ওগুলোই বুঝি বরাবর থাকবে ভেবেছ?' বিদ্রূপের ভঙ্গিতে করতালি দিয়ে বলে উঠলেন বিজনবাবু—'ওগুলো হজম হবে না? ওদের আর কোনোদিন খিদে পাবে না?'

নিরীহ পরিমলবাবু একপাশে বসে ঘামছিলেন, রুমালে মুছছিলেন মুখ, আর কাটলেট কামড়ে কামড়ে শেষ করে ফরাসেই হাড় ছড়িয়ে ফেলছিলেন। একটা কচুরী লেখার মুখের কাছে ধরে দেখলুম সাধাসাধি করছেন। লেখা মুখ বেঁকিয়েই ছিল।

পরিমলবাবু হঠাৎ যেন টের পেলেন পরিস্থিতি ঘোরাল হয়ে উঠছে, কুণ্ঠিত-কণ্ঠে বললেন—'বেশ, গান যদি না হয়, তবে নাচ হোক। লেখা নাচবে।'

জোরে জোরে মাথা নেড়ে লেখা বলল—'নাচ আমি ত জানি না।'

রেখা ভয় পেয়ে বসেছিল একটু দূরে, বলে উঠল—'এই। জানিস না? আলিবাবাতে সেবার আধঘণ্টা ধরে নাচল কে?'

লেখা আস্তে আস্তে বলল—দিদি তুই কিছু বুঝিস না। মার জ্বর হয়েছে না? ওঘরে চুপ করে শুয়ে আছেন। নাচানাচি করলে মার মাথাধরা বেড়ে যাবে না?'

'অতএব গান হোক।' গর্জন করে বলে উঠলেন রবিদা, বশম্বদ পরিমলবাবু কোথা থেকে একটা হারমোনিয়ম টেনে আনলেন।

আমি সে গান শুনিনি। আমার মাথা ঘুরছিল আমার ঘুম পেয়েছিল। আমি মেঘের স্তরে স্তরে উড়ছিলাম। ঢেউয়ের ঝাপটা খেয়ে আমি তলিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার নেশা হয়েছিল।

ঘুম ভেঙে উঠে দেখি, রাত। কত রাত কে জানে। জানলার পরদায় জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নায় বকুল ফুলের পুরানো গন্ধটা আরও যেন কড়া হয়ে উঠেছে।

ঘরে বিজনদা নেই, পরিমলবাবুও না। সারা ফরাসে আবীর, থেঁতলান ফুল আর কাটলেটের কাঁটা ছড়ান। এত ফুর্তিকে সজাগ দেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সে-সব নিমেষে কি উবে গেল নাকি?

না। তখনও গান চলছিল! পা টিপে টিপে বাইরে গিয়ে দেখি, বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে রেখা আর রবিদা বসে। রেখা গান গাইছে।

সেখানে জ্যোৎস্নার আলো, অস্পষ্ট, তবু রেখার মুখখানা, মনে হল, যেন বড়ো ছোট যেন একেবারে এতটুকু। খোঁপায় একটি ফুলও নেই। চোখের মণির কালো এখন চোখের কোলের কালি। রেখা গান গাইছে, আর ঢুলছে, আবার গান গাইছে। গলা ভাঙা, বসে-যাওয়া, চড়ায় উঠলে চেরা-চেরা।

বুঝতে পারছিলুম, আর গাইতে পারছে না! একবার হাই তুলল রেখা, তুলল তো তুললই, মুখের হাঁ আর বোজে না, বুঝলুম, হাইটাই ওর দম! ওই ছুতোয় ও যতটা পারে দম নিচ্ছে। হাইটাকে আঁকড়ে ধরে, যতক্ষণ পারে গান থেকে ছুটি নিতে চায়।

কেননা, রবিদা ওকে ছুটি দেবেন না, তিনি খাবার আনিয়েছেন, গান শুনবেন বলে। ফরাসে ছড়ান হাড়গুলো তাঁর উদারতার সাক্ষী। পেট ভরে খেয়েছে, কাঁটা চুষেছে, এখন গান গাইতে হবে।

গাইতে হবে কেন, গাইছে। এই কয়েক ঘণ্টায় ক'খানা গান

গেয়েছে রেখা, কে জানে। হয়ত পাঁচটা, হয়ত দশটা, পনেরটা, বিশটা। আরও গাইছে।

'এবার ঠুংরি হোক।'

'ঠুংরি গাইলুম ত একবার।'

'আবার গাও। এন্‌কোর।' রবিদাকে বলতে শুনলুম—'রেখা, তোমার গান গাইতে ভাল লাগে না? পার্ট করতে ত বেশ ভালো লাগে।'

ক্লান্ত, করুণ করুণ চোখ তুলে রেখা চাইল—'বিজনবাবু জোর করে পার্ট করান যে।' একটু থেমে বলল—'গান গাইতে ভালো লাগে,—লাগত যখন শখ করে শিখেছিলাম, শখ করে গাইতাম। আর এখন—'

অত্যন্ত মৃদু একটা শব্দ হল, সেটা হাই না দীর্ঘশ্বাস, ধরতে পারলুম না। রেখা বোধহয় বলতে চেয়েছিল, গান এখন পেশা। নেশার জিনিষ বিষ হয়েছে।

ফরমাস চলল, ঠুংরির পর গজল, গজল শেষ হলে কীর্তন, কীর্তনের পর ভাটিয়ালী। রবিদা ওকে থামতে দিলেন না, তুষার-প্রান্তরে একটি নিরাবরণ মেয়েকে যেন চাবুক হাতে তাড়া করে ফিরলেন।

হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে রেখা আর্তনাদ করে উঠল—'পারছি না রবিদা, আমি আর গাইতে পারছি না। খুব ঘুম পেয়েছে, সত্যি।'

বলেই হারমোনিয়াম খোলা রেখে তার ডালার ওপরেই মাথাটা কাত করে দিল।

সেই মুহূর্তেই রবিদা ওকে একটা চিমটি কাটলেন। রেখা চমকে উঠল, চেঁচিয়ে উঠল, রবিদার নিষ্পলক চোখে যেন মৃত্যু দেখে ভয়ে চুপ করল। আবার টিপে ধরল হারমোনিয়ামের বেলো—ভীত, ভাঙা কর্কশ গলায় সুর তুলল। ফের ঠুংরি, ফের গজল।

আমি টলতে টলতে ঘরে ফিরে আবার শুয়ে পড়লুম।

* * * *

রিক্সায় করে রবিদার সঙ্গে ফিরছিলুম। ওপর দিকে চেয়ে বাড়ীটাকে সেদিন মনে হয়েছিল মাঝ-বয়সী মেয়ের বুক। মাঝবয়সী মেয়ের স্তনের মতোই বিবর্ণ বড় চাঁদটা পশ্চিমে হেলে পড়েছে। অনেক দূরে ক্যানেস্তারা পিটে পিটে কারা তখনও "হোলি হায়" করছে।

'আজকে আমাদের ওখানে চল'—রবিদা বললেন—'বাকী রাতটা ঘুমিয়ে নিয়ে কাল সকালে বাড়ি যাস। বানিয়ে যা হয় কিছু বলিস. নইলে বকুনি খাবি।'

কিছু বললাম না।

রবিদা আস্তে আস্তে বললেন—'কী-রে, কেমন লাগল?'

সংক্ষেপে বললাম—'ভালো।'

খুশী হয়ে রবিদা বললেন—'লাগবেই ত। আরে, এই হল আসল মজা।'

তারপরেও যেটুকু, রবিদা নিজেই বলে গেলেন। 'বিজন বাঁদরটা মাঝে তাল কেটে দিয়েছিল, নইলে দেখতিস, আরও জমত। খুব জব্দ করেছি ওটাকে। তুই ত ঘুমিয়ে পড়লি, শেষে ও রাগ করে লেখা মেয়েটাকে নিয়েই বেরিয়ে পড়ল। আমি বাবা ঘাঁটি ছাড়িনি, কোট ছাড়িনি। কড়ায় ক্রান্তিতে সব উশুল করে নিলুম।'

নিজের সাফল্যের কথা স্মরণ করেই যেন হেসে উঠে রবিদা আবার বললেন—'মেয়েটাও কম শয়তান নয়। কী করেছিল জানিস, দুটো সন্দেশ হাতে করে একবার সরে পড়ছিল। আমি ওর হাত চেপে ধরে বললুম—উঁহুঁ, যা খাবে, এখানে বসে খেয়ে যাও। খেতে হল। দুটো সন্দেশই। খানিক পরে আমাকে একটু অন্যমনস্ক যেই দেখেছে অমনি দেখি আবার দুটো সন্দেশ আঁচলের তলায় লুকিয়েছে। মাথার ঠিক ছিল না ত, বললুম—চোর। একটা হালকা চড়ও কসিয়ে দিলুম। তখন কী বললে জানিস?'

আমি জানব বলেই রবিদার মুখের দিকে তাকালুম।

'বললে, আমার মা ত কাটলেট ছোঁয় না, মার জন্য নিয়ে যাচ্ছি।'

'মা—র—জ—ন্যে—নি—য়ে—যা—চ্ছি।' রবিদা দ্বিতীয়বার টেনে টেনে কথাটাকে উচ্চারণ করলেন, যেন বিদ্রূপ করতেই।

—বললেন—'আরে, আমার সঙ্গে চালাকি! বিজন ত লেখার সঙ্গে কেটে পড়ল, আমিও চলে আসছি, সিঁড়ি দিয়ে দু'ধাপ নেমেছি-ও। রেখা করল কী জানিস? পিছন থেকে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'ও রবিদা আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে অন্তত পাঁচটা টাকা দিয়ে যান।' পাঁচ টাকা? আজ সারা বিকেল যেখানে নোটের পর পর নোট উড়েছে, সেখানে মোটে পাঁচটা টাকা? হাঁড়ির খবর রাখি ত, বুঝলুম ব্যাপারটা। আজ না হয় কাটলেট খেয়ে পেট ভরেছিস, কাল খাবি কী। বাবা, ডাল-ভাত ত চাই। পাঁচটা টাকা পেলে, তবে ও রেশনের দোকানে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে। ঝোপ বুঝে আমিও কোপ বসালুম।'

শিস দিলেন রবিদা, সুর ভেঁজে ভেঁজে যেন নিষ্ঠুর সেই সুখের স্বাদটা ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। শেষে বললেন—'আমি বললুম, বেশ, টাকা নাও। ছুঁড়ে দিলুম, একখানা নোট। মুখের ওপর। বললুম, কিন্তু গান গেয়ে শোনাতে হবে। শোনাতে ওকে হলও। একটা নয়, দুটো নয়, গুণে গুণে বিশটা। কম ঘুঘু নই ত, কড়ায় ক্রান্তিতে টাকাটা উশুল করে নিয়েছি। ওসব মেয়ে কী টাইপের, জানতে আমার বাকী নেই। সব কুত্তীর দাওয়াই জানি।'

একটা তুড়ি দিলেন রবিদা, ইঙ্গিত পেয়ে রিক্সা ওর বাসার দরজায় থামল।

/বিকেল বেলা

শার্ট পরলুম, ঝুলটাকে ঠেলে দিলুম ট্রাউজারের নীচে, মনযোগ দিয়ে সব ক'টা বোতাম আঁটলুম। এখন টাই পরছি, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। আঁটুনি বজ্র হবে, কিন্তু গেরোটা ফসকা। নটটা মনমতো হচ্ছে না, অল্প অল্প ঘামছি। আমি ঘামছি আর রমা হাসছে। রমা আমার পিছনেই দাঁড়িয়ে। এক্ষুনি বেরব শুনে তাড়াতাড়ি কফি করে এনেছে। হাত বাড়িয়ে ওর হাত থেকে পেয়ালা নিলুম, চুমুক দিতে জিভ পুড়ল, ওর হাতে কাপটা ফিরিয়ে দিলুম। রমার হাসির সঙ্গে এবার ধমক মিশল। বলল, 'এত তাড়াতাড়ি করছ কেন?' ওর কথার জবাব না দিয়ে জানলার বাইরে তাকালুম। বেলা ফুরিয়ে এসেছে। অনেক দিন ধরে জলে ভেজা, রঙ-জ্বলা কাটা ঘুড়ির মত ফ্যাকাশে সূর্য এখনও রেন-ট্রি গাছটার মগডালে লটকে আছে। হাওয়ায় কাঁপছে, এখনই ডুববে। রমার দিকে ফিরে বললুম, অর্থাৎ বলতে চাইলুম, কেননা আমার স্বর আমার কানেই গেল না, তাড়াতাড়ি বেরতে হবে। দেখছ না, সন্ধে হয়ে এল? কথাটা আমিই যখন শুনতে পাইনি, তখন রমাও অবশ্য পায়নি, কিন্তু আমার ঠোঁট নড়া থেকেই সে শব্দ ক-টাকে চিনে ফেলে থাকবে, তাকে বলতে শুনলুম, দেখছি। রমা তখনও হাসছিল, অনেক দূরে কয়েকটা জারজ পথ-কুকুর ডাকছিল থেকে থেকে, শেষ শীতের হাওয়া দিচ্ছিল। রমা কী দেখছিল, রমা কেন হাসছিল? কিন্তু সব কেন নিয়ে নষ্ট করবার মতো সময় হাতে নেই; রমাকে বললুম আলো জ্বেলে দিতে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্রাশ হাতে তুলে নিলুম। মাথায় ছোঁয়াতে যাব, তখন দেখতে পেলুম আমিও। কপালের রগটার পাশে আরও তিন চারটে পাকা চুল। ব্রাশ

নামিয়ে টেবিলের টানা ধরে টানলুম। রমা তখনও হাসছিল, শব্দ করে নয়, ঠোঁট টিপেও নয়, শুধু চোখ দিয়ে। বলল, 'কী খুঁজছ?' বললুম, 'শনটা।' আমার গলা এমন বিশ্রীভাবে ভাঙল কখন? রমাকে এগিয়ে আসতে দেখছি। শোবার ঘর, তাই ওর পায়ে চটি নেই, তাই শব্দ হল না। আমি একটু থতমত খেলুম, ভয় পেলুম। রমা এগিয়ে আসছে কেন, ওর মুখে কথা নেই কেন, ও হাত বাড়িয়েছে কেন? হাত বাড়িয়ে রমা আমার মাথা একটু নীচের দিকে টানল। কী চায়, কী করবে! আদর?—সে সবের পালা কবেই ত ফুরিয়েছে। আমার থুতনিতে রমার একটা হাত, আমার গা শিরশির করছে। সুখে নয়, অস্বস্তিতে। পাকা শিকারী যেমন নির্ভুল নিরিখ করে ট্রিগার টেপে, রমা ঠিক সেইভাবে ওর ডগা-খাওয়া আঙুল দিয়ে পাকা চুল তিনটেই তুলে আনল। আমাকে দেখিয়ে বলল, 'এই নিয়ে এই এক সপ্তাহেই বোধহয় গোটা তিরিশেক হ'ল। আর তুল না। থাক না। বেশ ত লাগছে দেখতে। এক দিকে পাকা চুল অন্য দিকে টাক, একসঙ্গে কতদিক সামলাবে তুমি।' হয়ত রমা এত কথা বলল না, আমি ওর মনের কথাটাই শুনতে পেলুম। বাইরে পা বাড়াচ্ছি, রমা আবার বলল, 'অফিস থেকে এসেই বেরচ্ছ, আর কিছু খেয়ে নিলে হত না?' পাছে আরও দেরি হয়ে যায়, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি হাত তুলে বলে উঠলুম, 'না! অফিসেই টিফিন খেয়ে নিয়েছিলুম। এখনও ত অফিসের কাজেই যাচ্ছি। জরুরী কনফারেন্সে যাচ্ছি।' রমা এ কথাটার ওপর কোনো মন্তব্য করল না। আমি ওর মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে চাইলাম। কোনো ভাবান্তর নেই। রমা কি জানে, জরুরী কনফারেন্সের কথাটা মিথ্যা? রমা কি জানে, আমি কোথায় যাই? যাচাই করবার অবসর ছিল না। এমনিতেই দেরি হয়ে গিয়েছে। দরজা বন্ধ করে দিতে বাইরে এসে রমা অস্ফুট গলায় একবার শুধু বলল, 'মাফলারটা নিলে ভাল করতে। আজকাল তোমার ত একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে।'

সিগারেটের ধোঁয়া আর ওর কথাটা একই সঙ্গে উড়িয়ে দিয়ে বললুম, 'আরে দূর দূর, আমার শরীর দিব্যি মজবুত আছে।'

রাস্তায় যখন পা দিলুম, তখনও কনকনে হাওয়া বইছিল, দূরের কুকুরগুলো বিশ্রী গলায় ডাকছিল।

*　　　*　　　*

আমার জন্যে ওরা বসে থাকেনি, খেলা শুরু করে দিয়েছে। হাতঘড়ি দেখলুম। কই এমন কিছু দেরি ত হয় নি—ছটা বেজে এখন চল্লিশ মিনিট মোটে। সুমিতার সময় কি কাঁটায় কাঁটায় চলে? খানিক চলে, খানিক উঠে, সিঁড়ির ধাপে একটুখানি জিরয় না, দম নেয় না? সময়ের নিজের কি কখনও দম ফুরয় না? ব্যাডমিণ্টন কোর্টটা আলোয় উদ্ভাসিত—গোটা কয়েক চড়া বালব জ্বলছে। সূর্যের কোটিতম কণা দিয়ে কি ওদের শরীর তৈরি? সুমিতা আমাকে একবার দেখল। বোধহয় একবার হাসল। একবারই। সুমিতা এখন খেলছে। সুমিতা আর তাকাল না। সুমিতা আর হাসল না। সুমিতা গোটা কোর্টে ছুটোছুটি করছে। সুমিতার কপালে ঘাম—ফোঁটা ফোঁটা ফোঁটা—টায়রার মত সাজান। আমি লনে বসে আছি। এখানে অন্ধকার। আমার মাথায় ফোঁটা ফোঁটা হিম পড়ছে। এখানেও থেকে থেকে কুকুরের ডাক শুনছি! তবে বোধ হয় বিলিতী কুকুর। অভিজাত পাড়া কিনা। অল্প অল্প মাথা ধরেছে যেন। হাঁটু কনকন করছে। মাফলার আনলে হত। রমা আনতে বলেছিল। সুমিতা এদিকেই আসছে। ধপ করে আমার পাশের চেয়ারেই বসে পড়ল। সুপ্রিয় এল পিছে পিছে। সুমিতা কপালের ঘাম মুছছে। ওর দিকে ঠাণ্ডা এক গ্লাস সরবত এগিয়ে দিলাম। বললাম, 'তুমি বোধ হয় ক্লান্ত?' সরবতে চুমুক দিতে দিতে সুমিতা আমার দিকে চুরি করে চাইল, বলল, 'না, মোটে ত এক সেট খেলেছি। এখুনি ক্লান্ত হব কী! আরও দু' চার গেম খেলতে উঠলুম বলে।' আমি কোনো মন্তব্য করলুম না। বুকের

ভিতরটা দুরদুর করছিল। জানি না, সুমিতা আমাকে পার্টনার হতে ডাকবে কি না। ডাকতে পারে কিন্তু। সুপ্রিয় একবার পার্টনার হয়েছে। এবার আমার পালা। কিন্তু যদি ডাকে, আমি কী করব? আমার যে হাঁটু কনকন করছে। কাঁধের কাছটাও কেমন ব্যথাব্যথা, ছুটোছুটি করা কি আমার সাজে!

সরবতের শূন্য গ্লাসটা আমার হাতে তুলে দিয়ে সুমিতা উঠে দাঁড়াল। আঁচলটা আঁটসাট করে বেঁধে নিল কোমরে। ফের খেলতে যাবে। আমিও কি উঠব, আমিও খেলব? খেলব যদি সুমিতা আমাকে গ্লাস ধরতে দিল কেন। আমি এখন গ্লাস রাখি, না র‍্যাকেট তুলি! কই, সুমিতা যে চলে যাচ্ছে, আমাকে ডাকল না ত। আমিই এগিয়ে গেলুম। পা টনটন করছিল, তবু যত তাড়াতাড়ি পারি, ওর পথ আগলে দাঁড়ালুম। বিদ্রোহীর মতো নয়, প্রার্থীর মতো। অত্যন্ত মৃদু, অত্যন্ত কুণ্ঠিত স্বরে বললুম, 'সুমিতা, আমি খেলব না?' সুমিতা আমাকে পা থেকে মাথা অবধি একবার দেখে নিল। তারপর যেন পাশ কাটিয়ে ফের এগিয়ে যেতে চাইল। ওর কথা আমি শুনতে পেয়েছি। 'তুমি—তুমি কী খেলবে! থেকে থেকে কাশছ, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছ না, কোমরের কাছটা বাঁকা, নাক ঝাড়তে বারবার পকেট থেকে রুমাল বের করছ—এই নিয়ে বোধহয় পাঁচবার হল। তুমি কি আজ খেলতে পারবে? মোটেও যে দৌড়তে পার না তুমি—এ-বয়সে তোমার একদম দম নেই, তোমাকে পার্টনার নিলেই আমি হারি।' সুমিতা শুধু দৃষ্টি দিয়ে এত কথা বলল। দৃপ্ত উদ্ধত ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল।

আমি বসে রইলুম। অক্ষম ঈর্ষাতুর চোখে ওর আর সুপ্রিয়র খেলা দেখলুম। হিম পড়ছিল, আমি থেকে থেকে কাশছিলুম, আমার মাথা ধরেছিল, ভয় পেয়েছিলুম, ফুলে ফুলে-ওঠা কপালের রগ ছিঁড়ে ফেটে না পড়ে।

দরজা কে খুলে দিয়েছিল তা ত মনে নেই। বোধহয় রমা। রমা ট্যাক্সির শব্দ শুনে থাকবে। ট্যাক্সি-ভাড়া কে মিটিয়ে দিল? বোধহয় আমি। আমার কিছু মনে নেই। রমা কি আমার জন্য বসে ছিল? জেগে ছিল? আমি জানি না। আমি রমাকে দেখিনি, দেখতে পাইনি। আমার চোখ ঘোলাটে ছিল। আমার পা কাঁপছিল। গলায় প্রবল পিপাসা, মাথায় যন্ত্রণা—আমার হঠাৎ জ্বর হল কেন! বিছানায় শুয়েছি—তাও নিজের অজ্ঞাতসারে। কিংবা রমাই হয়ত শুইয়ে দিয়ে থাকবে। তারপর কী হল? আমি কি পিপাসার যন্ত্রণায় সারারাত এ-পাশ ও-পাশ করলুম? অথবা ঘুমিয়ে পড়েছিলুম? কী জানি।

আমি হয়ত সারারাত ভুল বকেও থাকতে পারি। রমা তখন কী করেছে—ও কি সমস্ত সময় আমার শিয়রে জেগে বসে ছিল? ও কি আমার কপালে জলপটি দিয়েছিল? প্রলাপে যা-যা বলেছি, ও কি ঠায় বসে সব শুনেছে? জেগে উঠে দেখছি, এখন সকাল। ভোরের প্রথম রোদ্দুর তার স্নিগ্ধ হাত আমার কপালে রেখেছে। সেই আলোয় রমার মমতামাখা মুখ দেখছি। কিন্তু আমার মুখ ত দেখতে পাচ্ছি না। আমি আমাকে দেখব। রমাকে ইশারা করে ডাকলুম। আয়নাটা এনে দাও—গলা চিরে এই কথা ক-টি ফুটে থাকবে। রমা বুঝল। আয়না এনে আমার হাতে দিল। আমি এখন আমাকে দেখছি। বিয়াল্লিশ বছরের পাকা, পুরনো একটি মুখকে। দেখছি নিষ্প্রভ দুটি চোখ। চিবুকে বয়সের থলথলে ভাঁজ। চোখের কোণে কাকের থাবার মতো অনেক—অনেক রেখা। এক দিনের বাসী দাড়ি—কর্কশ, অমসৃণ। আর—আর কী? আর পাতলা-হয়ে-আসা এলোমেলো চুলের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটা রুপোলী সুতো। এক রাতে এত চুল সাদা হয়ে গেল? মুখের ভিতরটা বিশ্রী, তেতো লাগছে। উঠে বসেছি। আয়নাটাকে ঠেস দিয়ে বালিশে। আমার হাত কাঁপছে, তবু পারব—সাদা চুল ক-টাকে—

যারা আমার তারুণ্যকে বরফের গুঁড়োয় ঢেকে দিয়েছে—উপড়ে আনতে পারবই। পারলুম না ত, ফসকে গেল। সাদা চুল কটা নড়ে উঠল, যত ধরতে যাই, ততই যে সরে সরে যায়। এবার শক্ত মুঠোয় একটাকে চেপে ধরতে গেলুম! ওই পাকা চুলটাই সবচেয় প্রকট, সবচেয়ে নির্লজ্জ। ধরা দিল না, মাথা নেড়ে আবার সরে গেল। আমার কম্পিত আঙুল ওর আপত্তিটা টের পেয়েছে। ও কী বলছে, আমি তাও শুনতে পেয়েছি। বলছে, তুল না, আমাদের তুল না। এখন আমাদের এত অপছন্দ, কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখ একটি কাঁচা চুলেরও যেদিন দেখা পাবে না, সেদিন আমরাই থাকব।

হাত সরিয়ে নিয়েছি। আয়নাটা ফিরিয়ে দিয়েছি রমাকে। রমা স্থির, স্নিগ্ধ আয়ত চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। আমার শিয়রে বসেছে। ওর শীতল করতলের নীচে পাকা চুলটা এখন চুপ করে আছে। রমাও থাকবে।

হেঁয়ালি

শেষ মিষ্টিটা পাত থেকে তুলে নিয়েই নিশীথের মনে হল তার ঘুম পেয়েছে। হাই তুলল, সেই হাই ঢাকতে হাত তুলল মুখের সামনে। ঢেঁকুরও উঠছিল, সেটা চাপল আর দু-ঢোঁক জল খেয়ে। নাঃ, আজ খাওয়াটা বড়োই বেশী হয়ে গিয়েছে। চোখের পাতা ভারী, ঘুম পেয়েছে, এদিকে গায়ের জামাও ভিজে শপশপে। বাসায় ফিরে চৌবাচ্চায় জল পাই তো, মাথায় ঢেলে শুতে যাব।

রেকাব থেকে পান তুলেই নিশীথ সরে পড়ছিল, অন্য সকলে যখন নতুন বউ দেখবে বলে দরজায় ভিড় করেছে, সেই অবসরে। তার সামান্য উপহার, প্যাকে-মোড়া বই, সে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিল। পান চিবুতে গিয়ে ফোঁটাকয়েক কষ পড়ল জামার আস্তিনে। আহা, একটু লেবু পাই তো, বেশ হয়, লেবুর রসে শুনেছি দাগ যায়। নইলে কাল অফিসে যাবার সময় আবার নতুন জামার দরকার হবে। কাল সকালে লণ্ড্রী খোলা পেলে হয়।

ঘুম পেয়েছিল, পানের ছোপ-লাগা আস্তিনটার জন্য মন খুঁতখুঁত করছিল, কোঁচা তুলে সাবধানে পা বাড়িয়ে নিশীথ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিল। কোমরে আঁচল-জড়ানো ব্যস্ত যে-মেয়েটি তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিল, তাকে সে দেখতে পায়নি। দেখতে যখন পেল, তখন সসঙ্কোচে সিঁড়ির ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। চিনতে পারেনি। চশমার কাচ বোধহয় ঝাপসা ছিল।

চিনল লীলাই, চাপা-সহর্ষ গলায় বলে উঠল, 'নিশীথ-দা! বা-রে, এসে দেখা না করেই যে পালাচ্ছেন বড়ো?'

নিশীথ তখনও আড়ষ্ট, বলতে গেল, 'ঘুম পেয়েছে', কিন্তু কথাটা ছেলেমানুষি শোনাবে ভেবে বলে বসল, 'লীলা লেবু আছে?' প্রশ্নটা আরও হাস্যকর শোনাল।

'লেবু?' লীলা বিস্মিত হয়ে তাকাল চোখ তুলে।

মূক নাটকের অভিনেতার মতো নিশীথ তখন আঙুল দিয়ে ওর জামার আস্তিনের ছোপ-ধরা জায়গাটা দেখিয়ে দিল।

লীলা বুঝল। হেসে বলল, 'আসুন, ওপরে আসুন।'

অগত্যা নিশীথকেও লীলার পিছন-পিছন ওপরে উঠতে হল। ছিপছিপে যে মেয়েটি তরতর করে সিঁড়ি ভাঙে, তার সঙ্গে সে পাল্লা দিয়ে পারবে কেন। আট-দশটা সিঁড়ি ভাঙতেই নিশীথের হাঁপ ধরে গিয়েছিল। একটু বিরক্ত সে হয়েছিল, নিজের উপরে, কিংবা লীলার উপরেও।

ও বুঝছে না কেন, আমি ক্লান্ত, আমার চোখের পাতা ভারী, আমার ঘুম পেয়েছে? মনে মনে বকছিল লীলাকে, ফাঁকে ফাঁকে নিজেকেও। জামায় দাগ লেগেছিল, আমি কেন এই সামান্য ব্যাপারটা ওকে বলতে গেলুম। এখন কে জানে, লেবু খুঁজে পেতে কত দেরী হবে, না জানি, এক-শরীর অবসাদ আর এক-চোখ ঘুম নিয়ে এখানে আরও কতক্ষণ আটকে থাকব, ওরা সবাই চলে যাবে, আমি যাব না, ওরা ট্রাম পাবে, আমি পাব না, আমাকে হয়ত রিকশা নিতে হবে, ছয় আনা। অন্যমনস্কভাবে পকেটে হাত চালিয়ে নিশীথ খুচরো পয়সাগুলো নাড়াচাড়া করল।

লীলা ওকে নিয়ে গেল বারান্দার এক কোণে, ওখানে নির্জন একটা কল আছে। এখানে কম পাওয়ারের একটা আলো জ্বলছে, চড়া বাল্‌ব দেয়নি কেন, তা ওরাই জানে। একটা সিঁড়ি সোজা উঠে গিয়েছে ছাদের দিকে। নিশীথ হাত পাতল কলের নীচে, আস্তিনটা টান টান করে ধরে লেবু নিংড়ে লীলা ছড়িয়ে দিল রস, আর তখনই নিশীথ ওর খোঁপায় গোঁজা বেলফুলের মালার গন্ধ পেল।

এই গন্ধ এতক্ষণ পায়নি কেন?

পায়নি এইজন্য যে, ওদিকে অনেক লোক ছিল, তাদের গলা, বিয়ে-বাড়ির সমবেত উত্তেজনা গমগম করছিল। ওদিকে হাজার-পাওয়ারের বাতি জ্বলছিল। কড়া আলো আর চড়া আওয়াজে কি গন্ধও ঢাকে? বোধহয় ঢাকে, নইলে নিশীথ লীলার খোঁপায় বেলফুলের অস্তিত্ব টের পায়নি কেন।

পিপাসা পেয়েছিল, নিশীথ আঁজলা পেতে ওই কলেরই জল খেয়ে নিল। রুমালে ঠোঁট মুছে, লীলাকে বলল, 'এবার যাই।'

কারণ হিসাবে জুড়ে দিতে পারত ঘুম পেয়েছে, কিন্তু দিল না, কেননা কথাটা এবারে মিথ্যে হত। অথচ মাত্র এই মিনিট কয়েক আগেও সত্যি ছিল। তখন সত্যিই চোখ ঢুলঢুল ছিল, এখন নেই। ঘুম ছুটে গিয়েছে। অন্যান্য নিমন্ত্রিতরাও বোধহয় একে একে বিদায় নিল এতক্ষণে।

লীলা বলল, 'নিশীথদা, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।'

'বল।'

'এখানটা বড় গরম, চলুন না ওপরে যাই।'

নিশীথ বলল, 'চল।' খুব ঠাণ্ডা স্বরে, নিজেকে যেন নিয়তির হাতে সঁপে দিয়েছে, এমন সুরে।

সিঁড়ি দিয়ে ছাদের দিকে উঠে গেল লীলা, আগের মতই তরতর করে, নিশীথ তখন রাগ করল। ও বোঝে না কেন, আমি পাল্লা দিতে পারি না, ভারী হয়েছি। ভাতে আবার ভরপেট খেয়েছি, আমি ত হাঁপাবই। তা ছাড়া এই যে অন্ধকার সিঁড়ি—এ-ও কি আমার চেনা! ছাদে গিয়েও কে জানে, কত ভূমিকা করবে মেয়েটা, ততক্ষণে পথ নির্জন হবে, ট্রাম বন্ধ হবে, রিকশা করে গিয়েও হয়ত দরজা খোলা পাব না, রেবা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়বে।

বেশী ভূমিকা কিন্তু লীলা করল না, খুব স্পষ্ট গলায় বলল, 'নিশীথদা, আপনার ওপর আমি খুব রাগ করেছি।'

নিশীথ না বুঝে চেয়ে রইল।

লীলা বলল, 'নিশীথদা, আপনার সঙ্গে শেষবার দেখা হয়েছিল আট মাস আগে, মনে আছে? এই আট মাস আপনি আমাকে খুউব কষ্ট দিয়েছেন।'

গম্ভীর গলা নয়, বরং চপল, যেন সামান্য দুষ্টুমি মেশানো।

নিশীথই আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল। বোকা-বোকা ভাবে, ঠেকে-যাওয়া গলায় বলল, 'লীলা, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

লীলা বলল, 'আপনি কী সাংঘাতিক লোক বলুন ত!'

হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে নিশীথ বলল, 'লীলা, আমার সময় বেশি নেই, অনেক রাত হল। কাল সকালে অফিস। হেঁয়ালি কোরো না।'

'হেঁয়ালি?' লীলা এবার বুঝি সত্যিই রাগ করল। —'হেঁয়ালি আমি করলাম, না আপনি? মনে আছে, আট মাস আগে, এইখানে —এমন সময়ে—'

কথাটা শেষ না করে লীলা হাসছিল। নিশীথ বলল, 'এমন সময়ে কী, লীলা?'

'কী, তা আমিই জানিনা যে। আপনি বলেছিলেন, আমার সঙ্গে একটা কথা আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কী কথা? আপনি বললেন, একটু পরে বলছি। আমার, জানেন তো, কৌতূহল খুব বেশী? আবার বললাম, বলুনই না, নিশীথদা, কথাটা কেমন, ভালো না খারাপ? আপনি মুচকে হাসতে থাকলেন। বললেন, অত ব্যস্ত কেন, বলছি, একগ্লাস জল এনে দাও দেখি। এইটুকু জেনে রাখ, খুব বড়ো খবর। বললাম, শুনে কি আমার মাথা ঘুরে যাবে? আপনি হাসতে-হাসতেই বললেন, যেতেও পারে। আমি জল আনতে নামলুম। ফিরে এসে দেখি, আপনি নেই। শুনলাম, আপনাকে কারা ডেকে নিয়ে গেছে। তারপর আপনি তো কলকাতাও ছাড়লেন, আর দেখাই হল না। সেই থেকে নিশীথদা, আমি ভেবে মরছি আর কষ্ট পাচ্ছি। কী বলতে চেয়েছিলেন, বলুন তো?'

নিশীথ কিছুক্ষণ খুঁজে খুঁজে মনের ভিতরটা তোলপাড় করল। বলল, 'কই মনে নেই তো ?'

'মনে নেই ?' তীক্ষ্নদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে লীলা বলল।

'বিশ্বাস কর, কিচ্ছু মনে পড়ছে না।'

লীলা পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। বলল, 'বেশ, তবে যান। অনেকক্ষণ আটকে রাখলাম, কিছু মনে করবেন না। আসলে আপনার মতলব আমি ধরে ফেলেছি, নিশীথদা। আপনি সাংঘাতিক লোক। আপনি আমার কৌতূহলটাকে জীইয়ে রাখতে চান। চান যে, আমি রোজই কী-কথা বলতে চেয়েছিলেন, সেই কথাটাই ভেবে মরি।'

রিকশা করে ফিরছিল নিশীথ। কিছু বেশি পয়সা গেল, কিন্তু এই চলার ছন্দ মন্দ না, ঠুনঠুন ঘণ্টি শুনতে খারাপ না।

লীলা বিশ্বাস করেনি, কিন্তু তার সত্যিই কিছু মনে নেই।

সত্যিই সে লীলাকে কিছু বলতে চেয়েছিল কি ? মনে পড়ে না তো। বলতে যে চেয়েছিল সেই মানুষটাই আজ নেই যে। যে-আলোতে বলেছিল, সেই আলো সেই মুহূর্তটিকে নিয়ে লক্ষ-কোটি যোজন দূরে চলে গিয়েছে। কোনো মন্ত্রবলে সেখানে পৌঁছান যদি সম্ভব হত, তবে হয়ত সেই হারানো মুহূর্তটির সঙ্গে হারানো কথাটিকেও খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু এই মাটিতে দাঁড়িয়ে তা ত আর সম্ভব নয় !

আবার এ ও হতে পারে, নিশীথ ভাবল, আসলে কোনো কথা নেই, কোনো কথা ছিলও না, সবটাই লীলার বানানো—দুষ্টুমি। নিজে সে কিছুমাত্র কষ্ট পায়নি, কিন্তু ওই একটি কথা বলে চিরদিনের মত আমাকে ভাবিয়ে তুলল : কী বলতে চেয়েছিলাম, সত্যিই কিছু বলতে চেয়েছিলাম কি ?

সারা জীবন অনেক কথা বলব, অজস্র অনর্গল কথা, আমার উপর ওয়ালার সঙ্গে, দোকানীর সঙ্গে, ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে। কিন্তু সব কথা বলা হলে, যে-কথাটি বলা হয়নি, রাত্রে সেই কথাটিকে খুঁজব, ভাবব।

এই ভাবা আর খোঁজা আর কষ্টটুকু থাকবে বলেই আমি একেবারে সামান্য হয়ে যাব না, বেঁচে থাকার অন্তত একটা মানে, একটু স্বাদ পাব।

এই স্বাদটুকু তাকে দিয়েছে বলেই দশটা-পাঁচটার কেরানী, সংসারী নিশীথ লীলার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করল।

প্রতিদ্বন্দ্বী

সাহারাণপুর জংশনে সম্পূরণ সিংয়ের মুখে গল্পটা শুনেগায়ে কাঁটা দিয়েছিল। অথচ আসলে এটি রোমান্টিক গল্প। পরদিন দিল্লী ফিরেই যদি এটি লিখতুম তবে হয়ত সেই কাঁটার কয়েকটি এই রচনাতেও ফুটত।

লিখিনি, ভালোই করেছি। গল্পটাকে মনের মতো করে সাজাতে চেয়েছি, পছন্দ হয়নি। ভয়ও ছিল। আমার কাছে যেটা স্পষ্ট, সেটা কাহিনীটির শ্রুতিরূপ, দৃশ্যরূপে তার কতটা ধরা পড়বে, কতটা উবে যাবে তার নিশ্চয়তা ছিল না।

তা-ছাড়া, পরে ভেবে দেখেছি, সেদিনের আতঙ্ক অনেকটাই পরিবেশজনিত। ওয়েটিং রুম-লাগোয়া রিফ্রেশমেন্ট-কামরায় আমরা দু'জন মুখোমুখি, টেবিলে ঝকঝকে কাঁটা-ছুরি, ধবধবে তোয়ালে; পেয়ালা-প্লেট-পিরিচ, চীনেমাটির বাটি; চামচের টুংটুং ছাপিয়ে শান্টিংয়ের বাজ-আওয়াজ। কাচের শার্সির বাইরে ছমছমে ছাই রঙের জোববাপরা শীত-আকাশ, তার কপালে ধকধক চোখের মতো দূর-ইয়ার্ডের দারুণ দু'টি ফ্লাড-লাইট। তবু মাঝে মাঝে লাইনের অরণ্যে পথভ্রান্ত দু'একটি ইঞ্জিন সিগন্যালের ইশারা না পেয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে। সেই চিৎকার কুয়াশাকে ছুরির মতো ছিঁড়ে দিয়ে যায়।

এই পরিবেশে জোলো প্রেমের গল্পও ভুতুড়ে রূপ ধরে আসে। বিশেষ, বক্তা যদি হয় মধ্যবয়সী বলিষ্ঠ একজন শিখ, যার পাগড়িতে পাকা চুল আর দাড়িতে ঠিক বয়স লুকানো।

আজ ভাবি সেদিন যদি এক্সপ্রেসটা ফেল করে ফ্রন্টিয়ার মেলের জন্যে বসে না থাকতুম, তবে সম্পূরণ সিংয়ের মুখে এ গল্প শোনাই

হত না। তাতে অবশ্য ক্ষতি ছিলনা। বাংলা সাহিত্যে আর একটি ক্ষীণায়ু কাহিনী অলিখিত থেকে যেত।

আমরা প্রায় এক সঙ্গে রিফ্রেশমেন্ট ঘরে ঢুকেছিলুম, প্রথমে আমি, একটু পরেই সম্পূরণ সিং। টেবিলটা আগেই আমার দখলে, সুতরাং ওকে কিছুক্ষণ ইতস্তত করতে হল। অবশেষে দেখলুম লোকটা আমাকে অভিবাদন করলে; সবিনয়ে বললে, 'বসতে পারি?'

মূর্ত সৌজন্য হয়ে বললুম, 'অবশ্যই।' ওয়েটার যদি আসতে অতিশয় দেরি না করত তবে হয়ত আমাদের আলাপে ওখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়ত; উভয়ের যে কোনো একজনের উঠে যাবার তাড়া থাকলেও। বারকয়েক পরিবেশকের কৃপাদৃষ্টিলাভে ব্যর্থ হয়ে হয়ত অভিযোগের খাতায় একটা সই দিয়ে বেরিয়ে যেতুম। হাতের কাছে সচিত্র কোনো পত্রিকাও ছিলনা যে না-পড়া চোখে পাতা ওলটাই।

সৌভাগ্যক্রমে দুজনেরই সেদিন প্রচুর অবসর, দু'জনেই এক ফেরি ফেল করে পরেরটার অপেক্ষা করছি। খানা-ঘরে যে হানা দিয়েছি সেও ততটা খিদে ঘোচাতে নয়, যতটা সময় কাটাতে। টেবিলটা এত বড় নয়, যে আগন্তুকের, যদিও অপরিচিত, উপস্থিতি উপেক্ষা করব।

বললুম, 'আপনিও ট্রেন পাননি?'

সম্পূরণ অন্যমনস্ক হয়ে কী ভাবছিল। প্রশ্নে চকিত হয়ে বলল, 'না। ঠিক এক মিনিটের জন্যে। অথচ ছুটতে ছুটতে এসেছিলুম।' নিজের কথা বলে অপরেরটাও জিজ্ঞাসা করা রীতি। সম্পূরণ একটু থেমে বললে, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

'দিল্লি। আপনি?'

'আরও কিছুদূর—রেওয়ারি।'

এর পরের কথাটা হত 'আজ কী শীত দেখেছেন,' কিন্তু তখনই পরিবেশক সামনে এসে দাঁড়াল, সুতরাং দু'জনেই ভোজ্যসূচী নিয়ে

ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। তালিকাটি আদ্যন্ত পাঠের পর সম্পুরণ ফেরত দিয়ে বললে, 'কফি।'

আমার রসনা লুব্ধ হয়ে উঠেছিল, বিশেষ, তখন মনে পড়েছে তাড়াতাড়িতে ভালো করে খেয়ে আসা হয়নি। একটা রোস্ট ফরমাশ করলুম।

যেই উচ্চারণ করলুম 'রোস্ট', অমনই সম্পুরণ যেন চমকে উঠল। লোহিতাভ, পোড়াতামাটে মুখ সহসা ছাই হয়ে গেছে, ঈষৎ সন্দিগ্ধ, একটু-বা ব্যথিত। অতি প্রকট নাকের নীচে দুটি পোষমানা কাঁকড়াবিছেকে একটি বলিষ্ঠ রোমশ হাত এতক্ষণ সস্নেহে তা দিচ্ছিল, হঠাৎ থেমে গেল। মনে হল আঙুলগুলো কাঁপছেও।

একটু পরেই রুমাল বার করে সম্পুরণ মুখের সমুখে ধরলে। এবার আমার চমকানোর পালা। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বললুম, 'মাপ করবেন, আপনি কি অসুস্থ?'

লজ্জিত হয়ে রুমাল ফের পকেটে পুরে সম্পুরণ বললে, 'ধন্যবাদ। না-না আমার কিছু হয়নি। হঠাৎ কেমন যেন—জল আছে?'

পরিবেশক ইতিমধ্যে আমার জন্যে জলের গ্লাস রেখে গিয়েছিল। সেটাই ওর দিকে এগিয়ে দিলুম। ঢকঢক করে গ্লাস শেষ করে ও টেবিলে রেখে দিলে, ঠক করে শব্দ হল, বুঝলুম ওর স্নায়ুভঙ্গ তখনও পুরোপুরি সারেনি। কফি এল, সেটাকেও এক নিশ্বাসে শেষ করে সম্পুরণ আমাকে মৃদু কণ্ঠে কী বললে—বোধ হয় মার্জনা চাইলে—তারপর এক রকম ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়েছিলুম। রোস্ট এলে কাঁটা ছুরি নিয়ে নিপুণ অস্ত্রোপচারে মন দিলুম; এ-জাতীয় সার্জারিতে আমার দখল কিছু কম, রীতিমতো নাজেহাল হয়ে সম্পুরণের বিসদৃশ আচরণের কথা একেবারে ভুলে গেলুম।

ওয়েটিং রুমে একটু ঘুমিয়ে নেব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সেখানে পদার্পণ করেই সে-আশা ছাড়তে হল। সারা ঘরে মালপত্র, আসনগুলিও

খালি নেই, টেবিলের উপরে এক স্থূলতনু বৃকোদর হাত-পা ছড়িয়ে শয়ান, সম্ভবত নিদ্রামগ্ন। অধমাঙ্গের অর্ধেক আধা-পাৎলুনে ঢাকা, উত্তমাঙ্গ শুধু একটি গেঞ্জিতে—লজ্জা নিবারণের শর্ট-কাট। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ঘরর্ ঘরর্ শুনলুম, ওই মগজে ঘুমও থাকতে চায় না, ফাঁক পেলেই পালাতে চায় তাই নাকের মুখে একটা কুকুর পুষে রাখা হয়েছে, সে ঘর্-ঘর্ করে তাড়া দেয়, ঘুম ফের সুড় সুড় করে মগজে গিয়ে ঢোকে।

পায়চারি করতে অগত্যা বাইরে আসতে হল। প্লাটফর্মের সামান্য অংশই আচ্ছাদিত, শেডের বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ফোঁটার মতো হিম পড়ছে টের পেলুম। শরীরটা ইতিমধ্যেই টুপি, ওভারকোট ইত্যাদিতে ঢেকে নিয়েছি, ঠাণ্ডা লাগাবার বিশেষ ভয় ছিল না। তবু লম্বা-লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করলুম।

প্লাটফর্মের শেষ সীমানায় আবার সম্পূরণ সিংয়ের মুখোমুখি হতে হল। বুকের উপরে হাত আড়াআড়ি রেখে সেও জোরে-জোরে হাঁটছিল। বললুম, 'সর্দি-তাড়ানো মেহনত করছেন?'

এদিকে স্টল নেই, আলো এমনিই কিছু কম। সম্পূরণ থমকে দাঁড়াল। অযাচিত সম্ভাষণে নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়ে থাকবে, কিন্তু আমাকে চিনতে পেরেই রুষ্ট রেখা ক'টি মিলিয়ে গেল।

'আপনি? তখন যে অদ্ভুত ব্যবহার করেছি তার জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত মিঃ—'

আমার পদবীটা জুগিয়ে দিয়ে ওকে বাক্য সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করলুম।

'মিঃ ঘোষ, বিশ্বাস করুন আপনাকে অফেণ্ড করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। অথচ কী যে হয়ে গেল—'

'আপনি নিশ্চয়ই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।'

'অসুখ? না ঠিক তা নয়, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।'

হাঁটতে হাঁটতে আবার রিফ্রেশমেণ্ট রুমের সামনে এসেছিলুম।

বললুম, 'একটু বসবেন ? গল্প না হোক, অন্তত এই ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।'

ওয়েটার ঘুমিয়ে পড়েছিল। এত রাত্রে প্যাসেঞ্জার এ-ঘরে ঢোকে না। কী আছে জিজ্ঞাসা করে জানলুম, সব ফুরিয়ে গেছে। আণ্ডা আছে, চাই তো ভেজে দিতে পারে। আর দু'চার টুকরো মাখন-রুটি।

বখশিশ কবুল করে বললুম, 'তাই আন।' সঙ্গে সঙ্গে আড়চোখে সম্পূরণ সিংয়ের দিকে চেয়েছিলুম। রোস্টের নামে লোকটা ভয় পেয়েছিল, ডিমের নামে মূর্ছা না যায়।

সে রকম কোনো দুর্ঘটনা ঘটল না।

সে-কালে ঠাকুরের নাম, নিবাস ইত্যাদি দিয়ে আলাপ শুরু হত। কিন্তু পরিচয়ের মাঝপথে সে-প্রসঙ্গ টেনে আনা চলে না। আমরা অবশ্য ইতিমধ্যে পরস্পরের নাম জেনেছি।

বাইরে শীতে কাবু রাত্রি আরও ভালো করে কুয়াশার লেপ গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। চূড়ান্ত-চড়া ফ্লাড-লাইটের আলো দুটিও এখন নেশায় ঝিমনো চোখের মতো ঘোলাটে, নিবু-নিবু। মাঝে মাঝে ঘুমনো প্লাটফর্ম গমগম করে বেজে ওঠে। মেল ট্রেন নয়, মাল গাড়ি পাশ করছে। কাচের শার্সিতে হিম-তুলি একটার পর একটা ছায়া-ছবি আঁকে আর মুছে দেয়।

অল্পক্ষণের আলাপ, তবু দু'জনে কখন আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছি। হাঁটুর ঠক-ঠক ঠেকাতে ওভারকোট খুলে পায়ে উপর বিছিয়ে দিয়েছি। সম্পূরণের মুখের একাংশ আমার দিক থেকে ফেরানো, মাঝে মাঝে একটু ঘোরায় যখন, সেদিকটাও দেখতে পাই, কিন্তু স্পষ্ট নয়। দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক কিছু আছে, কিন্তু কী ঠিক ধরতে পারিনে। সম্পূরণ বুদ্ধিমান, আমার মনের কথাটা অনুমান করে থাকবে। হঠাৎ কাঁটা-ছুরি নামিয়ে রেখে বললে 'বার বার তাকিয়ে কী দেখছেন শিরমানজী আমার বাঁ চোখটা পাথরের।'

টেবিলের তলায় পা দু'টি সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠেছিল, মনে আছে।

ওয়েটারটা ঘরের এক-পাশে কুণ্ডলী হয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে, ত্রিসীমানায় আর কেউ নেই। ঘরের বাইরে নীলকোর্তা দু' একটা কুলিকে চলাফেরা করতে দেখেছি বটে, কিন্তু কাচের দরজা-জানালার এ-পাশ থেকে আমায় চোখে তারা ছায়ামূর্তি বই নয়।

"আমার বাঁ চোখটা পাথরের।' মনে হল ঠিক এমনি অনায়াসে সম্পুরণ বলতে পারে, আমাকে যেমন দেখছেন আমি তেমন নই। এই পাগড়ী, দাড়ি আর পোশাকের ঠিক নিচেই একটি কঙ্কাল ঢেকে রেখেছি। অদৃষ্টকে ধন্যবাদ সম্পুরণ সে-সব কিছু বললে না, এক হাতে তর্জনী দিয়ে অপর হাতের বালাটা ঠুনঠুন বাজতে থাকল। বোঝা গেল উত্তেজিত হয়েছে হঠাৎ সোজা হয়ে বসল সম্পুরণ, আমার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বললে, 'একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলেই তো পল্টনে কাজ হলনা, নইলে রাওয়ালপিণ্ডির জোয়ান ট্যানারির টাউট হয়েছে, শুনেছেন কোথাও?'

ভালো করে ওর গল্প শোনবার জন্যে, কিংবা লুপ্ত সাহস ফিরে পেতে, সিগারেট ধরিয়ে বসলুম। শিখদের এ-সব ব্যাপারে রীতিমতো শুচিবাই তাই আগে-ভাগে ওর অনুমতিটাও চেয়ে নিতে ভুলিনি।

সম্পুরণ বললে, 'বয়স হল, কিন্তু খেতের কাজে মন বসল না, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। তন্দুর-চাপাটির খোঁজে না ঘুরেছি এমন জায়গা নেই, শিবালিক পেরিয়ে চলে গেছি, কুলুভ্যালী, চম্বায়, কসৌলি, মসুরী, চক্রাটা। লাহোর, হোসিয়ারপুর, ফিরোজপুর, আম্বালা, দেহলি—কোথাও সুবিধে হল না। শেষপর্যন্ত চলে গেলুম কানপুরে, ট্যানারির দালালি জুটল। টন-টন চামড়ার কারবার, আমার উপর কাঁচামাল জোগান দেবার ভাড় পড়ল। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতুম, মরা গোরু বাছুরের খোঁজ করতুম। কয়েকটা কসাইখানার সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল।

'প্রথম প্রথম ভালো লাগতো না। মনে হয় পেটের ধান্দায় কী মহাপাপই করছি। মাঠে মাঠে গোরু চরে, খাটালে ভইস বিচালি

খায়, দুধ ঢালে আমাকে দেখলেই ওরা ড্যাবডেবে চোখ মেলে চাইত, যেন ধমকাচ্ছে, যেন দুষছে। আমি শয়তান, ওদের দুশমন, সেটা ওরাও যেন জানত। হয়ত আমারই ভুল, কিন্তু মনে হত।

'মুশকিলে পড়লুম লড়াই বাধলে। কারখানা থেকে হুকুম হল আরও চামড়া যোগান দাও। ওরা একটা স্যাডলারি ফ্যাক্টারির কনট্রাক্ট নিয়েছিল। হাজার-হাজার ঘোড়ার জ্যান্ত চামড়ার উপর মরা চামড়া চাপিয়ে লড়াইয়ের কাজে লাগান হবে।

আমার ঘোরাঘুরি আরও বেড়ে গেল, কিন্তু যোগান দিয়ে ওদের খুশি করতে পারলাম না। আরও চাই, আরও, আরও। জেলায় জেলায় টাউট ঘুরছে, আমার ভাগে পড়ল দেহলি আর হরিয়ানা! মরীয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত কী করলুম জানেন? গোপনে গোপনে কড়া বিষ যোগাড় করে নিলুম। শেষরাতের অন্ধকারে খানিকটা করে ছড়িয়ে দিয়ে আসতুম মাঠে, যেখানে পরদিন সকালে গোরু চরাতে আসবে।

'রোজই দু'একটা মরত। একলা মাঠে গিয়ে তাদের দেখে আসতুম, কিন্তু তাদের ঠাণ্ডা, স্থির, নীল চোখের দিকে চাইতে পারতুম না। দেশে থাকতে আমার নিজেরই একটা প্রিয় গাই ছিল, ক্যাম্বেলপুরের গাই, মিশমিশে কালো রঙ, উটের মতো উঁচু, বয়েলের মতো জোয়ান, কিন্তু দু'টি চোখ। তার কথা মনে পড়ে যেত। সব বিষনীল গোরুর চোখে আমি সেই ক্যাম্বেলপুরের গাইটার চোখ দেখতে পেতুম।

'তবু সে-কাজ ছাড়িনি। পেটের জ্বালা এমন, মাঠ থেকে ছুটে যেতুম মালিকদের কাছে। বাকি বন্দোবস্ত করা শক্ত হত না। শস্তাই পড়ত।'

হঠাৎ থামল সম্পূরণ। তোয়ালেতে ঠোঁট মুছল। ঈষৎ লজ্জিত, হেসে বললে, 'কিন্তু আমি আমার গল্প তো আপনাকে শোনাতে চাইনি! তখন কেন হঠাৎ উঠে গিয়েছিলুম তার কৈফিয়ৎ দিতে চেয়েছি। বাজে কথা বড়ো বেশি হয়ে গেল।'

বাইরে একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল। প্লাটফর্মটা আবার চকিত, কুলীরা ব্যস্ত, হাতগাড়ি ঠেলে ঠেলে ভেণ্ডরেরা এ-প্রান্ত ও প্রান্ত অবধি ছুটছে। ক্লান্ত, ভাঙা-ভাঙা গলায় সুর করে বলছে, 'সমোসে গরম—চায়!'

সম্পূরণ একবার উঁকি দিয়ে দেখে এল।—'অমৃতসর-হাওড়া মেল। আমাদের গাড়ির এখনও অনেক দেরি।'

দুর্জয় শীতে ঘুম দেশ ছাড়া। হাই তুলে বললুম, 'ততক্ষণ গল্প চলুক।'

আমার ছমছমে ভাব কেটে গিয়েছিল। এই লোকটার একটা চোখ ঝুটো হতে পারে কিন্তু বাকিটা রক্তমাংসের, খাঁটি, অণুমাত্র সংশয় নেই।

সম্পূরণ তখন ওর ঢিলে কোটের পকেট থেকে ছোট একটা শিশির বার করলে; প্যাক-করা, কিন্তু কিসের, বুঝতে বিন্দুমাত্র দেরি হলনা। সসঙ্কোচে আমার দিকে চেয়ে বললে, 'চলে?'

বললুম, 'চলে, কিন্তু চালাব না। রেল-পুলিশের হাতে পড়তে ইচ্ছে নেই।'

'মিছে ভয় পাচ্ছেন। সভ্যদেশে বখ্‌শিশ আর ঘুষ নামে দুটো জিনিস আছে। একটিতে কাজ না হয় আর একটিতে হবেই।'

উত্তেজিত লোককে ঘাঁটানো বৃথা। চুপ করে রইলুম। আলোর সম্মুখে গ্লাস উঁচু করে সম্পূরণ মাত্রা ঠিক করলে। টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে বললে, 'রোস্ট খেতে দেখে কেন ভয় পেয়েছিলুম এবার সে-কথা আপনাকে বলি।'

মনে আছে চোখ দু'টি বিস্ফারিত করে তন্ময় হয়ে অনেকক্ষণ ধরে সম্পূরণ সিংয়ের গল্প শুনেছিলুম। মাঝে মাঝে হাত হিম হয়ে গেছে, ওভারকোটের কর্কশ পিঠে ঘষেছি; দূর ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছে হঠাৎ থেমে কোনো ইঞ্জিন তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার করেছে, চমকে উঠেছি। কানের নরম লতিতে একটা মশা বারবার বসে উৎপাত করেছে, মারতে হাত তুলিনি।

কাহিনীটা সম্পূরণ একাই বলে গেছে। খাবার টেবিলে নুনের ডিবে, সসের বাটি এগিয়ে দেবার মতো আমি মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলে ওকে খেই ঠিক রাখতে সাহায্য করেছি মাত্র।

সম্পূরণ বললে, আমার পেশার কথা আপনাকে বলেছি। এই পেশাই লড়াইয়ের শেষ দিকে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল গুর-গাঁওয়ের এক গাঁওয়ে। এক ট্যাঁকে বিষ আর এক ট্যাঁকে তাড়াতাড়া নোট নিয়ে সেখানেই ক'দিনের জন্যে আস্তানা গাড়লুম। একে গ্রাম, তাতে লড়াই চলেছে, খাবার জিনিস আক্রা। আণ্ডা আর মীট মোটে নেই, সব্জিও যা হয়, বেশির ভাগ চালান যায় শহরে। পাওয়া যেত দুধ—গোয়ালারা রাতেই সাইকেলে টিন ঝুলিয়ে দেহলির পথে রওনা হত। মনে হত যেন জোলুশ চলেছে।

মাঠে প্রথমেই সেঁকো বিষ দিলুম না, সোজা পথে চামড়া সংগ্রহ করতে চেষ্টা করলুম। সকাল হতেই বেরিয়ে পড়ি, মাঠে মাঠে ঘুরি। অড়্হর আর গেঁহুর ক্ষেতে একদিন পথ হারিয়ে ফেললুম। ঘুরে ঘুরে হয়রান—সেটাও শীতকাল, তবু, গায়ে ঘাম ছুটল। যেদিকে চাই, একটা মানুষ দেখতে পাইনে। ঝিলের ধারে, ঘাসের ঝোপে টীল ডাক, নাইটের কিচির-মিচির শুনি, আমার পায়ের আওয়াজে তারা পলকে পালায়। অনেক দূরে দূরে দেখি খুব বড়ো বড়ো পাখি মাটির খুব কাছ দিয়ে, অথচ মাটি না ছুঁয়ে উড়ে চলেছে। এত বড়ো পাখি, আর মাটির এত কাছে? নজর করে বুঝলুম হরিণ। কখনো হরিণের ছুটে চলা দেখেছেন? হরিণ তো ছোটে না, ওড়ে।

অনেক ঘুরতে ঘুরতে উঁচুমতো যে জায়গাটাতে এসে দাঁড়ালুম, সেটা একটা রহট। ইঁদারার মধ্যে ছোট ছোট বাটি ঘুরে ঘুরে ক্ষেতে জল ছড়ায়, আপনাদের দেশে আছে কিনা জানিনা। ইংরেজীতে বলে পার্সিয়ান হুইল।

সেই কুয়োতলায় তাকে প্রথম দেখলুম। ডালায় সবজি—মুলো,

খিরা, আরো কত কী মনে নেই—রহটের জলে ভিজিয়ে নিচ্ছে। তেষ্টা পেয়েছিল, হাত পেতে বললুম 'আমাকে ছুটো।'

সঙ্গে সঙ্গে দিলে না, কিন্তু মুখ তুললে। তাকে দেখতে পেলুম। ঘাঘরাটা ময়লা, ওড়নাও ছেঁড়া, কিন্তু মুখখানি ভারি মিষ্টি। আর যেটা ভালো লেগে ছিল সেটা ওর আব্রু। শহরে শহরে ঘুরে মেয়েদের সম্বন্ধে সব মোহ ঘুচে গিয়েছিল বাবুজী, ওদের শরীর নিয়েও কোনো আগ্রহ ছিল না। দেখেছেন তো, ওরা লড়াইয়ে হেরে-যাওয়া ফৌজের মতো শুধু নিজেদের পিঠ দেখাতে ভালবাসে?

আস্তে আস্তে মেয়েটি ওড়নায় মুখ ঢেকে দিলে। ওকে ইতস্তত করতে দেখে বললুম, 'কই দাও? পয়সা দেব।'

একটি খিরা ছুটি মুলো নিলুম। আঁচলা পেতে খেলুম রহটের জল। মেয়েটির কাছে তারপর পথের খোঁজ নিলুম। শুনলুম, আমাকে আরও ছু'মীল যেতে হবে। মাইলের আন্দাজ এদের কখনও ঠিক হয় না, ধরে নিলুম অনেক মাইল হাঁটতে হবে – তুই হতে পারে, আবার দশও। সেই কুয়োতলাতেই জিরিয়ে ফের চলতে শুরু করব স্থির করলুম।

হঠাৎ কোথায় যেন ঝটপট-ডানা একটা আওয়াজ। চমকে দেখি একটা রাজহাঁস খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জলের নালা ধরে খেতের দিকে যাচ্ছে। এতক্ষণ ডালার আড়ালে ছিল দেখতে পায়নি। মেয়েটিও তার পিছনে ছুটছে, কিন্তু হাঁসটা ততক্ষণ গেঁহুর সবুজে ডুবে গেছে। একটু পরে মেয়েটিও সেখানে ডুবে গেল।

উঠে এল একটু পরেই। এক হাতে রাজহাঁসটার সরু গলা ধরে আছে, আর এক হাতে ঘাঘরার প্রান্ত ওড়না খসে গেছে, আলোর উপর পাতলা পা ছুটি ফেলে উঠে আসছে। কাছাকাছি আসতে ওর কপালের ঘাম, ঘননিটোল বুকের ওঠা-পড়া দেখতে পেলাম।

এসে আর বসল না। রাজহাঁসটাকে কাঁখে আর ডালাটাকে মাথায় নিয়ে দাঁড়াল।

মাঠের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে, আমি পিছে পিছে। আমার

ভারী জুতোর থপ-থপ শুনে দাঁড়ালে। ঘাড় ফিরিয়ে বললে, 'আসছ যে।'

বললুম, 'পথ দেখিয়ে দেবে।'

মুখ ঘুরিয়ে ও আবার নীরবে এগোতে থাকল। পাশাপাশি পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমাদের ঘর কতদূর?'

জবাব এল না। চুপচাপ হাঁটছি। খানিকক্ষণ পরে শুনতে পেলুম, 'তুমি এখানে এসেছ কেন?'

আমার পেশার কথা ওকে বলতে সঙ্কোচ হল। শুধু বললুম, 'কাজে।'

দীর্ঘ পথ এক সঙ্গে চলতে হলে আড়ি আপনা থেকেই ভেঙে যায়। কখন মেয়েটির সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে শুরু করেছি, মেয়েটিও জবাব দিচ্ছে, খেয়াল করেনি। কথায় কথায় জানলুম ওদের ঘর আমি যে গাঁয়ে উঠেছি তার কাছেই। কতটা পথ তার হিসেব মাইলে নিলুম না। জেরা করে জানলুম, ওদের বাড়ি থেকে টাটকা টাটকা দুধ দুইয়ে নিলে আমার ওখানে পৌঁছতে ফেনা মরে না।

সঙ্গে সঙ্গে বললুম, 'তবে তুমি আমাকে রোজ আধ সের দুধ দিও ; যে কদিন আছি। দাম নগদ পাবে।'

চোখ তুলে ও একবার তাকালে। মাথা নিচু করে বললে, 'আচ্ছা।'

জেরা করে আগেই জেনেছিলুম ওর মুখ্য জীবিকা এইটেই। ওর শ্বশুর আগে রোজ সাইকেলে দুধ নিয়ে দিল্লি যেত। এখন বয়স হয়েছে, রোজ পারে না।

'শ্বশুরের ছেলে নেই?'

'আছে। লড়াইয়ে।' আমি যে পাশে আছি, সে দিকটা ওড়নায় ঢাকা, ওর মুখ দেখতে পেলুম না। না চোখের পাতা-কাঁপা না গালের লাল।

ওর নাম অহল্যা। হিন্দু। জানেন ত, হরিয়ানা-প্রান্তে শিখ কম হিন্দু বেশী। আপনার শুনতে খারাপ লাগছে শিরমানজী।

চোখে ঈষৎ ঘোর লেগেছিল। ট্রেনের ভাবনা ঘুচে গেছে, মনে হয়েছিল সাহারানপুর জংসনের এই রিফ্রেশমেন্ট-রুমটাই এখুনি দুলে দুলে চলতে সুরু করে দেবে, আমাকে কাল সকালে পৌঁছে দেবে দিল্লিতে। বললুম, 'বলে যাও।'

সম্পূরণ সিং আরেক মাত্রা নিজের গ্লাসে, এক মাত্রা আমারটায় ঢেলে জল মিশিয়ে দিলে।

—খেয়ে নিন, তখন যা বলব তা আরও মিঠে লাগবে। পরদিন সকালে অহল্যা দুধ নিয়ে এসেছিল। মাথায় সব্‌জির চুবড়ি, সেখানে দুধের ঘট বসানো, চলকে পড়েনি এই আশ্চর্য। কোলে সেই রাজহাঁসটা।

বললুম, 'আজও এটাকে সঙ্গে এনেছ?'

কিছু না বলে অহল্যা হাসল।

'উড়ে যায় যদি?'

'উড়বে না। আমাকে ছেড়ে ও কোথাও যাবে না। রোজ তো ওকে ঝিলে ছেড়ে দি। সাঁতরে সাঁতরে আবার ঠিক ফিরে আসে।'

দুধ ঢেলে দেবার সময় ওড়না সরে গিয়েছিল, ওর দীর্ঘ টানা চোখ দুটি দেখতে পেলুম। অহল্যা আজ সুর্মা লাগিয়ে এসেছে।

শুধু দুধ নয়, সব্‌জিও কিছু রাখলুম। বললুম, 'আণ্ডা দিতে পার?'

'আণ্ডা কোথায় পাব?'

হাঁসটার দিকে আঙুল দিয়ে বললুম, 'কেন এটা পাড়ে না?'

অহল্যা ফের মুখ নিচু করলে। পরে বুঝেছিলুম অল্পেই লজ্জা পাওয়া ওর অভ্যাস।—'এটা মরদ হাঁস জী।'

আমার যে কাজ, তাতে খুব ভোর ভোর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া নিয়ম। মাঠের কোণে তাঁবু, রোজ তিন চারটে কম্বল চাপিয়ে শীতের হামলা ঠেকাই। পরদিন সকালে কিন্তু বেরোতে পারলুম না। রোদ

উঠে ঘাসের কান্না মুছে দিলে, শুয়ে শুয়েই দেখলুম। ভাবলুম আজ বড়ো ঠাণ্ডা, বেরিয়ে কাজ নেই। তারও পরে ও এল।

সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলুম। ধমক দিলুম নিজেকে। তবে কি শীতের ভয়টা সাচ্চা নয়, আমি ওরই অপেক্ষায় শুয়ে ছিলুম, ও না-আসা পর্যন্ত বেরোতে মন চাইছিল না, আর সেই দুর্বলতা-টুকুই আলস্যের ঘোমটা পরে এসেছে?

অকারণেই রূঢ় হলুম, ওর উপরে। বললুম, 'যা এনেছ, রাখ ওখানে।'

অহল্যাও কথাটি বললে না, দুধ আর সব্‌জি নামিয়ে রাখল। চোখ বুজেই ওর হাতের বালার রুনঝুন, আর কোলের রাজহাঁসটার ঝটপট শুনলুম।

পরদিনও অহল্যা এল, কিন্তু অনেক দেরি করে। তার ঢের আগে আমি উঠেছি, তাঁবুর পর্দা খুলেছি, বন্ধ করেছি, বিরক্ত হয়ে কিংবা নিজেকে একটা কাজে ব্যস্ত রাখতে, আঙ্গিঠা জ্বেলে চা করতে বসেছি।

তাঁবুর বাইরে ছায়া পড়ল। অহল্যা মাথায় নিয়ে এসেছে সব্‌জির চুব্‌ড়ী কিন্তু কোলের হাঁসটি নেই। বললুম, 'আজ তোমার এত দেরী হল?' ধমকের চেয়ে গলায় অভিমানটাই বাজল, টের পেয়ে লজ্জা পেলুম। সেটা চাপা দিতেই জিজ্ঞাসা করলুম, 'হাঁস কই তোমার?'

'ঘরে রেখে এসেছি। সর্দারজী, চম্পকের ভারি অসুখ।'

চম্পক তবে রাজহাঁসটার নাম। কিন্তু হাঁসের আবার কী অসুখ। শুনলুম, কাল থেকে ও নাকি কেবলি ঘর-দোর নোংরা করছে, খায়নি কিছুই, নিঝুম হয়ে খুপরিতে পড়ে আছে।

'হাঁসের অসুখের কোনো দবাই নেই?'

অবশ্যই আছে। কিন্তু আমার জানা ছিল না। বললুম, 'মণ্ডির কাছে ডাক্তারখানা আছে, সেখানে খোঁজ নিতে পার।' হাসি চাপতে রীতিমত বেগ পেতে হল।

সেদিন বিকেলে সূঁই-শীত, শরীরটা গরম রাখতে হাঁটতে শুরু করলুম।

কাচের শার্সি ফোঁটা ফোঁটা হিমে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, সেদিকে চেয়ে সম্পূরণ সিং বললে, শিরমানজী, হরিয়ানার মাঠে এর চেয়েও বেশি শীত পড়ে। যাক, ঘুরতে ঘুরতে একটা ঝিলের কাছে গিয়ে পড়লুম। আশে-পাশে ছোট ছোট কুঁড়ে-ঘর, বুঝলুম একটা গাঁয়ের কাছে এসেছি। অন্ধকার হয়ে এসেছে, ঝোপঝাপের ফাঁকে ভালো নজর হয় না, হঠাৎ একটা হাঁসের ডাক শুনে চমকে উঠলুম। সব শেয়ালের এক রা, সব হাঁসেরও সম্ভবত তাই, তবু মনে হল এ চম্পক না হয়ে যায় না। কোথা থেকে ডাকছে ভাল করে দেখব বলে লম্বা লম্বা ঘাস সরিয়ে ঝিলের একেবারে কিনারে গিয়ে উঁকি দিলুম।

দেখি কোমরভর জলে অহল্যা দাঁড়িয়ে। হাতে ছোট ছোট নুড়ি, জলে একটার পর একটা ছুড়ছে, হাল্কা হাল্কা ঢেউ গোল হয়ে ঝিলের বুকে ছড়িয়ে পড়ছে; অহল্যা মাঝে মাঝে সুর করে অর্থহীন কয়েকটা বুলি আওড়াচ্ছে। সেটা হাঁস-ডাকার মন্ত্র।

আমাকে দেখে অহল্যা চুপ করে ভিজে কাপড়েই তাড়াতাড়ি উঠে এল। চোখে সুর্মা নেই, মুখে ওড়না নেই, পরনের ঘাঘরাটাও ভিজে গিয়ে এখন আর আবরণ নয়, গায়ের চামড়ারই আরেক পরত-মাত্র হয়েছে। হাঁটু থেকে পাতা অবধি ওর শরীরটা আমি যেন অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

কাঁদো কাঁদো মুখে, অহল্যার আজ অন্য কিছুতে ভ্রুক্ষেপ নেই, বললে, 'চম্পক পালিয়ে এসে আজ জলে ঢুকেছে। এদিকে ওর অসুখ ও ঠিক মরে যাবে। ওকে কী করে ফেরাই বলুন তো।' বলে নিজেই আবার ছোট ছোট নুড়ি ছুঁড়তে লাগল, সুর করে ডেকে গেল হাঁসটাকে।

একটু পরে পাড়ের নরম কাদায় ছড়ানো পায়ের পাতায় ছাপ রেখে

রেখে চম্পক নিজেই উঠে এল। অহল্যা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছুটে ওকে জড়িয়ে ধরল; কোনোদিকে না চেয়ে, আমাকে কিছু না বলে, ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হল।

পরদিন সূর্য উঠে দেওদার গাছটার পল্লবের ফাঁদে ধরা দিয়েই পাতা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে তাঁবুর কানাতে ঝিকিমিকি রোদ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, অহল্যার তখনও দেখা নেই। আশা ছেড়ে দিয়ে ঘরময় অস্থির পায়ে ঘুরছি, দেখি মাঠ পাড়ি দিয়ে এক বুড়ো এদিকেই আসছে। বাইরে পৌঁছে লোকটা ডালা নামিয়ে হাঁপাতে থাকল, তামাটে মুখে ঘাম। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলে, 'অহল্যা বলে এখানে কেউ রোজ—'

বললুম, 'হ্যাঁ, এখানেই। তুমি ওর শ্বশুর? অহল্যা এল না কেন? চম্পকের বুঝি বেশী অসুখ?'

গলায় ঠাট্টার ছোঁয়া ছিল। লোকটা অবশ্য সেটা টের পেলে না, বিনীতভাবে বললে, 'না, অসুখ অহল্যার নিজের। কাল হাঁসটাকে খুঁজতে সন্ধ্যার পরে অনেকক্ষণ বাইরে ছিল, জলেও ভিজেছে। হাঁসটার জন্যই বেটি একদিন মরবে।'

'ওটাকে খুব ভালোবাসে বুঝি?'

ফোকলা মুখের মাড়ি বের করে বুড়ো শিশুর মতো হাসল।—'খুব। ওকে ও শুধু তা দিয়ে ফোটায়নি, নইলে আর সবই করেছে। আমার ঘরে গেলে দেখতেন হাঁসের খোপটা উঠোনে নয়, ঘরের ভেতরে, অহল্যার বিছানার ঠিক পাশেই। প্রথম প্রথম বকতুম, এখন কিছু বলি না। একটু বাড়াবাড়ি করে, কিন্তু ওর দোষ কী সর্দারজী। ঘর খালি, আমরা দুজন মাত্র থাকি। একটা বাচ্চা পর্যন্ত নেই।'

বলেই বুড়ো উঠেছিল। অনেক বেশি বলে ফেলেছে ভেবে লজ্জা পেয়েছে। বললুম, 'লালা, ব'স। এত তাড়া কিসের।'

ডালাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বুড়ো বললে, 'এখান থেকে

মণ্ডিতে যাব। এগুলো বিক্রী করে ফিরতে ফিরতে অনেক বেলা হয়ে যাবে।'

ওর শিথিল চামড়া আর তোবড়ানো গালের দিকে চেয়ে বললুম, 'এই বয়সেও এত পরিশ্রম করছ, তোমার ছেলে শুনেছি লড়াইয়ে গেছে, সে কিছু খরচ পাঠায় না?'

দেখলুম লোকটার মুখ রক্তলেশহীন হয়ে গেছে। মাথা নিচু করে বললে, 'আমার ছেলে লড়াইয়ে গেছে আপনাকে কে বললে?'

বললুম, 'অহল্যা।'

বুড়ো কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে, চোখ মাটিতে রেখেই, বললে, 'অহল্যা মিছে কথা বলেছে সর্দারজী। আমার ছেলে জেলে।'

'জেলে!'

'গিয়েছিল। এতদিন তার খালাস হয়ে বেরিয়ে আসারও কথা। গাঁয়ের লোকে অনেক কথা রটায় সর্দারজী। কেউ কেউ নাকি ওকে দেহলির চৌরিবাজারের একটা গলিতে দেখেছে।'

চৌরিবাজার অঞ্চলের সুনাম ছিল না। চুপ করে রইলুম। বুড়ো নিজেই বললে, 'ওমপ্রকাশ এখন নাকি তবলচি হয়েছে। আর দিনে ওকে দেখা যায় ফতেপুরির ভিড়ে। আপনি নিশ্চয়ই দেহলি যান। খোঁজ নেবেন?'

একটা জোয়ানের চেহারা যেন চোখের সমুখে ভেসে উঠল। রাতে নাচের সঙ্গে যে সঙ্গত করে, দিনে ফতেপুরিতে পরের পকেট হাতড়ায়!

'ওমপ্রকাশ জেলে গিয়েছিল কেন?'

লোকটা অনেকক্ষণ ইতস্তত করলে। বোধ হয় বলবে কি বলবে না স্থির করতে পারছে না। কিন্তু গ্রামের মানুষ স্বভাব-সরল, বেশিক্ষণ কথা চেপে রাখতে জানে না। অতি মৃদু, অতি সঙ্কুচিতভাবে বললে, 'সেও শরমের কথা সর্দারজী, গাঁয়েরই একটা লোককে ও ছুরি মেরেছিল। মা নেই, ছেলেটা বচপন থেকেই দলে মিশে আর শহরে

ঘোরাঘুরি করে নষ্ট হয়ে যায়। এক-রোখা, চট্‌লে আর কোনো হুঁশ থাকে না।'

'কিন্তু ছুরি মেরেছিল কেন?'

বুড়ো আবার ঢোঁক গিললে। মাটিতে রাখা চোখ দুটোই ফেরালে এদিক ওদিক। ডালাটাকে শক্ত করে ধরলে, যেন একটা নির্ভর চাইছে। প্রাণ গেলেও আসল কথাটা ফাঁস না করে দেবার মতো মনের জোর খুঁজছে। ওর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আবার বললুম, 'ছুরি মেরেছিল কেন?'

'অহল্যা মাঈয়ের মতো মেয়ে হয় না, কিন্তু তাকে সন্দেহ করত। সেই লোকটাকে অহল্যার সঙ্গে বার দুই কথা বলতে দেখেছিল।' বলতে বলতে অহল্যার শ্বশুর যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'লোকটা নেহাত বরাত জোরে বেঁচে গেল, তাই ওমপ্রকাশের ফাঁসি হল না। ঝোপের ধারে লোকটা মুখ থুবড়ে পড়েছিল, কতক্ষণ কে জানে, সকালে আমরা দেখি। খুন জমে কালো কালো চাপ বেঁধেছে, তখনো ফোঁটা ফোঁটা ঝরছে। পাশেই একটা নহর—তার জল লাল হয়ে গিয়েছিল সর্দারজী।'

বুড়ো হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁপছিল। ঘরের কথা প্রকাশ করার লজ্জা, নিজের ছেলেকে ভালো না বাসতে পারার লজ্জা।

বললুম, তুমি এবার যাও, লালা। সময় পেলে বিকেলের দিকে তোমার বাসায় যাব।'

সময় পেয়েছিলুম: আমাকে দেখে ত্রস্ত অহল্যা তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসল, এক দিনের অসুখে চুলগুলো রুক্ষ, মুখখানি নীরক্ত-রুগ্ন। চম্পক ওর কোলেই, সরু সরু মোম-আঙুল শাদা পালকে বুলিয়ে দিয়ে অহল্যা আদর করছে।

এখন ভাবি সেদিন কী ছেলেমানুষী করেছিলুম। অল্প পরিচিতা একটি গ্রাম্য মেয়ে যার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শুধু দুধ আর সব্‌জি যোগান দেবার, সামান্য অসুখের খবর পেয়েই তাকে দেখতে ছোটা ঠিক

হয়নি। সেদিন এতটা বিচার করিনি, দেখেছিলুম আমার পায়ের শব্দে ওর উজ্জ্বল দুটি চোখ, গায়ের কাপড় টেনেটুনে আরেকটু সম্বৃত হওয়ায় প্রয়াস।

'তোমাকে দেখতে এলুম অহল্যা। কেমন আছ?'

'ভালো।'

'আর তোমার চম্পক?'

পাণ্ডুর মুখে সিঁদুর ছড়িয়ে পড়ল। বললে, 'সে-ও ভালো।'

আরও দু-চারটি কথা বলতে চাই, খুঁজে না পেয়ে নিজের উপরেই বিরক্ত হয়ে উঠি। বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে বললুম, 'বড়ো ঠাণ্ডা।'

'জী হাঁ।'

'আবার মেঘ করেছে। বর্ষা নামলে ভারী অসুবিধে হবে। বরফ পড়বে, না?'

'পড়তে পারে।'

অহেতুক, অর্থহীন আলাপ। শেষ পর্যন্ত মনে মনে আমার অচতুর রসনাকে ধিক্কার দিয়ে উঠে আসব, দরজা পর্যন্ত এসেও গেলুম। ফিরে তাকিয়ে দেখি কালো-কালো চোখ মেলে অহল্যা এক দৃষ্টে আমাকেই দেখছে। মনে হল কিছু বলতে চায়।

বললুম, 'কী' অহল্যা।'

জামার ভাঁজ থেকে সসঙ্কোচে একটা চিঠি বের করে অহল্যা আমার হাতে দিলে।

'আজকের ডাকে এসেছে। পড়ে দেবেন?'

দ্রুত হাতে খামটা ছিঁড়লুম। উর্দু হরফ ভালো পড়তে পারিনে কিছু সময় লাগল। চিঠিটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললুম, 'তোমার স্বামীর চিঠি। শীগগির এখানে আসতে পারে লিখেছে। আর—আর', অল্প একটু কেশে সঙ্কোচ জয় করে বললুম 'তোমাকে ভালোবাসা জানিয়েছে।'

নিষ্প্রভ মুখে লজ্জার ছোপ দেখব ভেবেছিলুম। পরিবর্তে কঠিন একটি মুখভঙ্গী দেখতে হল। তিক্ত স্বরে অহল্যা বললে, 'ভালোবাসা!'

স্বল্পালোক ঘরে দীপ্ত দুটি অস্বাভাবিক চোখ জ্বলছে, চম্পকের পালকে সঞ্চরমান আঙুলগুলো দ্রুততর। তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছি ঝোপ ডিঙিয়ে, মাঠ পেরিয়ে তাঁবুর কাছাকাছি এসে স্বস্তি পেয়েছি। তীক্ষ্ণ-তিক্ত একটি স্বর তখনো কানে বাজছে, আর নহরের পাশে আহত, রুধিরাক্ত একটি লোককে ঈর্ষা করেছি। শুধু সন্দেহবশেই হয়ত ওমপ্রকাশ তাকে ছুরি মারেনি।

মাথায় চুবড়ি, কোলে হাঁস, অহল্যা পরদিন খুব ভোরে, প্রায় আলো ফোটার আগেই এল। পা দুটি কাঁপছে, কথা বলবার সময়ে গলাও। অসুখের দুর্বলতা এখনও যায়নি। দুগ্ধ নামিয়ে রেখেই বললে, 'আমাকে একটা চিঠির মুসাবিদা করে দিন সর্দারজী।'

'কী লিখতে হবে।'

'ও—ও যেন এখানে না আসে।'

'স্বামী ফিরে আসুক তুমি চাওনা?'

অহল্যা বললে, 'না। ওর কোনো পতা ছিল না, সেই ভালো ছিল। ঢের সুখে ছিলুম।'

ওকে কথা দিলুম, চিঠি খসড়া নিয়ে বিকেলেই ওদের বাড়ি যাব। চম্পকের দিকে আঙুল দেখিয়ে ঠাট্টা করে বললুম, 'ওর খোপটা এবার বিছানা থেকে সরিয়ে উঠোনের কাছে রেখে দিও।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে রুষ্টস্বরে অহল্যা বললে, 'কেন?'

একটু ভয় পেলুম। কোনোমতে জবাব দিলুম 'এমনি। ওমপ্রকাশ কি এতটা পছন্দ করবে।'

অহল্যা বললে, 'আমি ভয় পাইনে।'

কানাডা-ইঞ্জিনের ভাঙা-মোটা গলার আওয়াজ, আবার একটা গাড়ি এল। চঞ্চল হয়ে উঠেছিলুম, সম্পুরণ সিং উঠে গিয়ে দেখে এসে বললে, 'এ-গাড়ি মীরাট পর্যন্ত যাবে। ফ্রন্টিয়ার মেল আসতে এখনও

আধ ঘণ্টা দেরি আছে।' তিন-পোয়া-শেষ বোতলটা দেখিয়ে বললে, 'এটা ফুরোবার আগেই গল্পও ফুরোবে। বাকিটা শুনুন।'

বিকেলের অনেক আগেই সেদিন সূর্য ফেরার। তাঁবুটা থেকে থেকে থরথর কাঁপছে। ঝড় উঠেছে। খোলা মাঠের উপর দিয়ে হাঁটছি, এক একটা ঝাপটায় কাত করে ফেলছে, তবু চলছি। নেশার টান এমনই।

অহল্যাদের দরজায় গিয়ে টোকা দিলুম, সাড়া নেই। জঞ্জাল, গোবর, ছাইয়ের গাদা, তারই উপর দিয়ে বাড়িটার চারপাশে ঘুরলুম। দিন নিবু-নিবু, এরই মধ্যে কখন শিলাবৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, মাথ বাঁচাতে একটা চালার নীচে দাঁড়াতে হল। শীতার্ত একটা কুকুর হঠাৎ কেঁদে উঠল, জানি না কখন ওর লেজ মাড়িয়ে দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে ওদের বাড়ির জানলার একটা পাল্লা খুলে গেল, চম্পকের হলদে ঠোঁট ছুটি দেখতে পেলুম। শিলাবৃষ্টি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গেলুম। চম্পকের ঠিক পিছেই এক জোড়া কালো চোখ, অন্ধকারে মনে হল ভীত।

ফিস ফিস করে অহল্যা বললে, 'কী চাই কী?'

তীব্র শীতে দাঁতে দাঁত লেগে যায়, বললুম 'চিঠিটা এনেছি।' হাত বাড়িয়ে ওকে দিতে গেলুম, ও নিলে না, ত্রস্ত স্বরে বললে, 'ছিঁড়ে ফেলুন ছিঁড়ে ফেলুন চিঠি। দরকার নেই।'

'দরকার নেই, অহল্যা?'

'না। ও আজ দুপুরে এসেছে।'

তবু বুঝি স্তম্ভিত কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিলুম। জানালার পাল্লাটা টেনে দিলে অহল্যা, ওর বিহ্বল-ব্যাকুল গলা শুনলুম, 'আর আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন চলে যান। ও হয়ত আপনাকে দেখে ফেলেছে। আপনি জানেন না ও কী শয়তান, কী নিষ্ঠুর। কী কী করে ঠিক নেই।'

কাপুরুষের মতো, দ্রুত পায়ে সেদিন পালিয়ে এসেছি। হাজার

হাজার হিম-ছোবল, কানের দুপাশে অগণন শিস। বিদ্যুতের আলোয় একটি ছুরি ঝলসানো, একটি ক্রূর-বিচিত্র হাসি দেখলুম।

তাঁবুর একটা দিক উড়ে গিয়েছিল, অনেক চেষ্টাতেও সেটা ঠিক করতে পারলুম না। খাটিয়ায় ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে সারারাত প্রায় জেগে কাটাতে হল। কাঁচা চামড়ার খোঁজে এখানে আসা, কিন্তু সে-চেষ্টা এ-কদিন বিন্দুমাত্র করিনি। তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনা নিয়েও বারবার নিজেকে প্রশ্ন করলুম, তবু কী মোহে এখানে পড়ে আছি।

আসবে না ভেবেছিলুম তাই অহল্যাকে পরদিন দেখে কম অবাক হইনি। ঝড় নেই, কিন্তু আকাশ এখনও কালো। মাঠের দিকে চেয়ে ওকে বললুম, 'এক রাতে কত ঘাসের ফুল ফুটেছে, দেখেছ। একেবারে ছেয়ে গেল।'

অহল্যা মৃদু গলায় বললে, 'ফুল নয়, বরফ।' পায়ের একটি পাতা অল্প একটু তুললে। দেখলুম সেখানে রক্তের চিহ্ন মাত্র নেই। বললুম, 'এই শীতেও হাঁসটাকে এনেছ?'

'ঘরে রেখে আসতে ভরসা হলনা।'

এতদিন লক্ষ্য করিনি আজ দেখলুম চম্পকের হলদে ঠোঁট দুটির উপর নিরীহ দুটি চোখ। সে-চোখে আতঙ্ক স্পষ্ট।

অহল্যা বললে, 'আমি যাই। ও হয়ত এসে পড়বে। হয়ত এসেছে আড়াল থেকে দেখছে।'

বাধা দিইনি। আরও ভালো করে কম্বল জড়িয়ে বিমূঢ়ের মতো খাটিয়ায় বসেছিলুম।

তখনও বেলা যায়নি, সেদিনই ওমপ্রকাশ এল। তাঁবুর বাইরে ছায়া পড়েনি, আকাশে আলো ছিলনা। যতদূর সম্ভব নিঃশব্দেই এসেছিল, তবু চমকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'কে?'

পরনে ডোরা কুর্তা আর ঢিলে পায়জামা, ওমপ্রকাশ ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছিল।

—'আমি। পরিচয় দিলে হয়ত চিনবেন। অহল্যা আমার স্ত্রী। এখানে তো সে প্রায়ই আসে, না?'

'সে তো দুধ দিতে।' নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছিলুম, নইলে কৈফিয়ত দিতে যাব কেন।

'দুধ দিতে।' স্পষ্ট দেখতে পাইনি, তবু ওমপ্রকাশের মুখে একটু হাসি খেলে গেল অনুভব করলুম।—'সে যাই হোক, আজ সন্ধ্যায় আমাদের ওখানে আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।'

'নিমন্ত্রণ? কিসের?' মনে আছে এই দুটি কথা বলতেও গলা কেঁপেছিল।

'বিশেষ কিছু না, ছোট-খাট একটা উৎসব। ঘরের ছেলে ফিরে এসেছে কিনা, তাই। ভাবনা করবেন না, খাবারের বন্দোবস্ত ভালই হয়েছে। রোস্ট হবে—আপনি রোস্ট ভালবাসেন সর্দারজী?'

হালকা গলা, যেন ঠাট্টা করছে। তবু ভরসা পেলুম না, খুঁজে খুঁজে দেশলাই বের করে আলো জ্বাললুম। ওমপ্রকাশ হাসছে।

তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে ওকে কী বলতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ আমার সারাদেহ শক্ত, সমস্ত কথা রুদ্ধ হয়ে গেল। ওর হাতের দিকে এতক্ষণ তাকাইনি, দেখিনি ওর করতল কাঁচা রক্তে ভেসে যাচ্ছে, রক্তের ছিটে ওর পায়জামা-কুর্তাতেও।

আড়ষ্ট স্বরে বলতে গেলুম, 'তুমি কি…অহল্যাকে—'

বাকিটা ওমপ্রকাশই অনুমান করে নিলে। কুৎসিত একটা হাসি কষের মতো যেন দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। —'হল না। ভুল ভেবেছেন। অহল্যাকে নয়, তার হাঁসটাকে এই শেষ করে আসছি। জোয়ান হাঁস, কী তাজা খুন দেখেছেন। ফিরে গিয়ে ওটাকে তন্দুরে চড়াব। আপনি খাবেন অহল্যাকেও খাওয়াব। সেটা আরও কড়া শাস্তি হবে, না?' আরেকটু এগিয়ে আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে ওমপ্রকাশ বললে, 'যাকে বিছানায় তুলেছিল, তার মাংস চাকতে অহল্যার মন্দ লাগবে না, কী বলেন!'

যেমন এসেছিল, তেমনি অকস্মাৎ ওমপ্রকাশ সেদিন অন্তর্হিত হয়েছিল। কখন খেয়াল করিনি। সেদিনই তাঁবু গুটিয়ে পালিয়ে এসেছি। ঘোর দুর্যোগ, ট্রেন যেন থর থর করে কাঁপছে, সমস্ত রাত্রি এক ফোঁটা ঘুমোতে পারিনি, কী দেখেছি জানেন? রক্তাক্ত ছুরি-হাতে ওমপ্রকাশ ওর ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে, অহল্যা খেতে বসেছে। টপ-টপ চোখের জলে একটি ঝলসানো মাংসের টুকরো নোন্‌তা হয়ে উঠেছে। বাবুসা'ব, সেই থেকে কোনদিন রোস্ট খেতে পারিনি।

জানালার শার্সি কেঁপে উঠল। গমগম ব্যস্ততা, কুলি আর ভেণ্ডারেরা হঠাৎ জেগে উঠেছে। বাইরে উঁকি দিয়ে সম্পূরণ সিং বললে, 'ফ্রন্টিয়ার মেল এল।'

ছায়াম্বর

ঠিক বেলা পাঁচটায় মোটরটা এসে সদরে দাঁড়ায়। হর্ন নেই, ধীরে ধীরে থামে বলে ব্রেক-কষা বা রাস্তায় চাকা-ঘষার শব্দটুকুও শোনা যায়। এক জোড়া জুতো সিঁড়ি বেয়ে সোজা উপরে উঠে আসে, পুরু কালো পর্দার বাইরে ভারি কিন্তু ভীরু গলা শোনা যায় "আসতে পারি?"

সে-গলা প্রণতির চেনা। তাড়াতাড়ি সুব্রতর শিয়র থেকে উঠে দাঁড়ায়। চুলে চিরুনি বুলনোর দরকার নেই, মুখে গলায় হালকা পাউডার ছিটনোরও না, কেননা ঘর অন্ধকার, বেশবাস বিন্যস্ত থাকলেই হল।

মৃদু গলায় বলে, "আসুন ডাক্তার মৈত্র।"

বিকেলের মরা আলো ঘরের মধ্যে একবার ঝলসে উঠেই মিলিয়ে যায়। বোঝা যায় ডাক্তার ঘরে এসেছে। পর্দাটা যথা স্থানে ফিরে একটু একটু কাঁপতে থাকে। অন্ধকারে লুপ্তপ্রায় বিছানা থেকে দুর্বল কিন্তু তীক্ষ্ণ একটি কণ্ঠ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে "কে।"

ডাক্তার বলে, "আমি"। পরিচিত ঘর, অন্ধকারেই সে তার নিজের আসনটি খুঁজে পায়। বিছানার পাশেই ছোট টেবিলে মেজার গ্লাস, শিশি, মালিশের কৌটো রাখা, তবু ঠোকর খেতে হয় না। আগের মতোই ভারি কিন্তু ধীর গলায় ডাক্তার আবার বলে "আমি। তুমি ঘুমোওনি সুব্রত?"

বিরক্তি-সূচক একটা অস্ফুট শব্দ করে সুব্রত পাশ ফেরে বোঝা যায়। বালিশে মুখ গুঁজে অস্থির ভাবে মাথা নেড়ে নেড়ে বলে, "না, না, না। তুমি আবার কেন এলে ডাক্তার।"

এই প্রশ্নে ডাক্তার কি একটু চমকে যায়। কয়েকটি মুহূর্ত একটি

টিক্‌টিক্‌-ঘড়ির কাঁটা ঘুরে ঘুরে সেকেণ্ডের জপমালা গোণে। তারপর কৈফিয়তের সুরে ডাক্তারকে বলতে শোনা যায়, "তোমাকে দেখতে আসি সুব্রত।"

বালিশে মুখ ঢাকা, সুব্রত একটি খিলখিল হাসি চাপতে চেষ্টা করছে কিনা, স্পষ্ট বোঝা যায় না। শুধু তার পরিহাস-লঘু গলা শোনা যায় "এই অন্ধকারে আমাকে কি দেখা যায় ডাক্তার ?"

ডাক্তার বুঝি বলতে চেয়েছিল, 'অন্ধকার তো তোমার ভালোর জন্যেই সুব্রত,' কিন্তু কানের পাশে অস্বস্তিতে কয়েকগাছি চুড়ি রিনরিন করে উঠতেই ডাক্তার থেমে গেল। এই অন্ধকারে প্রণতির উপস্থিতিটা অশরীরী অনুভূতিমাত্র ছিল, এতক্ষণে সেটা যেন শ্রুতিতে, অন্তত একটি ইন্দ্রিয়ের বোধে, ধরা দিয়েছে।

আবার সেই ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ কিছুক্ষণ। এতক্ষণে অন্ধকারও যেন ফিকে হয়ে এসেছে, ছায়া-ছায়া একটি দেহ-রেখা দেখা যাচ্ছে বিছানায়, কুণ্ঠিত, সন্দিগ্ধ, লুপ্তপ্রায়। আপন মনেই মাথা নেড়ে নেড়ে সুব্রত বলে গেল, "অন্ধকারে আমাকে দেখা যায় না। আয়্যাম্‌ কিং অব্‌ দি ডার্ক চেম্বার। তুমি "রাজা" পড়েছ ডাক্তার।"

ডাক্তার পড়েনি। পড়লেও এ-প্রশ্নের জবাব দিত না।

অনেকক্ষণ কারো কোনো কথা শোনা গেল না। ঘর শুধু অন্ধ নয়, বোবাও। একটি ঘড়ি, দু'টি চুড়ি, আর সব চুপ। সেই চুড়ির দিকে চেয়ে ডাক্তার বললে, "এই ওষুধগুলোই রিপীট হবে। প্রেস-কৃপশনটা দিন, লোকের হাতে পাঠিয়ে দেব।"

বিছানার নীচে থেকে প্রণতি একটা কাগজ বার করে ডাক্তারের হাতে তুলে দিল। আঙুলে আঙুলে ঠেকল। চমকে উঠল ডাক্তার। এতক্ষণ যাকে চোখে দেখতে পায়নি, তাকে স্পর্শ দিয়ে দেখল।

আর বসে থাকার অর্থ নেই। ডাক্তার খানিকটা বসে থেকে শুধু মেঝেয় জুতো ঘষল।

"তুমি একটু ঘুমোও সুব্রত। ভয়ে নেই, ভাল হয়ে যাবে।"

বিড়বিড় করে সুব্রত বলল, "ম্যাকবেথ শ্যাল স্লীপ নো মোর। আর ভয়ের কথা কী বলছ। ভয় আমি পাইনে। কাউকে না, কিছুতেই না। এই যে তুমি রোজ রোজ আসছ, তবু কি ভয় পেয়েছি ডাক্তার?" বলতে বলতে হেসে উঠল সুব্রত, মুখভঙ্গি অন্ধকারে দেখা গেল না, কিন্তু তীক্ষ্ণ কয়েকটি তীর ডাক্তারের মর্মভেদ করে যেন সম্মুখের দেয়ালে বিদ্ধ হল।

তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাইরে এল। এসেও কেন যে বিমূঢ় এক পল দাঁড়িয়ে রইল সে নিজেই জানেনা। সে কি ভেবেছিল যতক্ষণ কপাল আর ঘাড়ের ঘাম রুমালে মুছবে ততক্ষণ পর্দার ওপাশে খালি দুটি পা এসে দাঁড়াবে, দু'গাছি হালকা চুড়ি বেজে উঠবে, আর মৃদু একটি কণ্ঠ বলবে, "আবার আসবেন?"

সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে যায় ডাক্তার। মোটরে—ইঞ্জিনটা স্পর্শমাত্র প্রাণ পেয়ে থর থর কাঁপে। মুখ বাড়িয়ে ডাক্তার একবার হয়ত উপরে, জানলার দিকে তাকায়, কিন্তু চোখ ফিরিয়ে নেয় সঙ্গে সঙ্গে। ভুলটা টের পেতে কিছুমাত্র দেরি হয় না। জানলার ফোকরও যে পুরু পর্দায় ঢাকা—আশ্চর্য, এই কথাটা তার মনে ছিল না?

সুব্রত অন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এই নিষ্ঠুর সত্যটা প্রণতি প্রথম বিশ্বাস করেনি, ওষুধের পর ওষুধ বদলেছে, ডাক্তারের পর ডাক্তার। দীর্ঘ আট বছর ধরে দিনের পর দিন নিজেকে শুধুই সান্ত্বনা দেবার কাহিনী।

আজও যখন হঠাৎ একদিন বিকেলে আকাশ মেঘে ছেয়ে আসে, রাস্তার শীর্ণ উপবাসী নিমগাছটার ন্যাড়া ডাল থেকে থেকে কাঁপে, একরাশ হু হু ধুলো সহসা এই সদাস্তিমিত ঘরে ঢুকে পড়ে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে, ছায়া ঘনতর হয়, পাতা ছিঁড়ে গিয়ে ক্যালেণ্ডারটা পৃথিবীর বয়স নিমেষে দু'মাস বাড়িয়ে দেয়, প্রণতি জানালার পাট

বন্ধ করবে কি, পর্দাটাকেও এক পাশে সরিয়ে আনে, দু'টি শিকের ফাঁকে মুখখানি চেপে ধ'রে ফোঁটা ফোঁটা বর্ষার জল মাখে। ঝাপসা আকাশটা এখন কোনো নিকূল নদীর মতো, তার ওপারে চেয়ে থেকে থেকে আরও একটি দিনের কথা মনে পড়ে।

রেজেস্ট্রি অফিস থেকে ওরা নাম সই করে যেদিন রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল সেদিনও এমনি ঝর্ঝর বৃষ্টি। প্রণতি জিজ্ঞাসা করেছিল, "এবার?"

সুব্রত বলেছিল, "চল আমাদের বাড়ি। বাবা মাকে সব বলি। তাঁরা নিশ্চয়ই আশীর্বাদ করবেন।"

আশীর্বাদ তাঁরা করেননি। ফের যখন ওরা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল তখনও টিপ টিপ থামেনি। প্রণতিকে আবার বলতে হল, "এবার?"

"চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।" ওদের বাড়ির সিঁড়ি পর্যন্ত প্রণতিকে পৌঁছে দিয়েছিল সুব্রত। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত টেনে নিয়ে বলেছিল, "আজ আর ওপরে যাব না। তুমি একটি মাস আমাকে সময় দাও, লক্ষীটি।"

এক মাস নয়, সব ব্যবস্থা করতে সুব্রতের মাত্র কুড়ি দিন সময় লেগেছিল। ছোট কলেজে একশো পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরি। ছোট্ট, দেড়খানা ঘরের বাসা, চল্লিশ টাকা ভাড়া। ওরা যেদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে এ-বাসায় উঠে এসেছিল, আশ্চর্য, সেদিনও সারা বিকেল জুড়ে একটানা একঘেয়ে বৃষ্টি। কয়েকটি বর্ষার সন্ধ্যার সঙ্গে প্রণতির জীবনের কয়েকটি ঘটনা এমন একাঙ্গ মিশে আছে!

অল্প আয়, ভালো চলত না। আপন লোকেরা সবাই পর হয়ে গিয়েছিলেন, কেউ কোনো খোঁজ খবর নেননি। মাঝে মাঝে সুব্রতর কয়েকজন বন্ধু আসত, কয়েকটি সিঁদুর-সন্ধ্যা চায়ের ধোঁয়া আর সিগারেটের ছাইয়ে ভরে দিয়ে চলে যেত।

তারপর তাদের ও আসা যাওয়া কমে গেল। কেননা আয় বাড়াতে

সুব্রতকে তিনটে ট্যুইশনি নিতে হল। রাত জেগে লিখতে হত ছাত্রবন্ধু নোট। উদয়াস্ত, অস্তোদয় খাটুনি। প্রাণ রাখার প্রাণান্ত প্রয়াস। বিকিয়ে গেল অনেক সোনা-সকাল, অভ্র-দুপুর, রুপোলী বিকেল,—সব কটি মুহূর্ত যেন এক দুশ্ছেদ্য লৌহরাত্রির দেয়ালে বন্দী।

একদিন দুপুরে দু'টো না বাজতেই সুব্রত কলেজ থেকে ফিরে এল। প্রণতির মনে আছে সেদিন সিঁড়িতে অকাল পদধ্বনি শুনে সে অবাক হয়ে ছিল। "এত তাড়াতাড়ি ফিরলে তুমি? আজ কলেজে কম কাজ ছিল বুঝি। চল না একটু ঘুরে আসি। কতদিন আমি এই ঘরখানি ছেড়ে বেরোইনি বল তো।"

উত্তর না দিয়ে সুব্রত সটান বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। চোখ দু'টি ঢেকে বলেছিল, 'মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা। একটু টিপে দেবে?'

শুধু যন্ত্রণা নয়, জ্বর। সেই জ্বর একুশদিন পর ছেড়েছিল। আবার কাজে যোগ দিল সুব্রত, কিন্তু আগেকার মতো উৎসাহে নয়। ট্যুইশনি ছাড়ল দু'টো, নোট লেখাও। বলত, "বেশি খাটতে পারিনে। পিঠে লাগে। চোখ জ্বালা করে।"

প্রণতি বলল, "কাজ নেই খেটে। এই টাকাতেই আমি বেশ চালিয়ে নিতে পারব।"

সেই নীল-নির্মল শীতের বিকেলটির কথা প্রণতির মনে আছে। সুব্রত ঘরে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিল, হঠাৎ চেঁচিয়ে ওকে ডাকল, "শোন, শোন, শুনে যাও।"

তাড়াতাড়ি চায়ের কেতলি ফেলে উঠে এল প্রণতি। শুনল বিরক্ত গলায় সুব্রত বলছে, "জানালাটা বন্ধ করে রেখেছ কেন। কিছু পড়তে পারছি না।"

জানালা বন্ধ? অবাক হয়ে প্রণতি একবার খোলা জানালা একবার সুব্রতর চোখের দিকে চেয়ে রইল। প্রতিবাদ করতেও ভুলে গেল। অসহায়ের মতো সুব্রত কেবলি থেকে থেকে মাথা নাড়ছে আর বলছে "খুলে দাও, খুলে দাও। কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

"ভাল করে একবার চেয়ে দেখ তো!"

চোখ রগড়ে উঠে বসল সুব্রত, বলল, "তাইতো। অথচ আমি ভেবে—ছিলাম ঠাণ্ডা কালো অন্ধকারে ঘরখানা ভরে গেছে? একটা অক্ষরও পড়তে পারছিলাম না। কিন্তু বৃষ্টি নেমেছে তুমি দেখতে পাওনি প্রণতি? জলের ঝাপ্টায় এখুনি ভেসে যাবে যে। বন্ধ করে দাও, বন্ধ করে দাও জানালা।"

জানালার সামনে গিয়ে প্রণতি বলল, "কোথায় বৃষ্টি। এখনো আকাশে রোদ রয়েছে, তুমি দেখতে পাওনা?"

"রোদ?" করুণ ভয়ার্ত চীৎকার করে সুব্রত বলল, "এখনও রোদ আছে? অথচ আমি যে স্পষ্ট দেখছি প্রণতি, সব ঝাপসা হয়ে গেছে, ফোঁটা ফোঁটা জল চুইয়ে পড়ছে আকাশ থেকে।"

"দেখছ?"

সুব্রত নিজেকেই নিজে বিশ্বাস-না করা গলায় বলল, "দেখছি।"

প্রণতি আর কোনো কথা না বলে, এতটুকু শব্দ না করে জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছিল।

ডাক্তার এল, ওষুধ। অন্য ডাক্তার, অন্য ওষুধ। কিন্তু সুব্রতর দৃষ্টিভ্রম ঘুচল না। অসুখটাই ধরতে পারলেন না কেউ। একজন ক্যালশিয়মের ঘাটতি ভেবে ইনজেকশনের পর ইনজেকশন দিলেন, আর ভিটামিনের অভাব মেটাতে পুষ্টিকর খাবারের ফর্দ; সেই ফর্দ হাতে করে প্রণতি কিছুক্ষণ পাথরের মতো চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কেননা কলেজ থেকে দীর্ঘ ছুটি নিতে হয়েছে সুব্রতকে, শেষ ট্যুইশানিও গেছে। একদিন শুধু প্রণতি জিজ্ঞাসা করেছিল, "বাবা মাকে খবর দিই?"

নিমীলিত চোখ দুটির নীচে সুব্রতর চিবুকের পেশি কঠিনতর হয়েছিল। বলেছিল, "না।"

সুব্রত অন্ধ হয়ে যাবে।

স্পেশালিস্ট ডাক্তার ফিস ফিস করে এই নিষ্ঠুর নিয়তির কথা

প্রণতিকে জানিয়েছিল। আশ্চর্য, তবু ভিজিটের টাকা তুলে দেবার সময় প্রণতির হাত কাঁপেনি।

স্পেশালিস্ট ভরসা দিয়েছিলেন, "একবারে হতাশ হবেন না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে অপ্‌টিক্যাল নার্ভগুলো সব মরে গেছে বটে, তবে পরিপূর্ণ বিশ্রাম পেলে আবার সব ঠিক হতেও পারে। এ রোগের ডাক্তার হল সময়, আর ওষুধ হল রেস্ট এ্যাণ্ড পীস।"

দরজা জানালায় গাঢ় কালো ঢাকনা, সুব্রতর দৃষ্টি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে, আলোতে যন্ত্রণা বাড়ে।

এই ডাক্তার এসেছে আরও অনেক পর। চাপা-ভয় ছায়া-ঘরে ক্ষয়িষ্ণুদৃষ্টি রোগীর শিয়রে ইতিমধ্যে প্রণতির একটি পর একটি দিন কেটে গেছে, মাসের পর মাস। সাহায্য ক্লান্ত বন্ধুরা ততদিনে বিনা নোটিসে আসা-যাওয়া বন্ধ করেছে, কলেজ কর্তৃপক্ষ হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। নোট প্রকাশকেরা মাঝে যে টাকা পাঠায়, তাতে কোনোমতে বাড়ি ভাড়া কুলোয় হয়ত ঠিকে ঝির মাইনেও, তার বেশি কিছু না। চিকিৎসা বন্ধ, প্রণতির নিজস্ব গোপন সঞ্চয়ও খালি হয়ে এসেছিল।

এই ডাক্তার এসেছিল তারও পর। সেদিনও হর্ন দেয়নি, সরাসরি উপরে এসে দরজায় টোকা দিয়েছিল।

ঠিকে ঝিটা তখন কী কাজে বাইরে। পর্দা ঠেলে প্রণতিকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। মিনিট খানেক কোন কথা বলেনি ডাক্তার। নির্নিমেষ নির্লজ্জ চোখে প্রণতিকে খুঁটিয়ে দেখেছিল।

সেই দৃষ্টি প্রণতি সহ্য করতে পারেনি। আগন্তুকের মুখের উপরই দরজা বন্ধ করে দেবে কিনা হয়ত একবার তাও ভেবেছে। এই তো ক'মাস মাত্র বাইরের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে নিরালোক ঘরখানায় অহরহ আশ্রয় নিয়েছে প্রণতি, এরই মধ্যে কি এমন পাণ্ডুরতা এসেছে তার কপোলে যে পুরুষের চোখে সে আর শায়া-শাড়ি মোড়া

রক্ত মাংসের মেয়ে নয়, ডিসেকশন টেবিলের নাবরণ একটা শরীর মাত্র ?

"এটা কি সুব্রত রায়ের বাসা ?" ডাক্তারের প্রশ্নে বিমূঢ়তা কেটেছে, কোনমতে "হ্যাঁ আসুন" বলে এক রকম ছুটে প্রণতি কের ঘরে গিয়ে লুকিয়েছে।

ডাক্তারও এসেছে পিছে পিছে। "কে ?" হঠাৎ ঘুম ভেঙে সুব্রত চেঁচিয়ে উঠেছিল। ওর বিছানার এক পাশে বসে ডাক্তার বলে, "আমাকে চিনতে পারলে না সুব্রত ? অথচ কলেজে একসঙ্গে কত দিন—"

সুব্রতর শীর্ণ মুখে একটু হাসির আভাস দেখা যায়। ধীরে ধীরে বলে, "বোধহয় চিনেছি। দেখতে তো ভালো পাই না। শুধু গলা শুনে বুঝতে চেষ্টা করি। তুমি বিলেত থেকে কবে ফিরলে অরুণ ?"

ডাক্তার বলে, "বেশি না, এই তো ক'মাস। তোমার খবর অনেক দিন খোঁজ করেও পাইনি। সেদিন একজন ঠিকানাটা দিলে। আজই আসবার ফুরসত পেলুম। তোমার কিছু হয়নি সুব্রত, আমার হাতে যখন পড়েছ তখন সেরে যাবে। আর ভয় নেই।"

আস্তে আস্তে সুব্রত বলল, "না আর ভয় নেই।"

সুব্রতকে অনেকক্ষণ ধরে ডাক্তার পরীক্ষা করেছিল। বহু দিন পরে আলো জ্বলেছিল সেই ঠাণ্ডা বন্ধ ঘরে। পরীক্ষা শেষে ডাক্তার বলেছিল, "সুইচটা অফ করে দিন। এখানে ভাল বুঝতে পারলাম না। ওকে একদিন আমার চেম্বারে নিয়ে যেতে হবে।"

দু' বন্ধুর গল্প সেদিন সহজে ফুরোয়নি। ডাক্তার উঠে দাঁড়াতেই সুব্রত বলেছিল, "একটু ব'স, কত দিন পরে দেখা হল। একেবারে একা থাকি।"

একা থাকি। সুব্রতর কণ্ঠস্বরের হাহাকারটুকু হয়ত ডাক্তারের অন্তর স্পর্শ করে থাকবে। অন্তত তখনই উঠতে পারেননি।

প্রণতি রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে জানালার সমুখে দাঁড়িয়েছে। শুনল সুব্রত জিজ্ঞাসা করছে, "ডাক্তার এখনও বিয়ে করনি ?"

এই প্রশ্নের উত্তর শুনতে প্রণতিও কেন—যে আড়চোখে ফিরে চেয়েছিল সে নিজেও জানে না।

"ন্—নাঃ, কই আর করলুম।" অতি মৃদু নিরুত্তাপ গলায় ডাক্তার বললে। সেই নিস্পৃহতায় প্রণতি চমকে উঠেছিল। সুব্রত যদি জিজ্ঞাসা করত, "আজ বিকেলে চা খাওনি ?" ডাক্তার তখনও হয়ত এই সুরেই বলত, "নাঃ, কই আর খেলুম।"

"বিয়ে করলে না কেন।"

তরল গলায় ডাক্তার বলে উঠল, "আই'ড হ্যাভ্ বীন এ ফুল ইফ আই ডিড্।" তবু প্রণতির মনে হ'ল, এই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিটা খাঁটি নয়, এই চমকটুকু ধার করা।

সুব্রত তবু ছাড়ল না।

"তোমার সেই দূর সম্পর্কের আত্মীয়াটির খবর কী ডাক্তার। তাকে বিয়ে করলে না কেন ?"

স্পষ্টই বোঝা যায়, ডাক্তার অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। প্রণতি ওকে রুমাল বার করে একবার কপাল ঘাড় মুছতে দেখল।

"ও—কথা থাক, সুব্রত।"

বাইরে শেষ-বর্ষার ধারা অল্প অল্প হাওয়া। সুব্রত বলল, "বল না, ডাক্তার একটু শুনি।" বাদলা আবহাওয়ায় পুরনো বয়ম খুলে যেন আচার খেতে ছেলে মানুষী সাধ হয়েছে সুব্রতর, ডাক্তারের মানা শুনবে না।—"কোথায় যাবে এমন দিনে। আর একটু ব'স। কী হল সেই মেয়েটির।"

ভীত কুণ্ঠিত চোখে এ-প্রসঙ্গে অনিচ্ছুক ডাক্তার বার বার ওর দিকে চেয়েছে, প্রণতি টের পেয়েছে। তারপর বহু প্রয়াসে ডাক্তার যেন একটা রূঢ় কথা বলবে বলে নিজেকে তৈরি করে নিল। "এতদিনে নিশ্চয়ই সু-জননী, সু-গৃহিনী হয়েছে। টাকার অভাবে এক বছর

আমি মেডিক্যাল ফাইন্যাল দিতে পারিনি। সে বছরই সে মোটা মাইনের একজন সিনিয়র কেরানীকে বিয়ে করল। কেননা—' অত্যন্ত তিক্তস্বরে ডাক্তার বলল ; "কেননা, আমার সামনে তখন নিশ্চিত কোন কেরীয়র নেই। মেয়েরা শুধু সিকিওরিটি চায় সুব্রত, সেদিন ওকে আমি তা দিতে পারিনি।"

"শুধু সিকিওরিটি চায় ?"

নিজের কথা বলে ফেলতে পেরে ডাক্তারের সঙ্কোচ কেটে গেছে, ঈষৎ-উত্তেজিত কণ্ঠে তাকে বলতে শোনা গেল, "হোআট্ এলস।" বলেই চকিতে জানালার দিকে তাকাল, সেখানে তখনও একটি নতমুখ মেয়ে, ডাক্তার হয়ত বুঝল কথাটি স্থানোচিত হল না, তাড়াতাড়ি যোগ করে দিলে, "অন্তত সেই মেয়েটি চেয়েছিল।"

"সেই মেয়েরই সব মেয়ে নয় ডাক্তার।"

অন্ধপ্রায় স্বামীর সঙ্গে থাকবে বলে এই প্রায়ান্ধ, আলো-নিঙড়ানো ঘরখানি যে বেছে নিয়েছে, সেই মেয়েটিকে ডাক্তার আরেকবার দেখে নিল। অতি ধীরে বলল, "হয়ত নয়।"

তারপর সেদিন যত কথা বলেছে ডাক্তার, সব সুব্রতর সঙ্গেই, কিন্তু বার বার এদিকে ফিরে ফিরে চেয়েছে। দৃষ্টি যার লোপ পেতে বসেছে, তার সঙ্গে কথা বলার সুবিধা এই, অন্য দিকে চোখ ফেরালেও সে টের পায় না।

সেদিন অত সহজেই সুব্রত ডাক্তারকে রেহাই দেয়নি। একটু পরেই আবার বলল, "পাশ করবার পরে তুমি হাউস সার্জন হয়ে একটি নার্সের প্রেমে পড়েছিলে, গুজব শুনেছিলুম। তাকে বিয়ে করলে না কেন।"

আবার সঙ্কোচ বোধ করল ডাক্তার। তাড়াতাড়ি বলল, "ওসব কথাথাক সুব্রত সে-ই আমাকে বিয়ে করতে চায়নি! আমার সুপারিশ চেয়েছিল। মিশত কিছু সুবিধে পাওয়ায় জন্যে, কেননা, ও তখনও টেম্পোরারি।" একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ডাক্তার যোগ করল, "অবশ্য

এসব আমি অনেক দেরিতে বুঝতে পারি। বুঝে আর ভুল করিনি। সুপারিশ ওকে করেছিলুম, কিন্তু তিন মাস পরেই একটা গ্র্যান্ট নিয়ে বিলেত চলে গেলুম।”

এ-ঘরে আর দাঁড়িয়ে থাকা অশোভন, ওরা যখন লক্ষ্য করছে না সেই অবসরে প্রণতি পা টিপে টিপে পাশের আধখানা ঘরে গেল, যেটা কিছুদিন আগেও ছিল সুব্রতর লেখাপড়া করবার ঘর। গেল, কিন্তু একেবারে দূরে যেতে পারল না। দরজাটা একটু ফাঁকই রইল, তার ওপাশে উৎসুক দু'টি কান।

“আর কোন মেয়ে তোমার জীবনে আসেনি?”

হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল ডাক্তার, এতক্ষণ কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মৃদু রেখেই কথা বলছিল, এবার বাঁধ ভাঙল। কাঁধ কুঞ্চন-প্রসারণের একটা ভঙ্গী করে বলল, “লট্‌স। জাহাজেই একটি মধ্যবয়সী মেয়ের সংস্পর্শে এসেছিলুম, নাম বলব না, তিনি আবার ছোটখাটো একজন দেশনেত্রী। ইনি কী চেয়েছিলেন জানো? না, টাকা নয়, প্রতিষ্ঠা নয়, অকারণে ভদ্রমহিলার বদনাম দেব না,—তাঁর নজর ছিল শুধু আমার পেশীবহুল শরীরটার দিকে।”

বলে একটু বিরতি দিয়েছিল ডাক্তার, সেই অবসরে সুব্রত কথাটার কুৎসিত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে নির্বাক হয়ে গেল। কিন্তু ডাক্তারকে তখন নেশায় পেয়েছে, চোখ দু'টির পাতা দপ-দপ করছে। অতি দ্রুত কিন্তু চাপা গলায় বলে গেল, “আরো ঢের হয়েছে। বাট্‌ আই টেল য়ু দে'র জস্ট এ লট্‌ অব ডাল্‌, ডলড্‌-আপ থিংস;—চীপ, চীপ্‌, চীপ্‌।”

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সুব্রত, আর সেই অবিশ্বাসের ভঙ্গীটাই যেন সম্বিৎ ফিরিয়ে দিল ডাক্তারের, হঠাৎ-ক্ষুব্ধ মানুষটি আবার নিস্তেজ হয়ে পড়ল, লজ্জিত মুখে বারবার চাইল পাশের ঘরের দরজার দিকে, ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “এবার আমি।”

“একটু চা খেয়ে যাবেন না?” প্রণতি বেরিয়ে এসেছে খুপরি থেকে।

শুকনো গলা, একটু ভিজিয়ে নিলে মন্দ হত না, ডাক্তার তবু বললে, "না।"

মুখে দু চারটে উপদেশ ডাক্তার সেদিনই দিয়ে গিয়েছিল। রোগীকে খুব সাবধানে রাখতে হবে। বেশি নড়া-চড়া বারণ। কোন রকম উত্তেজনা না। আর—

শেষ কথাটা খুব কাছাকাছি এসে, খুব চাপা গলায় ডাক্তার বলেছিল: "এ্যাণ্ড য়ু মাস্ট হ্যাভ নো বেবীজ।"

লজ্জায় কান-লাল প্রণতি তাড়াতাড়ি ঘরে চলে গিয়েছিল। পর্দার বাইরে ডাক্তারের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে নি। পুরু ভুরুর নীচে চোখ দুটি এমন কেন ডাক্তারের, সবাইকে কেন অপারেশন টেবিলের রোগী ভাবে! বাইরে গিয়েও ডাক্তার এক-মুহূর্ত দরজার সমুখে কেন দাঁড়িয়েছিল কে জানে। সে কি ভেবেছিল আজকের প্রগ্‌লভতার জন্যে প্রণতির কাছে মার্জনা চেয়ে নেবে?

তারপর থেকে প্রতিদিন রাস্তায় ওদের দরজার সামনে ডাক্তারের গাড়ি থেমেছে। ঠিক পাঁচটায় পরিচিত জুতোর শব্দ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে, দরজায় সন্তর্পণ টোকা দিয়ে বলে, "আসতে পারি।"

ভিতর থেকেই প্রণতি সাড়া দেয়, "আসুন।"

ডাক্তার বলে, "কেমন আছ, সুব্রত।"

পাশ ফিরে তিক্ত গলায় সুব্রত বলে, "ভাল, ভাল, ভাল।"

আশ্বাস দিয়ে ডাক্তার বলে, "অত নার্ভাস হয়ে পড়েছ কেন। শীতকালটা আসুক। আমাদের হাসপাতালেই তোমার অপারেশন হবে। একেবারে সেরে যাবে, দেখো।"

তারপর অনেকক্ষণ কোন কথা থাকে না। সুব্রতর কোন সাড়া নেই, মনে হয় বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। অস্পষ্ট আলোয় একটি বুকের নিয়মিত ওঠা-পড়া দেখা যায়।

কখন এক সময় ডাক্তার উঠে পড়ে, বারান্দায় একটু বা দাঁড়ায়; সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নামে।

ওদিকে ঘরের মধ্যে হঠাৎ সোজা হয়ে ব'সে সুব্রত জিজ্ঞাসা করে, "ডাক্তার চলে গেল, প্রণতি ?"

প্রণতি বলে, "গেল। তুমি টের পেয়েছ ?"

সুব্রত বলে, "পেয়েছি। টের যে আমি সব পাই প্রণতি, সব দেখতে পাই। দেয়ালে পিঁপড়ে সারি বেঁধে চলে, তাও অনুভব করি।"

আন্দাজে আন্দাজে হাত বাড়িয়ে প্রণতির ঠোঁট দু'টি ছুঁয়ে সুব্রত ফের বলে, "দেখতে পাই শুনে হাসছ বুঝি ? সত্যিই আমি দেখতে পাই, বোধ হয় তোমাদের সকলের চেয়ে, আর সকলের চেয়ে একটু বেশিই পাই। চোখ দুটি দিয়ে যায় প্রণতি, সে নেহাৎ ওপর-ওপর দেখা। রেটিনা, লেন্স, ক্যামেরার কারসাজি, ফোটোগ্রাফির মতো শস্তা। আমার এখনকার দেখা কিন্তু অনেক গভীর, স্পষ্ট। ছোঁয়ায় দেখি, শোনায় দেখি, গন্ধে দেখি, স্বাদে।"

বলতে বলতে সুব্রত যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল, কাঠ হয়ে গেল প্রণতি। এখুনি বুঝি সুব্রত ওকে বুকের ওপরে টেনে নেবে, অধীর আঙুলে কপালের চুল সরিয়ে, স্বেদবিন্দুর স্বাদ নিয়ে, কণ্ঠতটের ঘ্রাণ নিয়ে ওর নতুন ধরনের দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা দেবে।

থর-থর কাঁপতে থাকল প্রণতি, ভয়ে বুকের ভিতরটাও যেন হিম হয়ে গেল। অন্ধোপম মানুষটির আবেগও বুঝি অন্ধ, প্রণতি একবার ভাবল বাধা দেবে, পারল না, বাইরে সোঁ সোঁ হাওয়ার ক্রুদ্ধ মুষ্টি, জানলার পাল্লা থেকে থেকে কাঁপে, সব প্রতিরোধ বুঝি এখুনি লুটিয়ে পড়বে, বিজুরির ছুরিতে অন্ধকারের কলজে থেকে ফিনকি দিয়ে ম্লান পিঙ্গল রক্ত সারা ঘরে ছড়িয়ে যাবে। বিবশ প্রণতি আতঙ্কে, সুখে, দু'হাতে চোখ ঢেকে দিলে।

সে-ঝড়ও থামল। শ্রান্ত সুব্রত ফের বালিশে মাথা রেখে ওর গালে তখনো তপ্ত একটি হাত রাখল। আস্তে আস্তে বলল, "ডাক্তারের কথা ভেবে ভয় পেয়েছ না ? ডাক্তারদের সব মানা মানতে নেই।"

মেঘ-শ্রাবণ, শিউলি-আশ্বিন কেটে গিয়ে হিম-আঘ্রাণ আসে। ঋতুরঙ্গের কোন ছাপ এই ছায়া-ঘরখানিতে পড়ে না। বড় জোর কোনোদিন বৃষ্টির ফোঁটায় জানালার পর্দা ভিজে ওঠে, কোনোদিন বা হালকা হাওয়ায় একটু কাঁপে, কোনোদিন গাঢ় নীল সোনালী একটু ছোঁয়া লাগে।

হর্ন না বাজিয়ে গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে আর দিনের পর দিন সিঁড়ি ভেঙে ডাক্তার একদিন যে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে, সাহস পায়। প্রেসক্রিপশনটা প্রণতির হাতে তুলে দিতে গিয়ে সেদিনও আঙুলে আঙুলে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায়, কিন্তু ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গেই হাত সরিয়ে নেয় না মৃদু অলক্ষ্যে একটু চাপ দেয়।

সাড়া আসে না। পাবে সে আশাও সে করেনি। কী বলবে আগে কিছু ঠিক করে রেখেছিল, এখন এই মুহূর্তে সে সব মনে পড়ল না, ভাঙা ভাঙা গলায় কোনোমতে বলল, "একটু বাইরে আসবেন?"

এই ঘরে শুধু ছমছম ভয়, সব কিছু মৃত, নিরনুভূতি, এখানে কথা নেই, ডাক্তার তাই প্রণতিকে বাইরে ডেকেছে।

"বাইরে!"

ওই একটি শব্দে ডাক্তার উত্তর পেয়ে গেল। ঘরে আলো থাকলে দেখতে পেত প্রণতির মুখে এতটুকু রক্ত নেই। ওর হাতে রাখা হাতখানিতে কাঁটা দিয়েছে অনুভব করল, পাছে সেই হিম-আতঙ্ক তার দেহেও সঞ্চারিত হয়, সেই ভয়েই বুঝি ডাক্তার তাড়াতাড়ি হাতখানি ছেড়ে দিল।

আস্তে আস্তে পর্দা ঠেলে বাইরে এল ডাক্তার। সেই সিঁড়ি আবার ধাপে ধাপে নামা, সদরে নিঃশব্দ সেই গাড়ি।

ডাক্তার চলে যাবার পর ঘড়ি-টিকটিক-প্রাণ ঘরখানিতে প্রথম সুব্রতর স্বর শোনা গেল।

"ডাক্তার কী বলছিল প্রণতি।"

প্রণতি কিছু বলল না, সুব্রত নিজেই ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল, "আমি জানি কী। তোমাকে বাইরে যেতে বলেছিল।"

দীর্ঘ নিস্তব্ধতার পর সুব্রত আবার বলল, "গেলেই পারতে। কেন তুমি নিজেকে এভাবে শেষ করে দিচ্ছ প্রণতি। কেন এই কানা ঘরে দিনরাত নিজেকে লুকিয়ে রেখেছ। আমার জন্যে? কিন্তু একটিবার আলোর মুখ দেখলে ক্ষতি কী।"

মাটির দিকে চোখ রেখে প্রণতি আস্তে আস্তে শব্দগুলোকে জিভ দিয়ে প্রায় না ছুঁয়ে বলল, "ভয় করে।"

"ভয়, এত ভয়?" নিঃশব্দ একটা হাসিতে সুব্রতর মুখের রেখা কুঞ্চিত হয়ে উঠল,—"তুমি জান না, ভয়ের এই বাড়াবাড়িটাকেই আমার বেশী ভয়।"

পরদিন ডাক্তার আসেননি। বিকেল গড়িয়ে ডুবে গেল সন্ধ্যার দহে, কিন্তু সদরে পরিচিত গাড়িটি দাঁড়াল না, দীর্ঘ দু'বছরের অভ্যাসে ছেদ পড়ল।

"প্রণতি।"

প্রণতি মুখ ফিরিয়ে বিছানার দিকে তাকাল।

"জানালার পাশে কী করছ। আজ সারা বিকেল একবারও তো আমার কাছে এসে বসলে না।"

সুব্রতর শিয়রে এসে বসল প্রণতি।

"মাথায় বড়ো যন্ত্রণা। একটু টিপে দেবে?"

শিরা-ওঠা কপালে কয়েকটি কোমল আঙুল ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হতে থাকল, রাত্রি বাড়ছে। রাস্তায় হঠাৎ হর্ন শুনে প্রণতির হাত পলকের জন্যে থেমেছিল। সুব্রত বলল, "থামলে কেন। ডাক্তার নয়। ডাক্তারের গাড়ির তো হর্ন বাজে না।"

লজ্জায় প্রণতি মাটিতে মিশে যেতে চাইল।

তবু যতবার সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেল, ততবার আড়ষ্ট

হয়ে উঠল প্রণতি, আর কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে থাকল, আজ যেন না আসে, আর যেন না আসে।

ওর মনের কথাটি পড়ে নিয়ে সুব্রত যেন বলল, "তুমি যা ভাবছ তা নয়, ডাক্তারকে তুমি ভুল বুঝেছ। এ ঘর ছেড়ে বেরোও না, একটা রোগীর বিছানার সঙ্গে দিনরাত লেগে রয়েছ, তোমার শরীর—মনের পক্ষে এ ভাল নয়। ধৃতরাষ্ট্রের জন্যে গান্ধারী চোখে ঠুলি পরেছিলেন, এ নজীর পুরাণেই মানায়।"

একটু থামল সুব্রত। অনেক পরে আবার বলল, "ডাক্তারকে আমি অনেক দিন থেকে চিনি। মেয়েদের কাছে এলেই সর্দি লেগে যাবার মতো মন ওর নয়। অনেক মেয়ে ওর জীবনে এসেছে কিন্তু কী আশ্চর্য জানো, কোন মেয়েই ওর মনে ছাপ রাখতে পারেনি।"

"কেউ না?" কখন আপনা থেকেই চুলে আঙুল বুলনো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, প্রণতি টের পায়নি। বলল, "কেউ না?"

সুব্রত বলল, "না। ও যা খোঁজে কোন মেয়ের মধ্যে তা পায়নি। দু'দিনেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শোননি, সেদিন বলছিল, চীপ্, চীপ্, চীপ্? কিন্তু এত জোর দিয়ে মাথা টিপছ কেন প্রণতি। তুমি কি ক্ষেপে গেলে।"

তারপর একদিন সুব্রতর পৃথিবী থেকে আলো একেবারে মুছে গেল।

ভিয়েনা থেকে স্পেশালিস্ট এসেছিলেন।

অপারেশনও হয়েছিল, কিন্তু সফল হয়নি। হাসপাতাল থেকে ওরা গাড়ি করে সুব্রতকে ফের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল, ধরাধরি করে তুলে আনল সিঁড়ি বেয়ে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখল প্রণতি। ওরা চলে যেতে সুব্রত ইশারায় প্রণতিকে কাছে ডাকল। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথাটা মড়ার খুলির মত, বিবর্ণ ঠোঁট দুটির ফাঁকে সাদা দাঁতগুলো আরও বীভৎস। ঘর্ঘর ভাঙা গলায় সুব্রত বলল, "হল না প্রণতি, শেষ বাজিও হেরে গেলুম।"

প্রণতির হাত দুটি নিয়ে মুখের উপরে রেখেছে সুব্রত, শুকনো কড়া কাপড়ের খসখসে স্পর্শে প্রণতি আড়ষ্ট হয়ে গেছে। মৃদু কণ্ঠে সুব্রত বলল, "তোমাকে কখনও জানতে দিইনি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার আশা ছিল আবার আলো দেখব। তোমাকে দেখব।"

আলো দেখব। তোমাকে দেখব।

আহত একটি কণ্ঠ ছায়া-ঘরের দেয়াল থেকে দেয়ালে প্রতিহত হল। ধীর গাঢ় কণ্ঠে সুব্রত বলল, "চোখ দুটো গেল, কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রুতি-ঘ্রাণ-স্পর্শ, আর বোধগুলোও গেল না, কেন প্রণতি। তবে বুঝি বেঁচে থাকতে এত কষ্ট হত না।"

প্রণতি ভেবেছিল সান্ত্বনা দেবে, সুব্রতর কপালের ঘর্মাক্ত ভয়টুকু মুছে দিয়ে বলবে, "চুপ কর, চুপ কর," কিন্তু কথা ফুটল না, টের পেল ভরসার শেষ পাতাটিও খসে যেতে তার নিজের গায়েও কখন কাঁটা দিয়েছে ; সেই ছায়াছন্ন ঘরের ঠাণ্ডা মেঝেয়, নির্বাক, রোমাঞ্চিত, বসে রইল। পট্টিবাঁধা মিছে চোখ দুটির নীচে ঠোঁট কাঁপছে—প্রণতি শুনতে পেল সুব্রত বিড়বিড় করে বলছে, "কোন মানে নেই। এই নিরিন্দ্রিয় দেহে প্রাণটুকু পুষে রাখার কোনো মানে নেই।" না তারপর সেই দীর্ঘতম রাত্রিটি এল। শেষ রাত্রে রুদ্ধ বিকৃত গলায় আর্তনাদে প্রণতির ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ধড়মড় করে উঠে বসল। জানালার পর্দা কখন সরে গিয়েছিল। হলদে এক টুকরো জ্যোৎস্নায় ঘর ভরে গেছে। সুব্রতর মুখে ফেনা, মড়ার খুলির মত ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথাটা খাট থেকে সরে গিয়ে নীচে বুলছে, তলপেট প্রচণ্ড আক্ষেপে অস্থির, আলগা হাতের মুঠিতে চোখের মলমের শিশিটা। ঢাকনা খোলা। কাল এটাকে সরিয়ে রাখেনি প্রণতি ?

অস্ফুট একটা চীৎকার করে প্রণতি নীচে নেমে এল, মোড়ের মুখেই পাড়ার এক ডাক্তারের বাসা, দরজায় ঘন ঘন ঘা দিল। ডাক্তারকে জাগিয়ে তুলতে সময় কম লাগল না। চোখে-মুখে জল দিয়ে সব সরঞ্জাম নিয়ে তিনি যখন হাজির হলেন, ততক্ষণ সুব্রতর

মুখের ফেনা শুকিয়ে গেছে, তলপেট স্থির, মলমের কৌটোটা মুঠি থেকে খসে মেঝেয় গড়াচ্ছে।

তারপর একটু একটু করে আলো ফুটল আকাশে, সকাল হতে না হতেই লোকজন এল, প্রতিবেশী, পুলিস, খবরের কাগজের রিপোর্টার। নোট বই খুলে ওরা প্রণতির জবানী নিলে।

আবার ওরা ধরাধরি করে সুব্রতকে নামালো নীচে। মর্গের গাড়িটা একবার গর্জন করে উঠেই রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রয়োজন নেই, তবু পর্দাগুলো টেনে দিল প্রণতি। খাটের পায়া ধরে নিশ্চল হয়ে বসে রইল।

সদরে হর্নহীন গাড়িটা এসে দাঁড়ানোর আভাস পাওয়া গেল আরও অনেক পরে। সিঁড়ি বেয়ে এক জোড়া জুতো উপরে উঠে আসছে।

দেহ আড়ষ্ট তবু কোনো মতে থরথর পায়ে উঠে প্রণতি দরজায় খিল তুলে দিল।

কবাটে টোকে। মৃদু কণ্ঠ, "দরজা খুলুন প্রণতি দেবী।" ডাক্তারের গলা। এসেছে।

আসবেই, প্রণতি জানত।

আবার করাঘাত। "দরজা খুলুন।"

প্রণতি তবু উঠল না, আরও শক্ত করে খাটের পায়া চেপে ধরল। ডাকুক ডাক্তার, ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে যাক, প্রণতি ওকে কিছুতে আজ এ ঘরে আসতে দিতে পারবে না। এই বিছানার আজ কোন নিশ্চক্ষু প্রহরী নেই, ডাক্তার ঢুকেই হয়ত নিষ্ঠুর হিংস্র হাতে পর্দাগুলো সরিয়ে দেবে, হয়ত—বা ছিঁড়ে ফেলবে, এতদিনের চুপ-চাপ অপেক্ষার শোধ নেবে। রক্তের মতো গলগল স্রোতে ভেসে যাবে এই চোর কুঠুরি। সেই আলোয় কাকে দেখবে ডাক্তার। ছমছম চির গোধূলি ঘরে যার হাতে হাত ঠেকলে কেঁপে উঠত, দেখবে সেই রহস্য-

ময়ী কোথাও নেই। অন্ধকার ঘুচলেই যে মেয়েটিকে ডাক্তার দেখে ফেলবে সেও নিতান্ত সাধারণ। নার্সের মতো, দেশনেত্রীর মতো। দূর সম্পর্কের সেই আত্মীয়ার মতো দেখবে, এও সামান্য, সুখলোলুপ, ডাক্তারের মানা না মানার লক্ষণ শরীরে স্পষ্ট।

কী করে প্রণতি দরজা খোলে।

হয় না

না, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ো না, ফুলটা তবে চাপা পড়ে যাবে। ঘাড়টা একটু এলিয়ে দাও, বেশি না একটু-ই। এইবার দেখা যাচ্ছে। সবটা না, সবটা দেখা গেলে ভালোও দেখাত না, কয়েকটি পাপড়িই যথেষ্ট। গোটা ফুল নয়, ফুলের আভাস। কিন্তু এভাবেই বা কতক্ষণ থাকা যবে? খানিক পরে ঘাড়ের গোড়া টনটন করবে।

পাশের বাড়ির বাগান থেকে প্রকাণ্ড একটা গন্ধরাজ সংগ্রহ করেছিল আরতি। আয়না হাতে নিয়ে ভিতরের দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিজেকে পরীক্ষা করছিল, আর বলছিল।

একবার বলল, দূর, দূর, সুবিধের হয়নি। শাদা ফুলে আবার চেহারা খোলে নাকি। এর চেয়ে লাল একটা ফুল পেলে বেশ হত! খুলত। কিন্তু ওর চোখে না। কী যে পছন্দ বাবুর চড়া রং দু-চোখে দেখতে পারে না। টকটকে লাল কিছু দেখলে যেন খেপে যায়। আর ওর পছন্দ হবে না এই ভয়ে খয়েরি রঙের ছাপা শাড়িটা ছুঁয়েও দেখতে পেলাম না একদিন। কেনা হল বাক্সের কোণেই পড়ে রইল। কী মুশকিল দেখ তো, খাব আমার আপন রুচি মতো, কিন্তু পবার রুচি পরের, বিশেষ করে মেয়েদের বেলায়। ওর কেমন লাগবে, ওই এক ভাবনা। ওর, ওর, ওর।

ভেংচে-ভেংচেই বলল আরতি, তবে মনে-মনে। লাল নয়, গোলাপি নয়, খয়েরি নয়, পরতে হবে কিনা এই ছাই রঙের শাড়ি। শাড়ি না ছাই। প'রে—প'রে সুতো-সুদ্ধ ফ্যাঁসফেঁসে হয়ে এসেছে। আর মোটে দু-ধোপ, তার পরেই ওটাকে বিদায় দেব। কিনব বাসন, কিনব কাপ-ডিশ। সেই কাপেই সরোজকে চা খাওয়াব।

ছোট্টো করে একটা টিপ পরল আরতি। কপালের ঠিক

মাঝখানেই হল তো? কে জানে। এক হাতে আয়না, তাও আবার ঝাপসা, উঁচু করে ধরে কত আর সাজগোজ করি। কনুইয়ের কাছটা টনটন করে। একটা বড়ো আয়না যদি থাকত, বেশ হত। সেটা দেয়ালে ঝুলত, ঠিক ততটা উঁচুতে, যতটা হলে গলা, কি ধরো, ব্লাউজের বর্ডার শুরু হয়েছে! আরও ভালো হত সেটা যদি নিচু একটা টেবিলের সঙ্গে ফিট করা থাকত।

এবার আরতি ছোট্টো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে সব আর এ বাসায়, এই ছিট-বেড়া আর টিনের চালের ঘরে হয় না। হতেও পারে, অন্য কোথাও। এই শহরেই লেভেল ক্রসিংটার উত্তরে, কোনো একটা পরিচ্ছন্ন পাড়ায়। কী যেন নাম সেই পাড়াটার, সেখানে সরোজ বলছিল, সেএকটা দু-কামরার ফ্ল্যাট নেবে?

সুর্মাদানটা হাতে নিয়ে আরতি জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে লোভটাকে মুছল। ততদিন আর কী, ততদিন, হাত টনটন করে করুক, আয়নাটা তুলে তুলে টিপ পরি আর সুর্মা আঁকি আর চুল বাঁধি। যাবে কোনদিন চোখে কাঠিটা বিঁধে! তখন চোখ-গেল পাখির মতো কাতরাতে হবে। সরোজ ফিরেও চাইবে না। আর চোখে গেলে, সে চাইল কিনা, তা-ও জানব না। ভাবনারও যদি কিছু মাথা—মুণ্ডু থাকে! বরং ছাই রঙের শাড়িটাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরে দেখি। উপায় তো নেই, এটাকেই পরতে হবে। আমার ভালো না লাগুক, আর কারও চোখে না ধরুক, ওর তো ধরবে। অল্প-অল্প হেসে বলবে, 'ছাই চাপা আগুন!' কে জানে, মনের কথা বলে, না ঠাট্টা করে। দুষ্টুর মতো সর্বদাই ওর চোখ মিটমিট করে, ওকে বিশ্বাস নেই।

উঁহু, চোখ ঘুরিয়ে আয়নার ভিতরকার সখীকে আরতি বলল, অত পাউডার মেখো না, ওর চোখে ধরা পড়ে যাবে। আর গরমে যদি ঘেমে যাও তবে তো কেলেঙ্কারি। সাজগোজে অবশ্য ওর আপত্তি নেই, ওটা তো মেয়েদের ধর্ম। কিন্তু বাড়াবাড়িটা বরদাস্ত করতে পারে

না। প্রসাধন, ও বলে, রূপকে বাড়িয়ে তোলার জন্যে নয়, রূপটাকে দেখিয়ে দেবার জন্যে। পড়ার বইয়ের দরকারী লাইনের নিচে আমরা যেমন দাগ দিই। প্রসাধন আসলে সেই দাগ দেওয়ার কাজ।

গানের গলা নয়, কাউকে শোনাবার মতো নয়, তবে নিজের কানে মন্দ লাগে না। আরতি গুনগুন করে শুনে—শেখা একটা গানের দু-লাইন গাইল। গেয়েই থামল। থাক, মা কী মনে করবে। সেই বিকেল থেকে উনুনের পাশে গিয়ে বসেছে, নিমকি ভাজছে সরোজের জন্যে। মুখটা তেতে উঠেছে। তবু আমাকে ঘেঁষতে দেয়নি। উনুনের আঁচে নাকি আমার চেহারা নষ্ট হবে। কিন্তু এটা-ওটা এগিয়ে তো দিতে পারি। মা-র উৎসাহ দেখে ভালোও লাগে, হাসিও পায়। এর মধ্যে তিনবার জিজ্ঞাসা করেছে, 'সরোজ এসেছে? এখনও এল না যে? আসবে তো ঠিক? তোকে কবে বলেছে বল তো?'

আরে, আসবে, আসবে, আসবে মাথাব্যথা কি মা-র? নাই যদি আসবে, তবে আজ বিকেলে আকাশটা হালকা মেঘে-মেঘে এমন সুন্দর হল কেন? ফুরফুরে হাওয়ায় পুকুরটার সবুজ জল কাঁপছে কেন। আসবেই।

তিন-চারটে বাস ছেড়ে তবে একটার পাদানিতে দাঁড়াতে হয়, অফিস-টাইমে যা ভিড়। এখন তো সবে সাড়ে-পাঁচটা কি ছ'টা—সাড়ে-ছ'টার মধ্যে নিশ্চয় আসবে। এ পাড়া থেকে যারা ওদিকে গিয়েছে, তারাও তো কেউ এখনও ফেরেনি।

ফুল-তোলা একটা ঢাকনি এনে আরতি নিচু টুলটার উপরে বিছিয়ে দিল। বাঃ, এইবার বেশ হয়েছে। চোখের যন্ত্রণা নিয়ে, আঙুলে ছুঁচ ফুটিয়েও যত্ন করে ফুলগুলো তুলেছিলাম, সেই যন্ত্রণা এবার সার্থক হয়েছে। আরও অনেক ঢাকনি আর পর্দা থাকত যদি আমাদের? তবে ঘরের যেখানে-যেখানে এখন অভাব খোঁচা-খোঁচা চোখা-চোখা হয়ে আছে, চোখে বিঁধছে, সব ঢেকে-ঢুকে রাখতাম।

ঢাকতাম ওই রং-ওঠা তোরঙ্গটা আর কাঁঠালকাঠের তক্তপোশে পাতা ময়লা বিছানা।

অত ঢাকাঢাকির দরকারই বা কী। সরোজের কাছে লুকানো তো কিচ্ছু নেই। ও তো নাড়ি-নক্ষত্র সব জানে। সেই শেয়ালদা স্টেশনে যখন পড়ে ছিলাম, তখন থেকে জানে। আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে গেল, খুঁজে খুঁজে গেল সেখানে। কে আমার ভাইকে বই বাঁধাইয়ের কাজে ঢুকিয়ে দিল? লোকের জন্মে হাঁটাহাঁটি করে এই কলোনিতে চালাঘরটা তুলে দিল কে? আমি যে প্রাইমারি ইস্কুলটায় চাকরি পেয়েছি, কার চেষ্টায়?

সরোজের। মা বলেন, অমন ছেলে হয় না। আরতি আপন মনেই একটু হাসল। কেমন ছেলে, আমি তো জানি। বড়ো মন, চওড়া বুক, সব ঠিক। লোকের ভালো করবে বলে ঝাঁপিয়েও পড়ে। মা শুধু ওইটুকুই দেখেছেন। রাগটুকু তো দেখেননি বাবুর। ধর্মতলার সেই চায়ের দোকানে আমার জন্মে একদিন আধঘণ্টা বসে থাকতে হয়েছিল বলে কী রাগ! আমি এ-কথা বলি, সে-কথা বলি, সাড়াই দেয় না। শেষে আলগোছে টেবিলের নিচে হাত দিয়ে একটা চিমটি কাটলাম। তখন হেসে ফেলল। আমাদের সিনেমা দেখার কথা ছিল। বলল, আর পাঁচ মিনিট দেরি হলে নাকি টিকিট দুটো ছিঁড়ে ফেলে দিত।

কেন দেরি হবে না? আমার কি গাড়ি আছে। সেই তো বাসই ভরসা। তোমরা পুরুষ মানুষ, গায়ে জোর আছে, কারও ছোঁয়া লাগলে গায়ে ফোসকা পড়ে না, তোমরাও বাসের পর বাস ছেড়ে দাও। আমরা মেয়ে হয়ে কী করে উঠি? একটু বিবেচনা করতে হয়।

বাইরে কার জুতোর শব্দ পেয়ে আরতি বারান্দায় গেল। অন্য লোক। ফিরে এল ঘরে। আর, এই যে তুমিও আজ দেরি করছ, আমি রাগ করতে পারি না? যদি মান করি, যদি কথা না বলি?

না, না, আজ ওসব মান-টান করে সময় নষ্ট কোরো না। অনেক দরকারী কথা আছে। এবার তো আমাদের বাসা হয়েছে, ভাইটাও কোনোরকমে নিজের পায়ে দাড়িয়েছে। আজ আমাদের ব্যাপারটার একটা কিছু ঠিকঠাক করতে হবে। ও এলেই ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে যাব। কোথায় যাব, ওই পুকুরটার পাড়ে? ওখানে যে আড়াল নেই। দু-জনে রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে কথা বলব? না, না, পাড়ার লোক দেখবে। তার চেয়ে এই বারান্দাই ভালো। মা তো রান্নাঘর ছেড়ে সহজে নড়ছে না।

*　　　*　　　*　　　*

মা ঘুময়নি, ঘুমের ভান করে পড়ে আছে। চৌকাঠে দাঁড়িয়েই আরতি বুঝতে পারল।—সেই এতটুকু বয়স থেকে মায়ের পাশে শুয়ে আসছি তো, ওর ঘুম আমি বুঝি। ঘুমলে মা-র চেহারাই আলাদা হয়ে যায়। আর ওভাবে চিৎ হয়ে মা যে ঘুমতে পারে না, সেটা হয়তো ও নিজেও জানে না। তা ছাড়া আরও কয়েকটা লক্ষণ আছে।

জেগে আছে, আমি গিয়ে শুলেই কাছে সরে আসবে। তারপর জেরা শুরু করবে। মা বড়ো অবুঝ। এত অবুঝ কেন, আরতি ভাবল. কেন বোঝে না আমি এখন ক্লান্ত, খু-ব ক্লান্ত? এইমাত্র সরোজের সঙ্গে ঘুরে এলাম, তা কমসে-কম মাইল খানেক তো হেঁটেছি, হোঁচটই খেলাম দু-বার! ছাই রঙের শাড়িটার পাড় ছিঁড়ল, স্যাণ্ডালটার ষ্ট্র্যাপ খুলল। এখন কি অত-শত কথার জবাব দিতে পারি?

ছাই রঙের শাড়িটা খুলে আরতি সযত্নে ভাঁজ করে রাখল। তুলে নিল সর্বদার কাপড়টা। আয়নাটা বাক্সের উপরেই আছে, কিন্তু মুখ দেখতে ইচ্ছে করল না। গরম লাগছে, বিশ্রী গরম লাগছে। এখন কলতলায় যাব, গায়ে না ঢালি, মাথায় জল ঢালব, ঠাণ্ডা হব। রান্নাঘরে গিয়ে দেখব, খাবার কিছু ঢাকা দেওয়া আছে কিনা। তখনও কি মা ঘুমবে না।

চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে-দিতে আরতি ভাবল, তুমি ঘুমলে কি না ঘুমলে, তাতে আমার বয়েই গেল। ঘুমোও বা না ঘুমোও, আমার মুখ থেকে একটি কথাও বার করতে পারছ না। বলব না, তার দুটি কারণ। এক, আমি ক্লান্ত। দুই, তোমাকে আমি হতাশ করতে চাই না। সারা বিকেল আজ তুমি উনুনের তাতে বসে চা জল খাবার করেছ, সরোজ আমাকে নিয়ে যখন বেড়াতে গেল, তখন হয়তো আহ্লাদে আটখানা হয়ে পাঁজি খুলে লগ্ন দেখেছ।

মা; তোমার বয়সই শুধু আমার চেয়ে বেশি। মানুষের মুখ দেখে কিছু টের পাও না। সংসারের রীতিনীতি বোঝ না।

কলতলা থেকে ফিরে বারান্দায় একটা টুল পেতে বসল আরতি, তবু ঘরে ঢুকল না। ওখানে ঢুকব কি, ওখানে হাজারো জেরা। মা তো আমার মুখ দেখে টেরই পায়নি যে, আজ সব শেষ করে দিয়ে এলাম। আমি যে ভীষণ ক্লান্ত, আমার যে কান্না পাচ্ছে, ঘুম পাচ্ছে, মা কি তার সামান্য আভাসও পেয়েছে।

পায়নি। পাবে না। আমি কিছু বলব না। অন্তত আজ না। আরতি বলে গেল মনে-মনে, দক্ষিণ আকাশের হলদে রঙের একটা তারাকে সাক্ষী রেখে যেন প্রতিজ্ঞা করল।

টুলেও বেশিক্ষণ বসা গেল না, মশা ভারি বিরক্ত করছে। তার চেয়ে বরং দাওয়ায় বসা যাক, পা মুড়ে। মা ওর মুখ দেখে কিছু টের পায়নি, কিন্তু আমি টের পেয়েছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম। কিছু একটা হয়েছে। কথা প্রথম দিকে সহজভাবেই বলতে চেষ্টা করছিল বটে, নিমকিও ভেঙে-ভেঙে খাচ্ছিল, কিন্তু চা আধ-পেয়ালা অবধি শেষ করে বাকিটা যখন খেতে ভুলে গেল, মনে করিয়ে দিলুম, তখন এক চুমুকে ঢকঢক করে সবটা শরবতের মতো শেষ করল, তখনই আমার খটকা লেগেছিল। দু-একটা কথার উত্তরও যেন

এলোমেলোভাবে দিল। মনে হল, মন দিয়ে শোনেইনি। তখন ওকে ডেকে নিয়ে বললাম, চলো। বেড়াতে যাই। মাকে বললাম মা আমরা একটু ঘুরতে যাচ্ছি। মা বলল, যা, বেশি দেরি করিস না। আমি জানতাম, করলেও মা কিছু মনে করবে না।

বেড়াতে গিয়ে কী ঘটেছিল, আরতি মনে-মনে গুছিয়ে নিল ওরা পাশাপাশি অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিল। তখন দু-একটা বাজে কথা বলেছে মাত্র। তারপর সেই বাগানটা পাওয়া গেল বটগাছটার সেই বাঁধানো বেদি। একেবারে নিরিবিলি।

আরতি বলল, 'এইবার আমাকে বলো।'

সরোজ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল—'কী বলব।'

'মিছে কথা বোলো না। আমি জানি, তোমার একটা কিছু হয়েছে।' হাই তুলেছিল সরোজ। নির্বিকার, উদাসীন ভঙ্গি, একটু বা কঠিন। 'কিছু হয়নি, আমি এখান থেকে চলে যাব। ঠিক করে ফেলেছি।

'কোথায় যাবে।'

'অন্তত এই বাংলাদেশের বাইরে তো বটেই। এখানে আমার আর ভালো লাগছে না।,

'কী হয়েছে।' আরতি ওর হাত ধরেছে, 'আমাকে বলো।'

'কিছু না, বলছি তো।'

'তুমি লুকোচ্ছ।'

এতক্ষণ তবু সংযত ছিল সরোজের ভঙ্গি, হঠাৎ উঠে পড়ে সে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। 'দেখ, আমি লুকোইনি, বরং লুকিয়েছ তুমি।'

'আমি!'

'তুমি! আমি বলতে চাইনি। তুমি জোর করলে বলেই বলছি। আমার এসব কথায় রুচি ছিল না।'

'ভনিতা রাখো। কী লুকিয়েছি আমি, কী তুমি জেনেছ, আমাকে বলতেই হবে।'

ধীর গম্ভীর স্বরে সরোজ বলল, 'লুকিয়েছ তোমার অতীত।'

'লুকিয়েছি? তুমি জানতে না, আমরা কত গরীব। জানতে না গ্রাম থেকে এসে স্টেশনেই তিন মাস ছিলাম?'

সরোজ বলেছে, 'জানতাম। শুধু জানতাম না, তুমি—তুমি আমি যা ভেবেছিলাম তা নও।'

'নই?'

'না। দেশ ছেড়ে আসবার আগে তোমাকে ওরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। দু-মাস ওদের হাতে ছিলে। শেষে কোনোমতে ছাড়া পেয়ে মা-র কাছে ফিরেছ, এখানে পালিয়ে এসেছ।'

'আর?'

'আর?' সরোজ শূন্যদৃষ্টিতে চেয়েছে। 'না, আর কিছুই নেই।' বলতে বলতে সে যেন অবসন্ন হয়ে ফের বেদিতেই বসে পড়ল, অত্যন্ত ব্যথিত সুরের বলল, 'কেন তোমরা আরও কয়েক মাস আগে চলে এলে না আরতি, অনেকেই তো এসেছিল! তবে তো এই সর্বনাশ হত না।'

'না।' আরতি ধীরে ধীরে বলেছে, 'হত না। সরোজ, তুমি তা হলে একটি পবিত্র কুমারীই পেতে।'

সরোজ যেন একটু অপ্রতিভ হয়েছে। 'তুমি ঠাট্টা করছ। তুমি জানো আমার নিজের কোনো সংস্কার নেই। কিন্তু আমার দিদি—'

'না, না, তাঁকে ঠকানো ঠিক নয়।'

'তুমি আমাকে কেবলই ভুল বুঝছ। তোমাদের গ্রামেরই একটি লোকের সঙ্গে সেদিন দিদির দেখা হয়েছিল।'

'স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে তিনিই খবরটা দিলেন?'

'না, না, ঠিক সেভাবে নয়। কথায় কথায় হঠাৎ বললেন। বিশিষ্ট ভদ্রলোক, তিনি আমাদের কথাটাও জানেন না। তুমি জানো না আরতি, সেই থেকে আমি কী যন্ত্রনার মধ্যে আছি। তুমি একবার শুধু বলো, যা শুনেছি তা মিথ্যে।'

দাঁতে ঠোঁট চেপে আরতি বলেছে, 'না, মিথ্যে নয়। বর্ণে-বর্ণে সত্যি। তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো।'

আর কোনো কথা ছিল না, আরতি দ্রুত পায়ে বাড়ি ফিরে এসেছে।

সরোজ পিছে-পিছে আসছিল, থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে চেয়ে আরতি বলেছে, 'তুমি আর এসে কী করবে। একা আমি ঠিক যেতে পারব। কিছু হবে না। আর'—আরতি এখানে জোর করে একটু হেসেছে। আর হলেই বা কী। আমার ইতিহাস তো জেনেই ফেলছ। নতুন করে আমার আর কী-ই বা ক্ষতি হতে পারে?

মা ঘরের মধ্যে ছটফট করছে, আরতি টের পেল। মা-র বড়ো ঔৎসুক্য, বড়ো ভয়। আরতি কেন এখনও ঘরে ঢুকছে না, কী করছে এখনও বারান্দায়? বড়ো ভয় মা-র, কারণে অকারণে ভয়। অনেক ঘা খেয়েছে কিনা, তাই কিছুতেই ভরসা পায় না; খালি ভয়। একরকমের স্নায়ুরোগ, ডাক্তারেরা বলেছেন।

মাকে কিছু বলা হবে না। আরতি পা টিপে টিপে ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। খোঁপার নিচে এটা কী। আরে সেই গন্ধরাজ ফুলটা যে। ওটা এখনও খসে পড়েনি? আরতি একবার ভাবলে, ওটাকে জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলি। আবার মনে হয়, যাক। ফুলই তো। কতটুকু বা পরমায়ু ওর। এমনিতেও ঝরবে, শুকোবে, বাসী হবে। থাক, খোঁপাতেই থাক। থাক না! আর এই তো শেষ ফুল পরা, এতো আর কোনোদিন আসবে না।

অথচ সরোজ এল, ঠিক দু'দিন পরেই, আর দুর্যোগ মাথায় করে সেদিনই যে, এত সকালেই যে, আসবে, কে জানত। শেষরাত থেকে বৃষ্টি হয়েছে, সকালেও খোলা নালীতে অবিরাম জলস্রোত, মেঘ কাটেনি। ঝাঁকে—ঝাঁকে বৃষ্টি আসছে। থেকে থেকে এক দল ঘোড়সওয়ার যেন দিগন্ত থেকে দিগন্তরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাচ্ছে। নিশান উড়িয়ে তাদের ধাওয়া করে চলে যাচ্ছে অশরীরী হাওয়া।

আরতি শুয়ে শুয়ে দেখছিল। এ হ'ল এমন দিন যেদিন পাখিরাও আকাশকে ভয় পায়, ওড়ে না। আজ ওড়েনি। দেখছিল, রাস্তার ধারের রোগা করবী গাছটা নুয়ে পড়ে যেন বুক দিয়ে আগলে, ওর বাচ্ছা ফুলগুলোকে ধরে রাখছে।

ঠিক তখনই সরোজ এল। আবার কেন এল ও। আজ কেন। কেন আমার সকালের আলস্যটুকু ভাঙল। এখনই উঠতে হবে, আঁচলটা ঠিক করতে হবে, শাড়িটাও বদলে—দূর, অত কেন। সব তো শেষ হয়েই গিয়েছে। যেভাবে আছি এইভাবেই যাই। দরজা খুলে আরতি বারান্দায় এল।

'ইস, একেবারে ভিজে গেছ।

শুধু ভিজে গিয়েছে বলেই নয়, সরোজকে খুব অগোছালোও লাগছিল। জামাটার বোতাম ও ঠিকমতো পরায়নি। আরতি বলল, 'গামছা এনে দিই, মাথা মোছো। ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে। চা করব?'

চা করতে যাবে বলেই বুঝি পিছন ফিরছিল, সরোজ ওর আঁচল টেনে ধরল। গাঢ় গলায় বলে উঠল, 'আরতি আমাকে ক্ষমা করো।'

'ছাড়ো। মা ও ঘরে আছেন। হঠাৎ এসে পড়তে পারে।'

সরোজ কিছু শুনল না, ওর হাত দুটি চেপে ধরে বলল, 'আমি ইতরের মতো ব্যবহার করেছি ক্ষমা করো।' আমি দুর্বল হয়ে পড়ছি, আরতি ভাবল। নিজের ভুলটা বুঝেছে ও, এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে এসেছে, আমি কী করি। সবটুকু জোর কুড়িয়ে নিয়ে আরতি বলল, 'স্থির হয়ে বোসো তো। এভাবে কথা হয় না।'

টুলে বসেছে সরোজ, দু-হাতের মধ্যে মাথা রেখেছে। শুকনো, ভাঙা ভাঙা গলায় বলছে, 'আমি এ দু-দিন ঘুমতে পারিনি।'

সতর্ক দৃষ্টিতে আরতি ভিতরের দিকে চাইল। মা আসছে না তো। এলেই বা। মা-ওতো খুশি হবে। এই দু-রাত্রি মা নিজেও তো ঘুময়নি। তবু একবার সন্তর্পণে লজ্জায় ভিতরের দিকে চেয়ে

আরতি সরোজের চুলে আঙুল ঢুকিয়ে বলল, 'ওভাবে বোলো না। আমিও তো ঘুমতে পারিনি। তুমি ফিরে তো এসেছ, এই ঢের। কত ভুলই তো আমাদের হয়।'

চোখ তুলে সরোজ বলল, 'কী বিশ্রী ভুল বলো তো? তুমি সেদিন বোধহয় খুব অভিমান করেছিলে, তাই ইচ্ছে করেই আমার ভুলটা ভেঙে দাওনি। আমি কিন্তু জেনেছি।'

আরতির গলা কেঁপে গেল। 'কী জেনেছ?'

'সেই ভদ্রলোককে দু-দিন ঘোরাঘুরি করে কাল সন্ধ্যার পরে ধরেছি। খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। বিশিষ্ট ভদ্রলোক, বলেছি তো মিথ্যে বলবেন না। তিনি কয়েকটা কথার পরেই টের পেলেন, মারাত্মক রকমের ভুল করেছেন। যে মেয়েটির কথা তিনি বলেছিলেন, তুমি সে নও। অপ্রস্তুত হয়ে বারবার ক্ষমা চাইলেন। আরতি, ক্ষমা চাইতে আজ সকালেই ছুটে এসেছি আমি। বলো ক্ষমা করেছ?'

'করেছি।' আরতি বলল মৃদুস্বরে, কিন্তু কখন একটু একটু করে পিছিয়ে গিয়েছে, নিজেও টের পায়নি।

'মাকে ডাকো। তাঁকেও বলি, প্রণাম করি।'

আরতি বলল, 'আজ থাক। সরোজ, এবার চা আনি?'

সেই গলায় কী ছিল, সরোজ চমকে উঠল, চাইল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। নিষ্প্রভ মুখ আরতির, একটু যেন কঠিন। আড়ষ্ট স্বরে সরোজ বলল, 'তোমার কী হল। তুমি কি সুখী হওনি?'

চোখ সরিয়ে আরতি জানালায় রাখল। 'এখনও মেঘ কাটেনি, সরোজ, তুমি কী করে ফিরবে। এখনও যে বৃষ্টি থামল না?'

এবার অসহিষ্ণু হয়ে সরোজ বলে উঠল, 'তুমি কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছ। খালি ফিরে যাবার কথা বলছ। তোমার অভিমান কি এখনও গেল না? বলছি তো, আবার বলছি, আমি ভুল করেছি। তোমার কোনো কলঙ্ক নেই।'

সরোজ উঠে দাঁড়াল। হয়তো আরও একবার আরতির হাত ছোঁবে বলে এক পা এগিয়েও গিয়েছিল, কিন্তু আরতি আরও দূরে সরে গেল, দাঁড়াল দু-ঘরের মাঝখানের চৌকাঠে। সরোজ দু-চোখ দিয়ে মিনতি করল, 'এসো।'

আস্তে আস্তে আরতি বলল, 'তা হয় না।' সরোজ আকুল গলায় বলে উঠল, 'কেন হয় না আরতি? আমার আর তো কোনো সন্দেহ নেই। সব মিথ্যে জেনেই তো আমি ছুটে এসেছি।' তেমনই দূরে দাঁড়িয়ে আরতি খুব নিচু কিন্তু স্পষ্ট স্বরে বলল, 'সেই জন্যেই তো আরও হয় না। সরোজ, তুমি সব মিথ্যে জেনেই এসেছ। সব সত্যি জেনেও তো আসতে পারোনি।'

বিষকণ্ঠ

সারা রাস্তা শুভেন্দুর অস্বস্তিতে কেটেছে। অভ্যর্থনা না-জানি কেমন হবে। দেড়বছরের পুরোনো জামাই। তবু বিয়ের পর এই প্রথম।

কিন্তু না শাঁখ না উলু। মোটঘাট নামাতে হল নিজেকেই। কোঁচার খুঁটে কপালের ঘাম মুছছে, চকিতের জন্যে দেখা গেল শাশুড়িকে। কিন্তু তিনি সামনে এলেন না, চট করে আড়ালে চলে গেলেন, বোধহয় ছেঁড়া শাড়িটা ঘুরিয়ে পরতে।

বিধবা শালা-বৌ সুহাস এল তারপর। শুকনো মুখ, রুক্ষ চুল, অল্প হেসে বললে, 'একটু বসো ভাই চা করে আনি।' আসলে কিন্তু ঢুকল গিয়ে কলঘরে। মুখটা হয়ত ঘষে নেবে ভিজে গামছায়, চুলে একবারটি চিরুনী বুলিয়ে নেবে।

ছোট শালী মিনি একটা জলচৌকি এনে দিলে, সতীর তখনও দেখা নেই।

'তোমার দিদি কোথায়', শুভেন্দু নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলে। 'আছে, আছে, বাপরে, কী ব্যস্ত।' বড়ো শালী কণিকা—এখনো যে ফ্রক পরে—চোখ ঘুরিয়ে বললে। হাত-পাখা নিয়ে কণি দাঁড়িয়েছে গা ঘেঁষে, শুভেন্দু জড়ো-সড়ো হয়ে গেল। এত বড়ো হয়েছে মেয়েটা, তবু লজ্জা নেই। হোক না জামাইবাবু, পুরুষ তো। ভালো করে খেতে-পরতে পায় না, শরীরের পুষ্টি নেই, কিন্তু ফ্রকে আর পোষ মানে না। মাথা নিচু করল শুভেন্দু, ঘামছিল, এবার নাইতে শুরু করল।

আড়ষ্ট স্বরে বলল, 'পাখাটা আমাকে দাও।' পায়ের নখগুলো কী বিশ্রী বড়ো হয়েছে কণির, কতদিন কাটেনা, কে জানে। হাঁটু

গোড়ালি অবধি ধুলো, মাঝে মাঝে কবেকার চর্মরোগের চাকা চাকা কালো দাগ। ঘৃণায় মনের ভেতরটা দড়ি-পাকানো হয়ে গেছে।

'পাখাটা আমাকে দাও,' শুভেন্দু আবার বললে। কণি ছাড়ল না, টানাটানিতে শুভেন্দুর একটা আঙুল ছড়ে গেল।

অস্ফুট স্বরে শুভেন্দু বললে, 'উঃ'। দুফোটা রক্ত জমেছিল, কণি মুখ নামিয়ে আনে।—দিন শুষে নিচ্ছি। এখুনি রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

গায়ে কাঁটা দিল শুভেন্দুর। রক্তশুদ্ধ হাতটা পকেটে পুরে দিয়েও স্বস্তি হল না। শাদা পাঞ্জাবীটার একাংশে লাল ছোপ লাগল, ভ্রূক্ষেপ করল না।

'তোমার দিদিকে ডেকে দাও' শুভেন্দু বললে মরিয়া হয়ে।

'দিদি এখন আসবে না', কণি আস্তে আস্তে বললে, 'দিদি ছাদে বসে কাঁদছে।'

'কাঁদছে? কেন?'

ফিস ফিস করে বললে, 'রোজ কাঁদে যে। আমি জানি। দু' একদিন পরে বাচ্ছা হবে কিনা, তাই।'

'বাচ্ছা হবে বলে কাঁদে!' বিমূঢ় গলায় শুভেন্দু বলল, যেন কণি দুর্বোধ্য কোনো ভাষায় কথা বলছে, সবটুকু মানে হৃদয়ঙ্গম হয়নি।

'কাঁদে। দিদি ভীষণ ভয় পেয়েছে যে। বলছে বাচ্ছাটা বাঁচবে না। কেন জামাইবাবু?'

ঠিক তখনি শাশুড়ি ঢুকলেন ঘরে, শুভেন্দু প্রণাম করবে বলে মাথা নোয়ালে। মৃণালিনী পা ছুঁতে দিলেন না, দু-পা সরে দাঁড়ালেন, শুভেন্দুর মাথায় রাখবেন বলে ডান হাত বাড়ালেন, শেষ পর্যন্ত ছুঁলেন না, আশীর্বাদের একটা ভঙ্গি করলেন মাত্র। শুভেন্দু ততক্ষণ দস্তা-রূপো মেশানো দুটো কাঁচা টাকা রেখেছে মেঝেয়, প্রণামী। শাশুড়ি চেয়ে দেখলেন, ইতস্তত করলেন।এক মুহূর্ত, তারপর নিচু হয়ে

কুড়িয়ে নিলেন টাকা দুটো, আঁচলে বাঁধলেন। এ-শাড়িটা আগেকার-টার চেয়ে হয়ত একটু ফরসা, কিন্তু এটাও এখানে ওখানে ছেঁড়া।

মামুলি দু-একটা কথা হয়ত হল, মৃণালিনী বললেন, 'যাই রান্নার বন্দোবস্ত দেখিগে।' শুভেন্দু টের পেল, চৌকাঠের ওপাশে গিয়ে তিনি চোখের ইশারায় ডাকলেন মিনিকে, আঁচলে-বাঁধা টাকা দুটোর একটি দিলেন মেয়ের হাতে।

—'মোড়ের দোকান থেকে চার আনার মিষ্টি নিয়ে আয়।'—'মোটে চার আনার মা? আমাদের জন্য কিছু আনব না?' দ্রুত কঠিন একটা চড়ের শব্দে আবদারের বাকিটুকু চাপা পড়ে গেল। চায়ের কাপ নিয়ে সুহাস, একটু পরে মিনিও ফিরল মিষ্টি নিয়ে। কড়া পাকের সন্দেশ, শুভেন্দু ভেঙে ভেঙে মুখে পুরলে; দু-একবার গলায় ঠেকে গেল, চায়ের রসে ভিজিয়ে নিলে। শূন্য ঠোঙাটা মিনি লেহন করছে জিভ্ দিয়ে, আর কণি—হাত-পাখা নিয়ে সে তখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে—লোলুপ দুটো চোখ নিয়ে। শুভেন্দু বার বার বিষম খেল, চা চলকে পড়ে জামাটা এখানে ওখানে ভিজে গেল।

'সতী কেমন আছে', মৃণালিনীকে সসঙ্কোচে একবার জিজ্ঞাসা করল। 'ভালই তো,' মৃণালিনী অন্য দিকে চেয়ে জবাব দিলেন।

'ভয়ের কিছু নেই ত।'

'ভয়? না ভয় কিসের?' মৃণালিনী বললে, কিন্তু স্বরে তেমন আশ্বাস ফুটল না। 'ডাক্তার নিয়মিত দেখছে তো।' প্রশ্নটা নিজের কানেই কর্কশ প্রায় অভদ্র শোনাল, কিন্তু মুখের কথা হল হাতের তীর ফেরানো যায় না। শুভেন্দু তাড়াতাড়ি জুড়ে দিল, 'এই প্রথমবার কি না?'

'প্রথমবার?' অস্ফুট কণ্ঠে মৃণলিনী কথাটার পুনরুক্তি করলেন, একটু শিউরেও উঠলেন হয়ত, শুভেন্দুর চোখে ধরা পড়ল না।

কতকটা স্বগত, কতকটা নিজেকে সান্ত্বনা দিতে, শুভেন্দু

বললে, 'ভয়ের কী আছে। এখানে আপনার কাছেই তো আছে। যত্ন হচ্ছে।'

'যত্ন, এখানে?' শুভেন্দুর কথা থেকেই দুটো শব্দ বেছে নিয়ে মৃণালিনী উত্তর দিলেন, কিন্তু তাতেই সব বলা হয়ে গেল। 'যত্ন, এখানে।'

আলাপের নড়বড়ে সাঁকোটা কেঁপে গেল, শুভেন্দু হাত বাড়িয়েও আরেকটা খুঁটির নাগাল পেল না।

রান্নার যোগাড় দেখতে মৃণালিনী একটু পরে উঠে গেলেন, তার পরও শুভেন্দু চুপচাপ বসে রইল। বেলা ফুরিয়ে এসেছে, ঘরের ভিতরটা এখন অন্ধকার-অন্ধকার। একটা মাকড়শা কখন থেকে দেওয়াল থেকে দেয়ালে নিঃশব্দ পায়ে ঘুরছে, জাল পাতার উপযুক্ত জায়গাটি না পেয়ে এখন একদৃষ্টে দেখছে শুভেন্দুকে। দিনের শেষ ভনভন মাছিটি এখনও অদৃশ্য হয়নি, এরই মধ্যে হঠাৎ কোথা থেকে উঠে এসেছে একঝাঁক মশা গুনগুন শুরু করেছে।

মিনি পান নিয়ে এল। শুভেন্দু বললে, 'খাইনা।' 'তবে সিগারেট জামাইবাবু? এনে দিই দোকান থেকে?' 'তাও না।' কোনো রকম নেশা শুভেন্দুর নেই। ফিক করে হেসে মিনি বললে, 'একটি ছাড়া! দিদিকে ছাড়া আপনার চলে না, না জামাইবাবু?' শুভেন্দু মনে মনে বলল, পাকা মেয়ে। মুখে বলল, 'কে বললে। এই তো আমি দিব্যি আছি।' ঘাড় বাঁকিয়ে মিনি বললে, 'ইস্ তা বই কি। দিদিকে দেখলে সাধু সন্ন্যাসীরই মন টলে যায়; তো আপনি! প্রতুলদাও বলতেন—'

'প্রতুলদা কে?' শুভেন্দু ভাঙা ভাঙা গলায় প্রশ্ন করল। গালে তর্জনী রেখে মিনি বলল, 'ও-মা, জানেন না? প্রতুলদা তো প্রায় রোজই—সেই দিদির বিয়ের আগে থেকেই—'
কথাটা শেষ হল না। কখন সুহাস বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল, নির্বাক চোখের কঠিন ইসারায় বাইরে টেনে নিয়ে গেল মিনিকে।

তখনও সতীর দেখা নেই। ছাদের কোনটিতে একলা বসে কান্না কি শেষ হয় নি।

শুধু বসে থেকে শুভেন্দু ক্লান্ত হয়ে উঠল। মশা তাড়াল একটা, হাই তুলল কয়েকবার, তারপর এক সময় নিজে থেকেই চোখ দুটো জড়িয়ে এল। ঘামে পাঞ্জাবীটা ভিজে উঠেছে, বিশেষ করে ঘাড়ের কাছে, ছড়ে-যাওয়া আঙুলটা টনটন করছে এতক্ষণ পরে, কণ্ঠার ঠিক নিচেই একটা ঘামাচিকে ঘিরে কয়েকটা মশা ভোজে বসেছে। ঘুম হল না, এক গ্লাস জল পেলে বড়ো ভালো হত।

বারান্দার দিকে যাবে, কিন্তু চৌকাঠের বাইরে পা দেওয়া হল না। দরজার বাইরে দীর্ঘ দুটি ছায়া, সে দুটিকে সনাক্ত করতেই শুভেন্দু বুঝি একবার বাইরে উঁকি দিল। বারান্দার কোণে দেয়ালের সঙ্গে প্রায় মিশে দাঁড়িয়ে আছে সুহাস, দ্বিতীয় জনকেও চিনতে শুভেন্দুর দেরি হল না। সতী।

'কী হবে, কী হবে, ভাই ঠাকুরঝি। আমার যে ভারি লজ্জা করছে। প্রতুল চৌধুরীর আসবার সময় যে প্রায় হয়ে এল।'

সুহাসের কণ্ঠ।

সতীর জবাবও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল। মৃদু গলা, ক্লান্ত, একটু বা শুকনো—'আমাকে কী করতে হবে।'

'শুভেন্দুবাবু এমন হঠাৎ এসে পড়েছেন, তাই। উনি কী ভাববেন ঠাকুরঝি ওর কাছে আছে আমি মুখ দেখাতে পারব না। তুমি প্রতুল চৌধুরী এলে ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আজকের মতো ফেরৎ পাঠিও তো ভাই।'

'লজ্জা আমারও আছে বৌদি। প্রতুল চৌধুরীর কাছে এ-শরীরটা দেখাতে পারব না।' সতীর গলা তেমনি শুকনো, ক্লান্ত, কিন্তু দৃঢ়তর।

'প্রতুল চৌধুরীকে শরীর দেখাতে লজ্জা, তোমার ঠাকুরঝি?' কী বিষ ছিল সুহাসের গলায়, সতী ছিটকে সরে এল এ-পাশে, একেবারে শুভেন্দুর মুখোমুখি। 'সতী, শোন।' শুভেন্দু ধীরকণ্ঠে বললে।

সতী মুখ তুললে। জল-টলটল নীল দুটি চোখ। এক-পা, দু-পা করে ঢুকল ঘরে। নিস্তেজ, চাপা স্বরে বলল, 'কী।'

'প্রতুল চৌধুরী কে, সতী।' ঠিক তখনই বাইরে কড়া নড়ে উঠল। ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে নয়, একটানা আগন্তুকের নিশ্চিত বিশ্বাস প্রবেশাধিকার সে পাবেই।

'যাও, দরজাটা খুলে দিয়ে এস।' 'না, না, আমি না।' আকুলকণ্ঠে সতী বলে উঠল, 'তুমি যাও, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।' বিস্ময় ফুটল শুভেন্দুর চোখে; তারপর ঠোঁট দুটি বিদ্রূপে বেঁকে গেল।—'বেশ, তবে আমিই যাই।'

যেতে হল না, দরজা ইতিমধ্যেই খুলে দিয়েছে সুহাস, যাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে, তার রোমশ মণিবন্ধের ঘড়িটি শুধু দেখা যায়।

'পথ ছাড় সুহাস।'

'আজ না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি আজ চলে যাও প্রতুল।'

আধো অন্ধকারে একটা দেশলাই জ্বলে উঠল, ক্ষণপরে সিগারেটের ধোঁয়ায় দুটি মানুষ নিমেষের জন্যে আড়াল হয়ে গেল। একটু পরেই তাদের আবার যখন দেখা গেল—একজনের কব্জিলগ্ন ঘড়ি আরেকজনের খোলা ঘোমটা মাথার আলগা খোঁপা—তখন প্রতুল চৌধুরী বলছে, 'তবে তুমি চল।'

'কোথায়?'

'ভয় নেই। ঠিক সময়েই ফিরিয়ে দিয়ে যাব। ওরা বাইরে ট্যাক্সিতে বসে আছে সুহাস, একা ফিরে গেলে আমার উপায় থাকবে না।'

'চল।' একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করল সুহাস, কাপড়টা ওখানে দাঁড়িয়েই ঠিকঠাক করে নিল।

'চল।'

—'এই বেশেই? জুতোও পরবে না?'

—'কাজ কী।' সুহাসের স্বরে একটা হিম-হাসির আভাস পাওয়া গেল শুধু। 'আমি আর দাঁড়াতে পারছি না প্রতুল, পা কাঁপছে। তাড়াতাড়ি চল।'

দরজার কাছে ন যযৌ ন তস্থৌ শুভেন্দু একটা গাড়ির দরজা খোলার, স্টার্ট নেওয়ার শব্দ শুনলে; গাড়িটা পিছনে যে কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া রেখে গেল, তার আঘ্রাণ নিলে বুক ভরে। তারপর ফিরে তাকাল। ঘরের মধ্যে জানালার শিক ধরে সতী আতঙ্কপাণ্ডুর মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

এসবের অর্থ কী সতী, শুভেন্দু চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করতে গেল, কিন্তু শুধু বিকৃত একটা স্বর বেরল, কণ্ঠনালীর কাছে গোটা কয়েক শিরা উঁচু হয়ে উঠল।

দু'হাতে মুখঢেকে ঝুপ করে সতী মাটিতে বসে পড়েছে, রুক্ষ চুলের ভার পিঠময় ছড়ানো, অবিন্যস্ত বেশ। শুভেন্দু চেয়ে দেখল, তারপর আস্তে আস্তে বারান্দায় দিকে এগিয়ে গেল। সতী পলকে কুড়িয়ে নিল আঁচল, দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়িয়ে ভীত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছ।'

'ফিরে যাচ্ছি।' সুভেন্দু অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে বললে।

'ফিরে যাচ্ছ?' সতী অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, 'এই রাত্রে? এখন তো ট্রেন নেই!'

'স্টেশনে কাটাব। এখানে আমার আর এক মুহূর্ত থাকা চলে না সতী।'

'কেন?'

নির্লজ্জের মতো সতী যে এত কিছুর পরও প্রশ্নটা করতে পারে শুভেন্দু আশঙ্কা করেনি! মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গেল, তারপর বলল, 'এ কেনর উত্তর তোমার যদি জানা না থাকে সতী, তবে তোমার বৌদি হাওয়া খেয়ে ফিরলে জিজ্ঞাসা কোরো।'

জিনিসপত্র সব গোছানোই ছিল, স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে শুভেন্দু দরজার বাইরে পা দিলে। টলতে টলতে সতী এগিয়ে এল শুভেন্দুর

হাত দুটি ধরে অসহায় গলায় বলে উঠল, 'না, তুমি যেতে পারবে না।'

হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল শুভেন্দু, পারল না। কপালে অল্প অল্প ঘাম দেখা দিল, কিছু ক্ষোভে, কিছু উত্তেজনায়।

'ছাড়ো' নিজের সমস্ত ইচ্ছাকে একত্র গ্রথিত করে শুভেন্দু গম্ভীর কণ্ঠে বলল।

'না, না, না।'—হাত দুটো ছেড়ে পা জড়িয়ে ধরল সতী, নিমেষের জন্যে শুভেন্দু দেহে বিদ্যুৎ দাহ বোধ করল। মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই বিতৃষ্ণা গলা অবধি উঠে এল, অন্ধপ্রায় শুভেন্দু কী করল খেয়াল ছিল না, সম্বিৎ ফিরে এলে দেখল সতী লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। দেহ নিথর, চোখ দুটি অপলক, দৃষ্টি-হীন।

শুভেন্দু ঝুঁকে পড়ল, হাঁটু ভেঙ্গে বসল পাশে, এখনও ওর পায়ের পাতায় ওপর সতীর শিথিল দুটি হাতের মিনতি। ক্ষীণশ্বাস দেহটি সহসা প্রবল একটা আক্ষেপে কুঞ্চিত হয়ে উঠল, একটু একটু গোঙনি শোনা যেতে লাগল।

'সতী।' শুভেন্দু ডাকল সাহস করে। সাড়া এল না। বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ বিস্ফারিত করে সতী চেয়ে আছে। সে চোখে তিরস্কার না ঘৃণা, পড়বার সাধ্য শুভেন্দুর নেই। অনেক পরে সতীর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল, ক্ষীণ, প্রায় অশ্রুত গলায় বলল, 'মাকে ডেকে দাও। তুমি যাও।'

মৃণালিনী, কণি, মিনি সবাই বারান্দার কোণেই বুঝি ছিল ভীড় করে। ইঙ্গিত মাত্রে ভিতরে ছুটে এল। মৃণালিনী মেয়ের মাথা কোলে তুলে নিলেন, কণি নিয়ে এল হাতপাখা, মিনি জল আনতে ছুটল।

একবার শুধু শুভেন্দুর মুখের দিকে চেয়ে মৃণালিনী বললেন, 'পাশের বাড়িতেই ডাক্তার। একবার ডেকে দেবে।'

স্যুটকেসটা আর তুলে নেওয়া হল না। অন্ধকার প্যাসেজ পেরিয়ে শুভেন্দু ডাক্তারের খোঁজে সদর রাস্তায় বেরল।

ডাক্তার এসেই দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন ভিতর থেকে। বললেন, 'আপনি বাইরে থাকুন।' সামান্য হেসে বললেন, 'এ সময়ে স্বামীকে ভিতরে যেতে নেই।'

শুভেন্দু কিছুক্ষণ পড়া-না-বোঝা ছাত্রের মতো অবোধ চোখে চেয়ে রইল। তারপর ভাঙাভাঙা স্বরে বলল, 'সে কী। এত শীগগির।' ডাক্তার বললেন, 'বেশী প্রিমেচিওর তো নয়। তবে হঠাৎ কোনো শক পেয়ে পেইনটা বোধ হয় নির্দিষ্ট দিনটির কিছু আগেই শুরু হয়েছে।'

সারারাত শুভেন্দু বারান্দায় পায়চারী করেছে। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়া মাথায় লাগতে দাঁড়িয়েছে সদর রাস্তায়। চোখ ঘুমে ভরে এসেছে, অনেক দূরের একটা বাড়ি থেকে রাত পাখির কর্কশ আওয়াজ, দেওয়ালের টিকটিকিটার থেকে থেকে শব্দ, বারান্দায় কোণে রাখা বেতের সাজিটার ভিতর ইঁদুরগুলোর কিচিরমিচির, কল চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার টুপটাপ, রাত্রের বিচিত্র সব শব্দের সঙ্গে ভেজানো ঘরের ভিতর থেকে একটি মেয়ের অবিরাম গোঙানি এক হয়ে মিশে গেছে।

সদর দরজায় পিঠ দিয়ে শুভেন্দু দাঁড়িয়েছিল। চোখ দুটো ঢুলঢুল হয়ে এসেছে, হঠাৎ টের পেল সন্তর্পণে কে যেন কবাট দুটি ঠেলছে। সরে দাঁড়াতেই দরজা ফাঁক হয়ে গেল, মাথা নিচু করে সুহাস ঢুকল ভিতরে। শুভেন্দুকে দেখে যেন চমকে গেল।'—আপনি। এখানে?'

শুভেন্দু সেই অন্ধকারেও সুহাসের মুখখানা দেখতে চেষ্টা করছিল। কোনো উত্তর দিল না।

সুহাস আবার মৃদু গলায় বলল, 'সতী ঠাকুরঝি—'

শুভেন্দু তর্জনী তুলে ভেজানো দরজাটা দেখিয়ে দিল। কোন কথা হল না। শেষ রাতে ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।—'কী হল ডাক্তারবাবু ?'

কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব গম্ভীর করে ডাক্তার বললেন 'বলছি। আপনি আমার সঙ্গে একবার ক্লিনিকে আসবেন।'

শুভেন্দু পিছে পিছে এল। ডাক্তার প্রথম হাত ধুয়ে নিলেন বেসিনে। চোখে মুখে জল দিলেন, জানলা খুলে দিয়ে সকালের প্রথম আলোর দীর্ঘ একটি জ্যোতির্ময় রেখাকে ডেকে আনলেন ভিতরে।

'দুঃসংবাদ আছে শুভেন্দুবাবু।' ইংরেজী একটা খবরের কাগজ হকার কখন কবাটের নিচে দিয়ে গলিয়ে রেখে গেছে, বড়ো বড়ো হেড লাইনে নানা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রথম পাতায় সাজানো, সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে শুভেন্দু অর্থোদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা করছিল, ডাক্তারের গম্ভীর কণ্ঠ শুনে চমকে উঠল। 'দুঃসংবাদ আছে।'

টেবিলে রাখা হাতের পাতায় চোখ-দুটি নিবদ্ধ রেখে শুভেন্দু আড়ষ্ট স্বরে বলল, 'সতী কি বেঁচে নেই ?'

'আছে।'

'তবে কি বাচ্ছাটা'—

'সেও আছে।' ডাক্তার বললেন, 'কিন্তু জন্মান্ধ হয়েছে শুভেন্দুবাবু।'

'জন্মান্ধ!' শুভেন্দু যান্ত্রিক কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করল।

'জন্মান্ধ।'—ডাক্তার আবার বললেন—'আপনাকে গোটাকয়েক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই। যথাযথ উত্তর দিতে চেষ্টা করবেন। আমি ডাক্তার, সঙ্কোচের কারণ নেই।'

একটির পর একটি প্রশ্ন। ডাক্তার শুভেন্দুর কানে যেন গরম সীসে ফোঁটা ফোঁটা করে ঢালছেন। কোনটার কী উত্তর দিলে ঠিক

নেই, টলতে টলতে ক্লিনিক থেকে যখন বেরিয়ে এল, তখন জমাট-বাঁধা ধাতুপিণ্ডের মত চেতনা যেন অসাড় হয়ে গেছে।

কিছু বাকি নেই। ডাক্তার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিয়েছেন, ভিতরে গিয়ে পরীক্ষা করেছেন। বলছেন, 'ডিটেলড রিপোর্ট এখন দিতে পারছি না শুভেন্দুবাবু, কিন্তু প্রিলিমিনারী ইম্প্রেসন থেকে আপনাকে বলছি সাবধান হোন।' একটু থেমে বিচিত্র কঠিন কণ্ঠে বলেছেন, 'যতদূর বুঝতে পারছি, লজ্জাকর রোগের কীট আপনার রক্তে মিশে গেছে।'

'আমার রক্তে, ডাক্তারবাবু?' আমার? অসহায় শিশুর মতো শুভেন্দু চেঁচিয়ে উঠেছে,—'এ কী করে সম্ভব হল ডাক্তারবাবু, কী করে?' উদভ্রান্ত অনাবিল দৃষ্টি শুভেন্দুর, নিশিজাগর-রক্তিম তুটি চোখ। বলতে বলতে সেই চোখে তু'ফোঁটা জল দেখা দিল, আকুল, রুদ্ধপ্রায় গলায় শুভেন্দু বলে উঠল, 'বিশ্বাস করুন ডাক্তারবাবু, কোনো তুর্নীতি আমাকে স্পর্শ করেনি। বাবা ছিলেন পণ্ডিত, ছেলেবেলা থেকে তাঁর কড়া শাসনে থেকেছি; মদ দূরে থাক, সিগারেট, নস্যি কখনও ছুঁইনি, একটা সুপুরী পর্যন্ত দাঁতে কাটিনি। মেয়েদের দিকে সমস্ত জীবন মুখ তুলে পর্যন্ত তাকাইনি, কাছে যাইনি, সে প্রবৃত্তিও হয়নি, এ-সর্বনাশ আমার কেন হল ডাক্তারবাবু, কেমন করে হল।'

ভ্রূ-কুঞ্চিত করে ডাক্তার শুনেছেন, একাগ্র হতে হাতের সিগারেটটা নিবিয়েছেন, পরে আবার একটা ধরিয়েছেন, সেটা ছাইদানীতেই নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, খেয়াল করেননি। শেষে উঠে এসে শুভেন্দুর পিঠে আশ্বাসের ভঙ্গীতে হাত রেখেছেন। 'আই পিটি ইউ, ইয়ংম্যান। আমি জানি, কেন। জীবনে আপনি দোষ না করে থাকতে পারেন, কিন্তু ভুল করেছেন। বিয়ের আগে আপনার যথেষ্ট খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত ছিল।'

আর কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না। তপ্ত রক্ত ছুঁচের মতো কথাটা বিঁধেছিল শুভেন্দুর মর্মে। তবে ডাক্তার বলেছিলেন,—

'প্রফেসান্যাল সিক্রেট। তবু আপনাকে খুলে বলা কর্তব্য মনে করি শুভেন্দুবাবু। তিন বছর আগে আরও একবার এমনি কল পেয়ে, ও-বাড়ি আমাকে যেতে হয়েছিল।'

'কী হল সেই শিশু?' শুভেন্দু নিস্তেজ মূঢ় গলায় জিজ্ঞাসা করল।—'জন্মান্ধ?'

'না। সেটি ক্ষীণজীবি হয়েই জন্মে ছিল। ক'ঘণ্টা পরেই মারা যায়। তখনই আমার আসল কথাটা বোঝা উচিত ছিল, কিন্তু অপ্রিয় সত্য আমাদের সজ্ঞান চিন্তার পাশ কাটিয়ে যায়।'

হাই তুলে ডাক্তার চোখের পাতা দুটি ক্ষণিকের জন্য বন্ধ করলেন, সেই অবসরে শুভেন্দু বেড়িয়ে এল পথে। কোন দিকে যাবে।

শুভেন্দু জানে কোন দিকে। হাতের মুঠি কঠিন, কপালের শিরা স্ফীত। একটু পরেই টুঁটি টিপে ধরবে সতীর, তারপর বিকলাঙ্গ জন্মান্ধ শিশুটিরও ইহলীলা সাঙ্গ করে দেবে।

কড়া কড়কড় করে উঠল। দরজা খুলে দিয়ে সুহাস ভয়ে সরে দাঁড়াল একপাশে। জুতোর ঠোকরে একটা কাঁসার গ্লাস ঝনঝন শব্দে ছিটকে পড়ল উঠোনে, প্রতিধ্বনি দেওয়াল থেকে দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে ফিরল।

সতী চমকে তাকাল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরে আঁচল দিয়ে ঢেকে দিল নিজের মুখ, কোলের শিশুটিকে।

মুহূর্তের জন্য শুভেন্দু স্তব্ধ হয়ে গেল। আঁচলের নিচে মাঝে মাঝে ছোট ছোট হাত-পা নড়ে উঠল। মাঝে মাঝে চুক চুক শব্দ, থেমে থেমে ট্যাঁ ট্যাঁ কান্না।

একটু পরেই থেমে যাবে এ কান্না, আর আঁচলের আড়ালে প্রসব-অবসন্ন যে শরীরটা কেঁপে উঠেছে, সেটা একেবারে নিস্পন্দ হয়ে যাবে। সব শেষ।

সেই মুহূর্তে একটা টিকটিকি পোকা ধরার উল্লাসে টকটক করে উঠল, জানলার ফাঁক দিয়ে দুটো বোলতা ঘরে ঢুকে শুভেন্দুর কানের কাছে শুরু করল গুঞ্জন। হঠাৎ হাতের মুঠি শিথিল হয়ে গেল শুভেন্দুর। সব শেষ? সব না তো। তার রক্তময় ছড়িয়ে আছে অগণিত পাপকণিকা, দুটি অপঘাত মৃত্যু দিয়েও তো তাদের নিঃশেষে মুছে ফেলা যাবে না। ভাবতে ভাবতে মাথাটা টলে উঠল, শুভেন্দুর আরক্তিম, আবিল দুটি চোখ ভেঙে নির্ঝরের মতো জল ঝরতে লাগল। সতীর বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে শুভেন্দু কেবলি বলতে থাকল।

'তুমি আমার এ-সর্বনাশ কেন করলে সতী, কেন করলে।'

সতী নড়ল না, মুখ ফেরাল না, আঁচলের নীচে থেকে শুধু অতি শ্রান্ত একটি নিয়মিত প্রশ্বাসের আভাস পাওয়া গেল, মাঝে মাঝে ট্যাঁ ট্যাঁ কেঁদে উঠে একটি নবজাত তার জন্মান্ধতার বিরুদ্ধে নালিশ জানাল।

ধীরে ধীরে উঠল শুভেন্দু। দরজার কোণে স্যুটকেসটা তখন থেকে পড়ে আছে, তালাটা আছে হাঁ করে। সেটাকে খুলে জিনিসপত্র গুছিয়ে শুভেন্দু ফের ভরতে লাগল।

—'একটা কথা শুনবেন?'

শুভেন্দু তাকিয়ে দেখল সুহাস। জিনিষ গোছানো হয়ে গিয়েছিল, শুভেন্দু স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। সুহাস ওকে ডেকে নিয়ে গেল বারান্দার কোণটিতে। মিনি আর কণি খেলনা নিয়ে বসেছিল, তারা ত্রস্ত হয়ে এক ধারে সরে বসল।

মৃণালিনী একবার উঁকি দিয়ে ফের কলঘরে লুকোলেন।

'কী বলবেন?' সুহাস মাথায় সামান্য ঘোমটা টেনে দিল, আঁচলটা গুছিয়ে নিল গায়ে, নত চোখে ধীর স্বরে বলল, 'সতী ঠাকুরঝি প্রশ্নের জবাব দেয়নি শুভেন্দুবাবু, আমি দেব।'

অসহিষ্ণু গলায় শুভেন্দু বলে উঠল, 'জবাব আমি চাই না বৌঠান, আমার সব জানা হয়ে গেছে। সতীর ব্যাপারটা সব ডাক্তারবাবুর

কাছে শুনেছি, আর'—একটু ইতস্তত করে বলল, 'আর আপনাকে তো কালই দেখেছি।'

'দেখছেন। শুনছেন।' সুহাস আস্তে আস্তে শব্দ দুটির পুনরুক্তি করল। 'কিন্তু দেখা-শোনার পরেও একটা জিনিস বাকি থাকে, বোঝা। আপনি আমাদের কথা বোঝেননি শুভেন্দুবাবু।

'বুঝে লাভ নেই। আমার সর্বনাশ যা হবার, হয়েছে। সমস্ত কৈশোর, প্রথম যৌবন নিজেকে সব সুখ থেকে বঞ্চিত করে রুদ্ধপ্রায় ঘরে থাকার পুরস্কার তো পেলাম, এইরোগ। আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর পথ নেই সুহাস বৌঠান।'

'আত্মহত্যা ?' দেখতে দেখতে হিংস্র হয়ে উঠল সুহাসের দুটি চোখ, ঘোমটা খসে পড়ল। 'আত্মহত্যা আমরা করিনি, শুভেন্দুবাবু? উনি, সতীর দাদা, হঠাৎ যখন মারা গেলেন, তখন আমাদের স্বজন নেই, সহায় নেই। একটা ভাড়া বাড়িতে বুড়ি শ্বাশুড়ি, কমবয়সী বিধবা বৌ, বয়স্থা ননদ, আর দুটি কিশোরী মেয়ে কী খেয়ে কী পরে দিন কেটেছে অনুমান করতে পারেন? হাঁড়িতে একটা চাল নেই, অথচ প্রতিদিন একটার পর একটা কুৎসিত উড়ো চিঠি এসেছে, জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে পাড়ার ছেলেরা দিয়েছে শিষ। রাত্রে উঠোনে ঢিল পড়েছে। অন্ধকার ঘরে কাঠ হয়ে শুয়ে আমরা প্রতি রাত্রে ভেবেছি কখন ভোর হবে। আবার ভোর হলে ভেবেছি এখনি অন্ধকার নেমে এসে আমাদের সব লজ্জা ঘুচিয়ে দিক। লেখাপড়া বেশি শিখিনি, তবু চাকরীর চেষ্টায় ননদ-ভাজ মিলে শহরের পথে পথে ঘুরেছি ; ইতর অশ্লীল ঠাট্টা ছাড়া কিছু জোটেনি। হাতে তৈরী ছোটখাট জিনিস ফিরি করতে বেরিয়েছি, কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়েরাই আমাদের ঠকিয়েছে বেশি, ঠিকমত দাম দেয়নি। ততদিনে শেষ ভরি সোনাও বিকিয়ে কাঁসার বাসনে হাত পড়েছে। ঠিক এই সময়ে এগিয়ে এল প্রতুল চৌধুরী আমাদের বাঁচাতে, মারতে।'

'প্রতুল চৌধুরীই কি সতীকে—' শুভেন্দু স্তম্ভিতভাবে জিজ্ঞাসা করল।

সুহাস বলল, 'হাঁ।' তারপর দীর্ঘ একটা যতি দিয়ে বলল, 'ওর বয়স ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, প্রতুল চৌধুরী সতী ঠাকুরঝিকে বেছে নিয়েছিল। একদিন আপনি এলেন, বাঁচল সতী। এবারে এগিয়ে যেতে হল আমাকে।' আবার অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল সুহাস, অবসন্ন কণ্ঠে বলল, 'আমারও শরীরে কীট ধরেছে শুভেন্দুবাবু। বেশিদিন আর টানতে পারব না।' বলতে বলতে যন্ত্রণায় সুহাসের মুখ বিকৃত হয়ে গেল, কণির মাথায় হাত রেখে বলল, 'আমার পরে আসবে কণি, আসতেই হবে। সব প্রতুল চৌধুরীর নোট বইয়ে নম্বর-টোকা হয়ে গেছে। কণিরও এই রোগ হবে। ওর পরে হয়ত আসবে মিনি।'

দ্রুত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে গেল, 'আপনি তো পালিয়ে বাঁচবেন শুভেন্দুবাবু, কিন্তু আমরা যাব কোথায়। প্রতুল চৌধুরী তো সংসারে একজনই নয়। এই রোগ তারা দিয়েছে আমাকে, সতীকে, আপনাকে। কণিকে মিনিকেও দেবে। কারো রেহাই নেই। এরোগ আমাদের সকলের শুভেন্দুবাবু, আর শুধু শরীরেই নয়।' সুহাস একটু দম নিল, তারপর শুভেন্দুর হাত দুটি চেপে গাঢ় কণ্ঠে বলল, আপনাকে সেরে উঠতেই হবে শুভেন্দুবাবু, আমাদের সবাইকে সারিয়ে তুলতে হবে।'

সেই স্পর্শে শুভেন্দুর গায়ে কাঁটা দিল। সুহাসের অনুনয়-স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দুটি চোখের দিকে চেয়ে মুখ ফেরাতে পারল না। আস্তে আস্তে স্যুটকেসটা মাটিতে নামিয়ে রাখল।

ঘ্রাণ

আনন্দ পর্বতের আড়ালে রোজই সূর্য অস্ত যায়, কিন্তু যাবার আগে নয়া রোতক রোডের এই বাংলোটিকে আদর করতে ভোলে না। লাল সিমেন্ট-বাঁধানো বারান্দার উপর অনেকক্ষণ ধরে অলস, ক্লান্ত, মূর্ছিতপ্রায় পড়ে থাকে, দীর্ঘ বিলম্বিত বিদায় চুম্বনের মতো। তারপর রোদের ঠোঁট সরে, নিস্তেজ বারান্দাটিকে ঘিরে ছায়া নামে, থমথমে, গম্ভীর। লনের আঁচলে হিম হাওয়া চুপে চুপে চোখ মোছে। গেটের কাছে প্রৌঢ় প্রহরী ঝাউ গাছটা এমনিতে কিছু টের পায় না; বয়সের ভারে, শকুন ডানার অত্যাচারে সে বিব্রত। হাওয়া তার কানে ফিসফিস করে একটি সদ্যোবৈধব্যের খবর শোনায়, বিষণ্ণ ঝাউগাছটা তখন সহৃদয়ের মতো ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে। আনন্দ পর্বতের পিছনের আকাশ তখনও আরক্ত, অনেক দূরের কোয়্যারি থেকে খোয়া ভাঙার আওয়াজ থেমেও থামে না। নয়ানজুলিতে থেমে-পড়া একটি লরি থেকে থেকে গর্জন করে ওঠে, মজুরদের তাড়া দেয়, পাথরের টুকরো বোঝাই সারা হলেই সে লম্বা ছুট দেবে। কিষণগঞ্জ রেল ইস্টিশনের দিকে একটা নেই-কাজ শান্ত্রীর মতো ইঞ্জিন কোমরে কোমরে শিকল বাঁধা বন্দী ওয়াগনের সারিকে ক্রমাগত ধাক্কা দিতে দিতে হয়রান করে তোলে, তার পিস্‌টনের মুঠিতে জোর ঢের, থেকে থেকে ভাঙা গলায় অশ্লীল ক্রুদ্ধ একটা শপথ উচ্চারণ করে, পারলে বুঝি দুনিয়ার সব ওয়াগনকে চুলের মুঠো ধরে মাল টানার কাজে জুতে দের।

পশ্চিমের বারান্দায় ডেক চেয়ার টেনে নিত্য যিনি এই দৃশ্য দেখেন তাঁর নাম কৌশল্যা উপাধ্যায়, রোতক রোডের বাংলোটির মালিক। ঝাউ ঝিরঝির বাতাসে সব শব্দ ঢাকা পড়ে না,

কোয়্যারিতে খোয়া ভাঙার প্রতিধ্বনি তিনিও শুনতে পান, ছায়ামলিন লনের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, ওর শোকের কৃষ্ণচ্ছদ বুঝি আর ঘুচবে না। অথচ মনে মনে জানেন এও ঠিক নয়, হাত বাড়িয়ে একটা সুইচ টিপলেই খুশির নির্লজ্জ হাসি বারান্দা ছাড়িয়ে লনে ছড়িয়ে পড়বে, বিয়োগের ব্যথা ভুলতে আর কতক্ষণ। এই স্তব্ধতর আয়ুও বেশি না। এখুনি মাল বোঝাই লরি থরথর বেগে ছুটে যাবে, পীচঢালা ধর্ষিত পথটার কপালে বিন্দুবিন্দু শ্রমচিহ্নের মতো ফুটে উঠবে আলোর মালা।

—মিসেস উপাধ্যায় ?

কৌশল্যা সোজা হয়ে বসেন, ক্যাপটেন চ্যাটার্জী এসেছে। রোজই আসে, গেটের বাইরে মোটর সাইকেটলাকে থামিয়ে ঠেলে নিয়ে আসে বলে কৌশল্যা টের পান না। সম্বোধনমাত্র চকিত হয়ে ওঠেন, এক হাতে আলো জ্বালেন, ডেক চেয়ারটা এগিয়ে দেন অন্য হাতে।—বসো চটরজী।

চ্যাটার্জী বসে, কিন্তু বসেও উসখুস করে, সেটা কৌশল্যার চোখ এড়ায় না। শুভ্র সুন্দর মুখের কয়েকটি রেখা কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু কাঠিন্যটুকুর খবর কণ্ঠও টের পায় না, সে অভ্যস্ত মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করে,— চা কি বারান্দাতেই দিতে বলব ?

চ্যাটার্জী তাড়াতাড়ি বলে, কেন,—চলুন ভেতরেই চলুন। কৌশল্যা মনে মনে মজা পান, মুখেও কৌতুকের এক টুকরো হাসি খেলে যায়। —কেন, বারান্দা কি এতই ঠাণ্ডা ? বেবি কিন্তু এখনও কলেজ থেকে ফেরেনি। স্মার্ট, সুপুরুষ ক্যাপ্টেন যেন জড়োসড়ো, এতটুকু হয়ে যায়, কোনোমতে বলে,—বেশ তো বেশ তো, না হয় কিছুক্ষণ বাইরেই বসা যাক। আপনি ঠিক জানেন মিসেস উপাধ্যায়, আপনার কোনো অসুবিধে হবে না ?

কৌশল্যা তাড়াতাড়ি বলেন,—ও ডিয়ার নো।

—এবার শীত দেরিতে পড়বে, কী বলেন।

কৌশল্যা জানেন, এ প্রসঙ্গের পরমায়ু পাঁচ মিনিট; ডালহৌসি সিমলা কসৌলির আবহতত্ত্বের আলোচনা বেশিক্ষণ চলে না! তারপর ফের ফিরে আসতে হবে এই বারান্দাটিতে, যেখানে পেট স্পেনিয়েল-টাকে কৌশল্যা উপাধ্যায় লম্বা লম্বা লোমে আঙুল বুলিয়ে আদর করছেন। তার পেডিগ্রী নিয়েও কিছুক্ষণ কথা হবে। জঙ্গী অফিসার হয়েও চ্যাটার্জী গৃহপালিত কুকুরের প্রতি বিমুখ, কিন্তু কৌশল্যার কাছে সেটা গোপন করতে গিয়ে ঘেমে উঠবে! আর, ততক্ষণ বুড়ো কালা ঝাউ গাছটা যেন কতই শুনেছে এমন ভাবে হাওয়ার কথায় সায় দিয়ে মাথা নাড়বে, হেমন্তের আকাশ তারার ঘামাচিকুটকুট নীল পিঠটা ঘষবে মেঘের ভিজে তোয়ালে দিয়ে, চ্যাটার্জী গেটে মচমচ শব্দ হলেই বেবি এসেছে ভেবে আড়চোখে তাকাবে—ডেক চেয়ারে ডুবে গিয়ে মজা দেখবেন কৌশল্যা। কড়াভাঁজ কোর্তার ফাঁকে ক্যাপ্টেনের রোমশ বুকটার সঙ্গে কোলে-লীন স্পেনিয়েলটার মিল পেয়ে মনে মনে হাসবেন।

—জানো ক্যাপ্টেন, আমার মেয়ে বেবি প্রথমে তোমার নামটা বুঝতে পারেনি। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল,—ক্যাপ্টেন চ্যাটার আবার কেমন নাম মা? শেষের 'জী'টা ও ভেবেছিল বুঝি সম্ভ্রমের বুঝিয়ে দিলুম তোমার পুরো নাম চ্যাটার্জী।

নিজের খরচায় ঠাট্টা, তবু চ্যাটার্জীকে হাসতে হল। মোটা কবজিতে বাঁধা ঘড়িতে সময় দেখল একবার, লুকিয়ে, কিন্তু বেবি এখনও ফিরছে না কেন জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেল না।

লনে ঘসঘস শব্দ, একটা সাইকেল থামল। একটা ছিপছিপে মেয়ে এসে দাঁড়াল বারান্দায়।

—বেবি, নটি মেয়ে, এতক্ষণে এলে? ক্যাপ্টেন সেই কখন থেকে বসে আছেন।

—সরি। অনেক্ষকণ বসে আছ? কিন্তু মা, তুমি তো ছিলে।

—আমি? কৌশল্যা লাজুক কিশোরীটির মতো হাসলেন,—আই বোরড্ হিম নো ডাউট।

দুহাত তুলে নিখুঁত ভদ্রতার মুদ্রায় চ্যাটার্জী বললে,—না মিসেস উপাধ্যায়, না।

—চলো এবার ভিতরে চলো। বেবি ঠিক হাত বাড়িয়ে দিল না, তবুও চ্যাটার্জী ওকে অনুসরণ করল। মিসেস উপাধ্যায় অর্ধপীত চায়ের পেয়ালাটার দিকে চেয়ে দেখলেন, ওটা শেষ করার সবুরও সয়নি, হ্যাংলা!—মনে মনে ধমক দিলেন। চিমটি কাটলেন কুকুড়টাকে সে কেঁউ করে কোল থেকে নেমে পড়ল, এক দৌড়ে চলে গেল ভিতরে। বারান্দায় কৌশল্যা এখন একা। বাইরে চেয়ে দেখলেন, রুগ্ন জ্যোৎস্না এরই মধ্যে কুয়াশার রেশমী ফাঁস গলায় পরে মরবার উদ্যোগ করছে। সামনের উঁচুনীচু মাঠটা গড়াতে গড়াতে দূরের টিলার গায়ে ঠেকে গিয়ে থেমে গেছে। য়ুক্যালিপটাস গাছটা ঋজু শ্বেতাঙ্গের মতো, তার অস্পষ্ট ছায়া কিন্তু কালো; আঁকা বাঁকা, সাপের মতো হেলে হেলে ঘাস ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে গেছে। এতক্ষণে কৌশল্যা যেন অনুভব করলেন, এখানে ঠাণ্ডা, স্কার্ফ ভালো করে জড়ানো, তবু গায়ে কাঁটা দিল।

তিনিও কি ভিতরে যাবেন। কিন্তু ওরা তো তাঁকে ডাকল না। বেবি উঠল, চ্যাটার্জী তার পিছু নিল। শেষ-না-করা চায়ের পেয়ালাটার মতোই কৌশল্যা এখানে পড়ে রইলেন। সম্মুখের থামটাকে মনে মনে চ্যাটার্জী কল্পনা করে কৌশল্যা তাকে নিঃশব্দে টিটকিরি দিয়ে বললেন, ছি, চ্যাটার্জী, ছি। এই তোমার মিলিটারী এটিকেট। যেটুকু চা পেয়ালায় পড়ে ছিল সেটুকু লনে ঢেলে দিলেন।

ঘরে ঠক ঠক শব্দ। ওরা টেবিল টেনিস খেলছে। হঠাৎ সোজা

হয়ে উঠে বসলেন কৌশল্যা। কেন তিনি এখানে পড়ে থাকবেন। অভিমান? ওরা ডাকেনি? কিন্তু এ বাড়ির মালিক কে? হিমের ছোঁয়ায় বা অন্য যে কোন কারণে, একটা হাঁচি অনেকক্ষণ থেকে নাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল, সেটাকে সামলে বোবা চটি পায়ে কৌশ্যা ঘরের ভিতর গিয়ে দাঁড়ালেন। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে বেবির, অহঙ্কারী মেয়েটার কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। গম্ভীর গলায় কৌশল্যা বলে উঠলেন,—র‍্যাকেটা আমার হাতে দাও বোধ তুমি হাঁপিয়ে পড়েছ। ঘাম মুছে ফেলল বেবি, সোজা হয়ে দাঁড়াল, আবদারের সুরে বলল,—আরেকটু মা, আরেকটু। চ্যাটার্জী ভেরি ফাস্ট, ওর সঙ্গে খেলে তুমি দম পাবে না।

—র‍্যাকেটটা দাও। এবার এত জোরে বললেন কৌশল্যা যে বেবি ওঁর চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল। হাতে তুলে দিল র‍্যাকেট।

স্কার্ফটা ফেলে দিয়েছেন কৌশল্যা, কোমরে আঁচল বেঁধে ছুটছেন! এত জোর মনে, তবু কলিজাটা ধক ধক করে কেন, পা কেন চলতে চায় না। টেরিফিক চ্যাটার্জীর র‍্যাকেটে ঘা খেয়ে একটা বল যেন দশটা হয়ে ফিরে আসে। দু'মিনিটেই রণে ভঙ্গ দিয়ে কৌশল্যা ধপ্ করে সোফায় বসলেন। শাদা দাঁতের পাটি বিস্তার করে বললেন,—নাউ নাউ চ্যাটার্জী, তোমার শিভালরি নেই। মেয়েদের জিতিয়ে জানো না। ঘাড়ে গলায় রুমাল ঘসতে ঘসতে চ্যাটার্জী বলল,—ফেয়ার ফিল্ড এ্যাণ্ড নো ফেভর।

ঘামে-গলা মুখখানা মেরামত করতে বেবি বুঝি আড়ালে গেছে, চ্যাটার্জীও সোফায় কৌশল্যার পাশে এসে বসেছে। পরিচারক শীতল পানীয় দিয়ে গেল। তখনও শ্রমের ক্লান্তি যায়নি, চুমুক দিতে দিতে কৌশল্যা মৃদুস্বরে গল্প শুরু করলেন।—চমৎকার কাটল সন্ধ্যেটা। অনেক, অনেক ধন্যবাদ চ্যাটার্জী। উপাধ্যায় যখন মারা গেল, তুমি

জানো না তখন সবাই আমাকে দেশের বাড়িতে গিয়ে থাকতে বলেছিল

চ্যাটার্জী জানে। আজ নিয়ে অন্তত দশবার এ কাহিনী শুনতে হয়েছে।

পানীয়ে দ্বিতীয় চুমুক দিয়ে কৌশল্যা বললেন,—আমি যাইনি। রোতক রোডে ছোট এই বাংলোটি তৈরী করিয়ে নিয়েছি। দিল্লী আমি ছাড়তে পারব না, এর সঙ্গে আমার নাড়ীর টান। উপাধ্যায়ের কত স্মৃতি এখানে জড়িয়ে আছে, এখানেই তার চাকরীর উন্নতি, আণ্ডার সেক্রেটারি অবধি হয়েছিল। হঠাৎ ওপরের ডাক না এলে সেক্রেটারিও হত, হত না চ্যাটার্জী?

চ্যাটার্জী বলল,—হত। রুমালে চোখ মুছলেন কৌশল্যা।—কত পার্টি, কত বন্ধু, কী আনন্দে তখন দিনগুলো কেটে যেত তুমি জানো না চ্যাটার্জী। কত ইস্কুলের ফাউণ্ডার্স ডেতে প্রাইজ বিলোতে আমার ডাক পড়েছে। চ্যারিটি শো করে ওয়ার ফাণ্ডে চাঁদাই তুলে দিয়েছিলাম পাঁচ হাজার টাকা। সে সব দিন আর নেই তবু গ্রামে ফিরে যাবো? রুর‍্যাল আপলিফ্‌ট? টু বী বট্‌লড আপ ইন এ ভিলেজ হাট, জাস্ট্‌ ফ্যান্সি। তার চেয়েও একটা বড় দায়িত্ব আমার ছিল সেটা সেদিন কেউ বোঝেনি—মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে।

—আপনার বড়ো মেয়েকে তো আপনি ভালে বিয়েই দিয়েছেন।

হঠাৎ হিংস্র হয়ে উঠলেন কৌশল্যা, ওষ্ঠাগত গ্লাসটাকে সরিয়ে রাখলেন, তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন,- ভালো বিয়ে? ইউ কল ইট এ ম্যাচ? না চ্যাটার্জী, না। একটা টিচিং শপের লেকচারারের চেয়ে দেবযানীর ভালো বর জুটত না আমি এ কথা মেনে নিতে পারি না। দেবযানী আমার অবাধ্য হয়ে নিজের সর্বনাশ করেছে, কোনোদিন ও আমার ক্ষমা পাবেন না।

অপ্রতিভ চ্যাটার্জী চুপ। বেবি তাড়াতাড়ি এগিয়ে কৌশল্যার মাথায় হাত রাখল।—চুপ করো মা, চুপ করো। ওরা তো সুখেই

আছে। মেহ্‌রাজী শীগগিরই ইউনিভার্সিটিতে কাজ পাবেন, দিদি বলছিল।

—তুই ও'দের ওখানে যাস?

বেবি মাথা নীচু করে রইল।

তিক্তস্বরে কৌশল্যা বললেন,—সুখ। পথের ধারে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে যে কুকুড়গুলো শুয়ে থাকে, তারাও তবে সুখী বেবি। দেবযানী আমায় ঠকিয়েছে।

বিব্রত চ্যাটার্জী কখন বেবির দিকে চোখের ইশারা করে প্রথামত বিদায় না নিয়েই উঠে গেছে কৌশল্যা টের পাননি। বাংলোটিকে থর থর কাঁপিয়ে পর পর দু'টি লরি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেল, কৌশল্যা সম্বিত ফিরে পেলেন তখন। অবসন্ন গলায় বললেন,— রাত হয়েছে, এবার খেতে চলো বেবি।

মাথা নীচু টেবিলে বসেছে দু'জন। বেবি খাচ্ছে না, নখে চাপাটি গুলো খুঁটছে।

—তোমাকে একটি কথা বলব বেবি।

বেবি মাথা তুলল।

নৈর্ব্যক্তিক, যেন রায় পড়ছেন, এমন গলায় কৌশল্যা বলে গেলেন,—তোমার ভাবভঙ্গিও কিছুদিন থেকে আমার ভালো ঠেকছেনা। তুমি চ্যাটার্জীকে যেন বড়ো বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছ। মাথা নীচু কোরো না বেবী, কৌশল্যা সহসা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, জবাব দাও?

মৃদু অশ্রুতপ্রায় কণ্ঠে বেবি বলল,—চ্যাটার্জীকে আমি কথা দিয়েছি।

—কথা দিয়েছ? কটু গলা কৌশল্যার, কয়েক মুহূর্ত নির্ণিমেষ চোখে চেয়ে রইলেন।—এরই মধ্যে? তর সইল না? বয়স যে

তোমার এখনও আঠারো হয়নি। ধীর, কিন্তু দৃঢ় স্বরে বেবি বলল,—তোমার হিসাব একেবারে ঠিক থাকে না মা, বাইশ পূর্ণ হয়ে গেছে।

—চুপ করো। খুব হিসাব শিখেছ বেবি: এতই যদি হিসাবী তুমি, তবে লুথরাকে কেন আমল দিলে না, সে তো আই এ এস; কিম্বা প্রকাশককে, সেও অল ইণ্ডিয়া রেডিওর একজন বড় অফিসার।

—চ্যাটার্জীও তো অফিসার, মা।

—আঃ, তর্ক, তর্ক কেবলই তর্ক। আমার কথা এই যে বেবি, এত তাড়াতাড়ি সব ঠিক করে ফেললে কেন। বাছাই করে তো নিতে পারতে। তোমাকে পিয়ানো কিনে দিয়েছি। গান আছে, পিকনিক, ঘোরাঘুরি, টেনিস, এত শীগ্‌গির সব শেষ করে দিতে চাও কেন। এ কি তোমার ভালো লাগে না।

এক টুকরো ফ্যাকাশে আলো ছড়িয়ে গেল বেবির মুখে। আস্তে আস্তে বলল,—ছ'বছর ধরে টেবিল টেনিস খেলে দিদির দিদির কব্‌জি ব্যথা হয়ে গিয়েছিলো মা, পুডিং তৈরী করে করে আঙুল পুড়ে গিয়েছিল তাই সে পালিয়ে বেঁচেছে।

—বেইমান। হাতে রুটির টুকরো না থাকলে কৌশল্যা বুঝি ঠাস করে চড় মেরে বসতেন মেয়েকে। রুদ্ধ শ্বাস, চোখে ফুলকি ঝরছে, যেন শুধু দাঁত দিয়ে উচ্চারণ করলেন,—কিছু শুনতে চাই না। কাল রবিবার লুথরা সকালেই আসবে। আমাদের হিন্দনের পাড়ে বেড়াতে নিয়ে যাবে বলেছে। তুমি তৈরী থেকো বেবি।

আনন্দ পর্বতের আড়ালে সূর্য অনেকক্ষণ ডুবে গেছে। পাথর ভাঙা কোয়্যারি চুপ, রেল সাইডিংয়ের অত্যাচারী ইঞ্জিনটাও আজ নিখোঁজ। হিন্দনের তার থেকে পরদিন কৌশল্যা যখন ফিরলেন তখন মন কানায় কানায় ভরা। দেহের কোষে কোষে অবসাদ, একরকম টলতে টলতে নামলেন গাড়ি থেকে। তারপর গেটের সম্মুখে দাঁড়িয়েই আরও

একদফা বিদায় দেওয়া, নেওয়া খিলখিল হাসি ; সর্বশেষ মডেলের গাড়িখানা যতক্ষণ না অদৃশ্য হল ততক্ষণ কৌশল্যা চেয়ে রইলেন।

বেবি দাঁড়ায়নি, বাড়ি ফিরেই সটান এসে শুয়ে পড়েছিল। কৌশল্যা আজ উদার হয়ে গেছেন, চাকর রেয়ারাদের দুটো করে টাকা দিয়ে বললেন,—আজ রাত্রে আমরা খাব না, তোমরা সিনেমা দেখ গিয়ে। ঘরে এসে গরম জামাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন,—বেবি, ঘুমিয়েছিস ?

হুঁ কি উঁহু জাতীয় একটি অব্যয় উচ্চারণ করে বেবি পাশ ফিরল।

—চমৎকার কাটল আজ সারাদিন না ? গ্রামোফোনটা নিয়ে লুথরা ভালোই করেছিল। এত রেকর্ড, সব কি ওর ?

বেবি বলল,—জানি না।

—তুই তো ভয়ে চান করলি না। এখন মাথা ঘুরছে তো। ঘুরবে না। ও এত স্যানডুইঠ আর ডিম নিয়ে গিয়েছিল কেন রে, আমরা কি রাক্ষস ? হিহি করে হেসে উঠলেন কৌশল্যা, গলা অবধি একটা চাদর টেনে মেয়ের পাশের খাটিয়ায় শুয়ে পড়লেন। —ওর যে বন্ধুটিকে সঙ্গে এনেছিল, সেহ্‌নাল না কি নাম যেন, সেও ভারী আমুদে, এয়ার ফোর্সে কাজ করে শুনলাম। আসছে রবিবার আমাদের আবার নিতে আসবে বলে গেল। এবার যাব গুরগাঁওয়ে, সোহনার হটস্প্রিংসে। একটা গাড়ী থাকা খুব সুবিধের, না ?

সাড়া না পেয়ে কৌশল্যা হাই তুললেন, যেন স্বগত, যেন সিলিংটাকে শুনিয়ে বললেন,—চ্যাটার্জীর কিন্তু গাড়ী নেই। থাকার মধ্যে আছে ওই ত একটা ঝরঝরে মোটর সাইকেল। যেটুকু চলে তার দশগুণ গলাবাজি করে। সুইচ টিপে আলোটা নিবিয়ে দিলেন কৌশল্যা নরম মখমল অন্ধকারে ঘর ভরে গেল। বেবি শুনছে কিনা বিশ্বাস নেই, তবু বললেন,—কাল বিকালে প্রকাশ আসবে, দিনের বেলা পিয়ানোতে একটু হাত লাগিয়ো আর কোথাও বেরিয়ো না যেন।

হঠাৎ বিছানার উপর সোজা হয়ে বসল বেবি—এতক্ষণ তবে ঘুমোয়নি—ফাঁপানো অগোছালো চুলের রাশি মুখটাকে যেন দশগুণ স্ফীত করেছে,—তুমি কী চাও মা, ঠিক করে বল দেখি? চ্যাটার্জীকে তবে আসতে মানা করে দিই?

কৌশল্যা সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিতে পারলেন না, অবাক চোখে চেয়ে রইলেন। বেবি আবার শুয়ে পড়ল। বুড়ো প্রহরী ঝাউ গাছটার আড়ালে বাসা খুঁজে মরছে কোন রাতপাখি, কৌশল্যা তার ডানার ঝটপট শুনলেন। তারপর শব্দ যখন থেমে গেল, তখন অতি ধীরে, একান্তই জনান্তিকে, তাঁর একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তাঁকে কেউ বোঝেনি, বড়ো মেয়ে দেবযানীও না। চ্যাটার্জী আসবে না কেন, সেও চমৎকার ছেলে, আসবে বৈকি। কিন্তু সবাই আসবে। বোকা মেয়ে, তোর গায়ে দিদির হাওয়া লেগেছে, ঘুমন্ত বেবির মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন। এই করেই সব শেষ করে দিতে চাস। তোর মনে নেই বেবি, তোর বাবা যতদিন কোয়ার্টারে ছিল, আমাদের কোয়ার্টারে কত লোক আসত যেত। ব্রেকফাস্টে অতিথি, লাঞ্চে অতিথি, ডিনারেও। ডিনারের পর ব্রিজের টেবিল পড়ত। কত রাত পর্যন্ত গান, গল্প, হাসি। মিটার, চাওলা, এদের মনে নেই? একটি মৌচাক ঘিরে অবিরল গুঞ্জন।

তুঘলকাবাদের ধ্বংসস্তূপে স্বামীর সহকর্মী রাও একবার তার হাত চেপে ধরেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার গালে একটা চড় মেরেছিল কৌশল্যা। রাও রাগ করেনি। আরক্ত মুখে পালিয়ে ছিল। রাগ তিনিও করেন নি। নিজে ঠিক থাকলেই হল। এই জীবনের উপর ধিক্কারও আসেনি। রাওকেও পরদিন চা খেতে ডেকেছিলেন।

উপাধ্যায় গেছে, জীবন গেছে, কিন্তু নেশা যায় নি তো। কৌশল্যা আজও তার গন্ধটুকু নিয়ে দিল্লীতে পড়ে আছেন।

সারা দুপুর মেয়েটাকে চোখে চোখে রেখেছেন কৌশল্যা, প্রকাশ যখন এল ঠিক তখনই বেবিকে দেখতে পেলেন না। মেয়েকে অভিশাপ দিলেন, প্রকাশকে আদর করে বসালেন ঘরে, বার বার উঠে বাইরে গেলেন, বেবি নেই। রাস্তার দিকে নজর রাখতে সুবিধা হবে ভেবে কৌশল্যা শেষে বললেন,—আসুন মিঃ প্রকাশ, আপনাকে আমার বাগান দেখাই। আপনি তো ফুল ভালোবাসেন, নয়? একটা 'ব্ল্যাক প্রিন্স' তুলে দিলেন বাটনহোলের জন্য। —জানেন, এগুলোর ক্রেডিট বেবির। রোজেজ আর নট ইন মাই লাইন। এই যে দেখছেন, 'অ্যাডমিরাল,' 'ফ্যানটাসিয়া,' 'কমরেড,' 'ফ্লেমিং সানসেট,' সব ওর। আমি? আই টু হ্যাভ রেইজড সাম্। 'ক্রিসানথিমাম' গুলো আমার, 'হলিহক' আমার, 'সুইট-পী', এখনও ভালো করে ফোটেনি, এও আমার। গেটে যে 'বুর্গাইভিলিয়া' দেখেছেন, এর নাম বোয়া-ছ-রোজ, আমার বাছাই। লাইক টু সী মোর? এদিকে আসুন। কারনেশান দেখুন শাদা, লাল, হলদে, সব মিলিয়েছি। ডালিয়া চেনেন আপনি, ক্যালেনডুলা? বলুন তো কোনগুলো? এই কসমীয়াগুলো নিশ্চয়ই আমাদের খাবার টেবিলে দেখেছেন। বর্ষায় এলে আপনাকে গ্লোব আমারানথ দেখাতে পারতুম। এগুলোর নাম আপনাকে বোধহয় বলে দিতে হবে না, এগুলো পীটুনিয়া।

হঠাৎ কৌশল্যা আহত স্বরে বলে উঠলেন,—মিঃ প্রকাশ আপনি কিছুই শুনছেন না।

অপ্রতিভ প্রকাশ প্রথমে প্রতিবাদ করলে, পরে ভূয়সী মার্জনা চাইল। ঘরে ফিরে কৌশল্যা বললেন,—আসুন আমরা একটা ছবির ম্যাগাজিন দেখি।

আদ্যোপান্ত দেখা হয়ে গেল, উইট অ্যাণ্ড হিউমারের কলম পড়ে দু'জনে একসঙ্গে হাসলেন, কখনও কখনও হুলটা কোথাও না বুঝেও, এক সেট ধাঁধার সমাধান করা হয়ে গেল, বেবি এল না।

—মিঃ প্রকাশ, আপনাকে একটা গৎ শোনাই? প্রকাশ শুনল, ধন্যবাদ দিল, একটা সৌজন্য সম্মত ছুতো করে সরে পড়ল।

বেবি ফিরে এল সন্ধ্যারও পরে। পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে চুপি চুপি শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কৌশল্যা কর্কশ গলায় ডাকলেন, —বেবি শোন। সারা বিকেল কোথায় ছিলে?

নিরুত্তর মেয়ে আসামীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। কৌশল্যা আবার চেঁচিয়ে বললেন,—প্রকাশ এসেছিল, অনেকক্ষণ বসে থেকে চলে গেছে, জানো?

—মা তুমি তো ছিলে,—বেবি এতক্ষণে কথা বললে, একটু বুঝি হাসতে চেষ্টা করল,—আমি জানি, অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হয়নি।

—না হয়নি, কিন্তু জেনে রাখো, প্রকাশ বসেও নি, খানিকক্ষণ উসখুস করে চলে গেল। বেবি, কৌশল্যা এগিয়ে এলেন, কণ্ঠস্বর সাধ্যমতো কোমল করে বললেন,—বেবি, ওরা কি আমার কাছে আসে। বুঝিস না কেন, তুই না থাকলে ওরা একদিনও কি আসত। একদিনও না।

একটু দম নিলেন কৌশল্যা, তেমনই মায়ামোম গলায় বললেন,— সত্যি বলতো তুই কোথায় গিয়েছিলি। চ্যাটার্জীর কাছে না?

মেয়ের মৌনকে কৌশল্যা ধরে নিলেন স্বীকৃতি, আবার যেন চোখে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বলন।—হ্যাঁ কিংবা না বলো।

—গিয়েছিলাম।

—বেশ। তুমি নিজের মতে নিজের পথেই চলবে ঠিক করেছ?

—বেবি জবাব দিল না। এক পলকে ওর দিকে চেয়ে মনে মনে কী ভেবে নিলেন কৌশল্যা, বললেন,—একবার ঘরে এস বেবি, তোমাকে খবর দেব। কোনোদিন দিতে হবে না ভেবেছিলাম, কিন্তু আজ আর না দিয়ে উপায় নেই।

দরজা জানালা ভালো করে এঁটে দিয়েছেন কৌশল্যা, চাকরদের

কানে একটি কথাও যেন না যায়। ঘরে শুধু মৃদু একটি বেডসাইড রীডিং ল্যাম্প্ জ্বলছে। তাতে জ্যোতি কম, ছায়া বেশি।

অতি নীচু অতি নিভৃত ভঙ্গিতে কৌশল্যা বললেন,—চ্যাটার্জীকে বিয়ে করবে ঠিক করেছ, কিন্তু তুমি কি জানো বেবি, ওর,—ওর খারাপ অসুখ আছে। আর্মির লোক, ওদের কথা জানিস না তো। এখনও চিকিৎসা করছে।

—বাজে কথা, বেবি গর্জন করে উঠল।

—জানি তুই মানতে চাইবি না। কিন্তু বিশ্বাস কর, এর একটি কথাও বানানো নয়। ডাক্তারের প্রেসক্রিপসনের নকল যদি দেখাতে পারি, তবে বিশ্বাস হবে?

ঘৃণা আর তিক্ততা মেশানো গলায় বেবি বলল,—না, তাতেও হবে না। তোমার এত বুদ্ধি মা, কিন্তু হাতে বেশি অস্ত্র রাখোনি কেন। দিদি যখন মেহরাজীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, তখন ঠিক এই কথা বলেই তার মন ভাঙ্গতে চেষ্টা করেছিলে মনে আছে? তোমার মনে নেই, আমার আছে মা, এক অস্ত্রে বার বার কাজ হয় না।

—অন্ধ, স্বার্থপর। কৌশল্যা এর বেশি কিছু বলতে পারলেন না।

ক্ষীণ আলোটাও নিবিয়ে দিল বেবি, বিছানায় গড়িয়ে পড়ল।—তোমার কিছু ভেবে কাজ নেই মা, এবার ঘুমোও তো। কাল চ্যাটার্জী আসবে। চাও তো আমি নিজেই জিজ্ঞাসা করবো।

জানালা খুলে দিতেই দমকা হাওয়া ঘরের কলিজা ফুসফুস ঠাণ্ডা নিশ্বাসে ভরে দিয়ে গেল। প্রহরী ঝাউ গাছ তাকে তাড়া দিল: সর্-সর্। রোতক রোডের আলোর মালা কেঁপে কেঁপে নিবু নিবু হয়ে এল। সেদিকে চেয়ে কৌশল্যা মৃদুস্বরে বললেন,—তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না।

শেষঅস্ত্র এখনও হাতে আছে। চ্যাটার্জীকে কী বলতে হবে তাও তিনি মনে মনে ঠিক করে ফেলছেন।

আজ বিকেল থেকেই কৌশল্যা অস্থির পায়ে বাগানে পায়চারি করছেন। কোণের শিরীষ গাছের ডালে একটা মৌচাক হয়ে ছিল, সেটাকে আজ পাড়িয়ে এনেছেন। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। চাক নেই, তবু গুঞ্জন। ন্যাড়া ডালটার আশে পাশে কয়েকটা মৌমাছি গুনগুন করে ফিরছে। কৌশল্যা একটা ঢিল তুলে নিয়ে ছুঁড়লেন।

রেলসাইডিংয়ে ইঞ্জিনটা রোগীর মতো গলায় ককিয়ে উঠল, একটা মোটর সাইকেলের ঘসঘস শুনতে পেলেন। চ্যাটার্জী আসছে।

এই জন্যেই বিকাল থেকে কৌশল্যা অপেক্ষা করে আছেন, চ্যাটার্জীকে এখানে ধরবেন বলে।

চ্যাটার্জী সোজা বারান্দায় উঠতে যাচ্ছিল, এগিয়ে এসে বললেন, —ক্যাপ্টেন, একবার একটু ওদিকে আসবেন ?

ওদিকে নিয়ে গেলেন হেজের ধারে, কিন্তু প্রথমেই কিছু বলতে পারলেন না।

—ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জী, আমি বেবির মুখে সব শুনেছি।

চ্যাটার্জী আরও কিছু শুনতে হবে ভেবেছিল, একটু অপেক্ষা করে আস্তে আস্তে বলল,—আশা করি আপনি আমাকে অযোগ্য ভাবছেন না।

—অযোগ্য ? একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে কৌশল্যা বললেন,—না। ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জী আমার ভয় অন্য বিষয়ে।

ব্যগ্র চ্যাটার্জীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি ফেললেন কৌশল্যা, আরও একটা পাতা ছিঁড়ে নিলেন। ধীরে ধীরে বললেন, ফাঁকির ওপর তৈরি সৌধ স্থায়ী হয় না ক্যাপ্টেন। লুকোচুরি একদিন না একদিন ধরা পড়েই। সেদিন আর দাঁড়াবার জায়গা থাকে না।

পাতার রসে আঙুলে সবুজ রস ধরল, সেদিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে কৌশল্যা যোগ করলেন,—এ ভয়টা বিবাহিত জীবনে আরও বেশি। লুকোচুরিটা জানাজানি হয়ে গিয়ে অসুখটা আরো বাড়িয়ে তোলে।

মৃঢ় কণ্ঠে চ্যাটার্জী বলল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না মিসেস উপাধ্যায়।

অতি সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে কৌশল্যা বললেন,—আপনাদের দু'জনেরই বয়স অল্প, বেবিকে আপনি ভালোবেসেছেন। এ বিয়ে সুখের হত। আমি মা, তবু বেবির বিষয়ে আপনাকে একটি কথা জানিয়ে দিতে আমার বিবেক আমাকে বলছে। ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জী, বেবি একটু হালকা ধরনের মেয়ে দেখেছেন তো, ও জীবনে একবার ভুল করেছিল।

একাগ্রনেত্রে চ্যাটার্জীর দিকে আবার তাকালেন কৌশল্যা, বোধহয় শ্রোতার ঔৎসুক্য বাড়িয়ে দিতে চাইলেন!—

আমার বড়ো মেয়ে দেবযানী যাকে বিয়ে করেছে, সেই মেহেরাকে বেবিই আগে ভালোবেসেছিল। দোষ আমারই, ওকে ঠিক মতো চালনা করতে পারিনি। মেহেরার সঙ্গে ও একবার ডালহৌসি পালিয়ে গিয়ে সাতদিন কাটিয়ে এসেছিল জানেন? পুরো সাতটি দিন!

আর পাতা ছেঁড়ার প্রয়োজন নেই, শেষ বিষটুকু ঢালা হয়ে গেছে। দষ্ট জীবটি ঢলে পড়ে কিনা দেখতে কৌশল্যা স্থির নয়নে তার দিকে চেয়ে আছেন। চ্যাটার্জী বিবর্ণ হয়ে যায়নি তো, এতটুকু নুয়ে পড়েনি। খাকি প্যান্তলুনের পকেটে হাত দিয়ে আগের মতোই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে তার রেখাহীন মুখে কৌশল্যা একটুকরো হাসিও ফুটে উঠতে দেখলেন।

—খবরটুকুর জন্যে অনেক ধন্যবাদ মিসেস উপাধ্যায়, কিন্তু বড়ো দেরিতে দিলেন। বেবিকে আমি বিয়ে করেছি।

—বিয়ে করেছ? ইঞ্জিনের মতো তীক্ষ্ণ গলায় চীৎকার করে উঠলেন কৌশল্যা, হেজের গুচ্ছ ধরে নিজের শরীরের ভার সামলালেন।

—বিয়ে করেছি। চ্যাটার্জী পুনরাবৃত্তি করল।

—কাল রেজিস্টারের কাছে গিয়ে নাম সই করে এসেছি। আপনার কাছে আগেই অনুমতি চেয়ে নেওয়া উচিত ছিল, নেওয়া হয়ে ওঠে নি। বেবি মানা করেছিল। সেজন্য হাজার বার মাপ চাইছি মিসেস উপাধ্যায়।

এগিয়ে গিয়ে মোটর সাইকেলটা তুলে নিল চ্যাটার্জী, গেটের দিকে যেতে যেতে বলল,—সব বলে আপনি ভালই করেছেন, মা হয়ে লুকোননি, আমার অবাক লাগছে। তবে মিছে ভয় করবেন না, আমরা ফৌজী জওয়ান, এসব প্রেজুডিস নেই।

সাইকেলের পাদানিতে জুতো রেখে চ্যাটার্জী বলল,—আরও একটা খবর আছে। আমি পুনায় বদলি হয়েছি। আগামী সপ্তাহেই যেতে হবে। বেবিকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।

মোটর সাইকেলের গর্জন ক্রমে-শরু-হয়ে-আসা রোতক রোডের শেষে মিলিয়ে গেছে। তখনও দাঁড়িয়ে আছেন কৌশল্যা। শিরীষের ডালটিকে ঘিরে মৌমাছির গুঞ্জন নেই। কোয়্যারি থেকে মাঝে মাঝে শুধু ঝুপঝাপ পাথর ধ্বসে পড়ার আওয়াজ। চোখের পাতা দুটি ভারী, একি শিশির। দেবযানী গেছে, আগামী সপ্তাহে বেবিও যাবে। রোতক রোডের এই বাংলেটি একেবারে চুপ হয়ে যাবে, আর কেউ আসবে না। 'কেউ না' ফিসফিস করে কৌশল্যা যেন নিজেকে বললেন। জীবনের স্বাদ তো কবেই গেছে, উপাধ্যায় যেদিন গেছে, সেদিনই ; গন্ধটুকু নিয়েছিলেন তাও গেল।

হঠাৎ হিংস্র হাতে দু' তিনটে ফুলের চারা উপরে নিলেন কৌশল্যা, ব্ল্যাক প্রিন্স্ আর এ্যাডমিরালের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিলেন।

লেখকের চিঠি

সম্পাদক মহাশয় মাননীয়েষু,

সবিনয় নিবেদন, মাস কয়েক হ'ল ডাকযোগে একটি গল্প পাঠিয়েছিলুম। সেটি মনোনীত হয়েছে বলে খবরও দিয়েছিলেন। তারপর অনেক দিন গেল, লেখাটি এ সংখ্যাতেও ছাপা হয়নি দেখলুম।

যাই হোক, আমার তাগাদা সেজন্য নয়। ছাপা হয়নি, সেটা বরং শাপে বর। গল্পটি যদি ছাপাখানায় না পাঠিয়ে থকেন তবে আমাকে ফেরত পাঠালে বাধিত হব। কেননা শেষের দিকটা ফিরে লিখতে হবে। ছাপা হয়ে গিয়ে থাকলে ফর্মার শেষ পৃষ্ঠাটা নষ্ট করে ফেলুন।

এই অসঙ্গত আবদারে আপনি, অনুমান করি, বিব্রত বোধ করছেন। আমার কথা রাখতে গেলে কিছু আর্থিক লোকশান তো হবেই, কাগজ প্রকাশের দিনটিও পিছিয়ে যেতে পারে। বিশ্বাস করুন, নেহাত দায়ে না ঠেকলে এমন অন্যায় প্রস্তাব করতুম না।

গল্পটি আগাগোড়া বানানো হলে কোনো কথা ছিল না। ঠেকে গেছি, সত্যঘটনাকে সাহিত্য করতে গিয়ে। এ কাজে আমার বন্ধু কল্যাণবাবু নিপুণ, চেনালোককে নিয়ে লেখার অভ্যাস তাঁকে অর্থ এবং সুনাম দুই-ই দিয়েছে। জানতাম যার কর্ম তারে সাজে, তাই মাঝে মাঝে লোভ হলেও কখনও তাঁর পথ ধরিনি।

কিন্তু দেখুন তো, নীতিবাক্যটি ভুলে গিয়ে কি বিপদেই পড়েছি! আর ভুলেছিলুম তো ভুলেছিলুম, হতভাগা লোকটার সঙ্গে ফের দেখা হতে গেল কেন! লেখাটা একখানা ছাপা হয়ে গেলে আর চারা ছিল না। ওকে বোঝাতে পারতুম, হাতের ঢিল একবার ফস্‌কে গেলে, ইত্যাদি।

ঠিক করে বলুন তো, লেখাটা আপনি পড়েছিলেন কি না। চেনা লেখক, আমার ধারণা, নাম দেখেই ওটা মনোনীত মার্কা ফাইলে তুলে রেখেছেন, সুবিধামতো ছাপবেন। কোথায় অসুবিধে ঘটেছে আপনাকে খুলে বলি। ফাইল থেকে রচনাটি যদি বের করে সামনে নিয়ে বসতেন, সব চেয়ে ভাল হ'ত। যাই হোক, গল্পটি ফের সংক্ষেপে লিখে দিচ্ছি, চোখ বুলিয়ে গেলেই বুঝবেন, কোন্‌খানটা বদলাতে চাই এবং কেন।

আগেই কবুল করেছি, এটা আমার লেখা গল্প। অধুনা যেখানে আছি সেটা যদিও প্রবাস, তবু এর পাত্রপাত্রী বাঙালী, কারণ আমার বাসা আসলে একটা বাঙালী ব্যারাকে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, বাঙালী লেখক প্রবাসেও স্বজন নিয়ে কাহিনী বোনে।

এই প্রবাসে চমকপ্রদ কিছু ঘটে না, বা, ঘটলেও আমার চোখে পড়ে না। খোঁড়া পা-র দিনগুলোকে কোনোমতে টেনে টেনে চলি। তাই প্রতিবেশী সুধীরবাবুর বদলি হয়ে যাওয়ার মত সামান্য ব্যাপার নিয়েও এখানে কম আলোচনা হয়নি। প্রথমে আলোচনা, পরে কানাকানি হাসাহাসি। আমার গল্পের গোড়ায় দিকে এ সবের সবিস্তার বর্ণনা আছে। কৌতূহল হ'লে অংশটুকু প'ড়ে নেবেন।

কিন্তু অত কষ্ট কেনই বা করবেন? গল্পটির মোটামুটি কাঠামো ফের তো লিখতেই বসেছি। সুধীরবাবু মধ্যবয়সী, জীবনে দু-কুড়ির কোন্ না দু-সাতটি বসন্ত দেখেছেন। কিন্তু সুদর্শন। বিশেষণটি মনে রাখবেন। দীর্ঘ পাতলা দেহ, পাকা-ধরা চুল এখনও রীতিমতো ঘন টেরিযোগ্য বেশবাশে অসামান্য রুচি। খুব কম প্রৌঢ়ের চোখে মুখে এতটা শ্রী দেখেছি। সাহিত্য সঙ্গীত ইত্যাদিতেও অনুরাগ আছে। তরুণ বয়সে কিঞ্চিৎ কাব্যচর্চাও করতেন মনে হয়।

গল্পের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখবেন, সুধীরবাবুর স্ত্রীকে মাত্র রূপবতী

বলেছি। সংযমের কারণ নেহাৎ ব্যক্তিগত। বলা যায় না, ছাপা হ'লে আমার গৃহিণী লেখাটা পড়তেও পারতেন। পরস্ত্রী নিয়ে সাত কাহন লিখতে ভরসা পাই নি। এ চিঠি গোপনে আপনাকে লিখছি, তাই জানাতে বাধা নেই, উল্লিখিত মহিলা গৌরাঙ্গী, সুকেশা, তিল ফুল-নাসা। দেহের গড়নও ভাল, তবে ঝোঁক ঈষৎ পৃথুলতার দিকে। এবার আপনি যা জানতে চাইবেন জানি,—ভদ্রমহিলার বয়স। সুধীরবাবুর বয়সটা অনায়াসে লিখতে পেরেছি, তাঁর স্ত্রীরটা পারব না। মেয়েদের ও বস্তুটি, জানেন তো, অনেক প্রলেপের লেপ মুড়ি দিয়ে থাকে। প্রথম দেখে আমার মনে হয়েছিল, শী ইজ থার্টি ইফ এ ডে, আমার স্ত্রী বলেছিলেন, চল্লিশ; সুতরাং গড় পড়তার অংকে ফেলে ধরে নিতে পারেন পঁয়ত্রিশ। তা ছাড়া পরে জেনেছি, ওঁর বড় মেয়েটি কিশোরী; আরও পারে, ওঁর এক পাটি দাঁত বাঁধানো। অবশ্য বয়সের বিচারে এসব কিছুই প্রমাণ করে না। ধরে নিতে পারেন, এটা সেই ভাঁটা-লাগার কাল, যখন গ্ল্যামার হয়ত কিছুটা থাকে, কিন্তু নবীনতা আদৌ না। পুরুষের এ বয়সে দরকার হয় চশমা এবং হজমীগুলির, মেয়েদের ঘড়ি ঘড়ি প্রসাধনের ঝুলির। বাজে কথা ঢের হল এবার আসল গল্পে ফিরে আসি।

বদলি হয়ে সুধীরবাবু বিশেষ অসুবিধায় পড়েছিলেন। যেখানে ওঁকে পাঠানো হল, সেখানে সস্তায় বাসা ভাড়া পাওয়া যায় না। ছেলেমেয়েরা এখানে পড়ছে, সেশনের মাঝামাঝি, লটবহর তুলে পালানো কি সোজা! অগত্যা ঠিক হল সুধীরবাবু নতুন জায়গায় একাই যাবেন, হোটেলে থেকে চাকরি করবেন। সমস্যা তাতেও কম নয়, কেন না, আয় সামান্য, দু জায়গার খরচ পোষানো একরকম অসম্ভব। তবু যেতে হল। আমাদের উপর অনুরোধ রইল, অভিভাবকহীন পরিবারটির দিকে যেন নজর রাখি।

মুশকিলে পড়লুম এই নজর রাখতে গিয়ে। নইলে অজ্ঞাত

কুলশীল কে এক পরিমলবাবু কোথায় এসে উঠেছেন, কী করছেন, এত খবর আমার জানার কথা নয়।

আমার স্ত্রী একদিন বললেন, মৃণালদির ভাবনা ঘুচল।

গল্পটি পড়া থাকলে আপনাকে বলে দিতে হত না, মৃণাল সুধীর বাবুর স্ত্রীর নাম। শুনলুম সুধীরবাবুর বাসায় অতিথি এসেছেন। ওঁদেরই পুরোনো বন্ধু, বড়ো চাকুরে, পরিমলবাবু নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এখানে এসে পড়েছেন। পরিমলবাবুর মা এবং গৃহিনীও কাছাকাছি কোন এক তীর্থে আছেন, তাঁরাও এসে পড়লেন বলে। তারপর সবাই মিলে একসঙ্গে কলকাতা যাবেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'সবাই যাবে কেন ?'

—'বারে, পরিমলবাবুকে মৃণাল দি ওঁদের অসুবিধার কথা সব খুলে বলেছেন যে। সুধীরবাবুর যা আয় তাতে দু' জায়গায় খরচ কুলোয় না শুনে পরিমলবাবু বলেছেন, কলকাতায় ওঁর একটা বাসা একরকম খালি পড়ে আছে, সেখানে বিনা ভাড়ায় এরা থাকতে পারবে। মিডসেশনে ছেলেমেয়েদের ট্রান্সফারেরও কোনো অসুবিধা হবে না, সে ব্যবস্থা পরিমলবাবুই করবেন।'

সম্পাদক মহাশয়, একদিনে আমার স্ত্রী কত খবর সংগ্রহ করেছেন দেখুন, সাধে কি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে মেয়েদের এত কদর। সব শুনে পরিমলবাবুকে বিধি প্রেরিত পুরুষ বলে মনে হয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'ওঁরা কবে যাবেন ?'

মৃণালদি বলেছেন, সপ্তাহ খানেক। কলকাতায় খালি বাসাটার কলি ফেরাতে হবে। এর মধ্যে ওঁরা সকলে একবার সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসবেন। সুধীরবাবুর ছুটি নেই, নিজে আসতে পারবেন না।

স্ত্রী বললেন, 'তোমার কী মনে হয়।'

—'সম্রাট মহানুভব।'

স্ত্রী বললেন, 'এতদিনে মৃণালদির মুখে হাসি ফুটেছে। জানো, এ কদিন উনি শুধু লুকিয়ে কেঁদেছেন?'

বললুম, 'কী করে জানব? জানলেও তোমার কাছে সে কথা কি কবুল করতে ভরসা পেতুম?'

স্ত্রী কটাক্ষ হেসে (এখনও মাঝে মাঝে হাসেন) বললেন, 'তোমার সবটাতেই ইয়ার্কি। ওঁরা সত্যি খুব বেঁচে গেলেন, না? এই দুর্দিনে বাসা ভাড়া বেঁচে যাওয়া, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত—'

ক্রমে ক্রমে পরিমলবাবুর আরও নানাগুণের কথা কানে এল। আমার সূত্র অবশ্য ওই একটিই। শুনলুম, সম্রাট শুধু মহানুভব নন, সম্রাট কবিও। মুখে মুখে ছড়া তৈরি করেন। প্রশ্ন করেছিলুম, 'যথা?'

—'মৃণালদি ওঁর বৌদি তো, ঠাট্টার সম্পর্ক। এই তো সেদিন শুনলুম, ওঁকে ডাকছেন, 'যেমন আছে তেমনি এসো আর ক'রো না সাজ......বেনী না হয় এলিয়ে রবে, সিঁথি না হয় বাঁকা হবে....' আরও কত কী!' চমকে বললুম, 'এ তো রবীন্দ্রনাথের কবিতা।'

স্ত্রীও কিছু অপ্রতিভ হলেন।—'তাই নাকি? তবে যে মৃণালদি বললেন, উনি নিজেই কবিতা বানান!'

বললুম, 'আমার কোনো ভাই বানিয়েও তোমাকে এ ভাষায় ডাকলে আমি কিন্তু খুশি হতুম না।'

চটে গিয়ে স্ত্রী বললেন, 'যাচ্ছে তাই সব লিখে লিখে তোমার মনটাই খারাপ হয়ে গেছে। কবি না হন, ভদ্রলোক খুব রসিক। তোমার মতো সব সময় মুখ হাঁড়ি করে থাকেন না। মৃণালদি যখন রান্না করেন উনি তখন পাশে মোড়া নিয়ে বসে মজার মজার সব গল্প বলেন, জানো?'

জানি, সম্পাদক মশাই, এই অবধি পড়ে আপনি মুখ টিপে

হাসছেন, মনে মনে বলছেন, বুঝেছি। আসল মুশকিল কোথায় জানেন? গল্প উপন্যাসে একটা জিনিস যত সহজে বোঝা যায়, প্রকৃত জীবনে যায় না। ডিটেকটিভ বইয়ের গোয়েন্দা কত সহজে খুনীকে ধরে ফেলেন, অথচ সত্যিকার পুলিশ সামান্য একটা চুরির কিনারা করতে হিমসিম খেয়ে যায়। অনেক গল্প-বাছাই-করা আপনার অভিজ্ঞ চোখ, অনেক-গল্প-পড়া আমার পাঠকের মন যত চটকরে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে, আমরা প্রত্যক্ষদর্শীরা কিন্তু তত তাড়াতাড়ি পারি নি। এমন কি পরিমলবাবুও মৃণালদেবীকে সিনেমায় একসঙ্গে দেখেও নয়।

ইন্টারভ্যালের সময় আমার স্ত্রীই আঙুল দিয়ে দেখালেন, 'ওই দেখো।'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলুম, আমাদের সারির পিছনে, কিছু বেশি দামের আসনে, ওরা দুজনে। পরিমলবাবু আর মৃণাল। কী ভুল দেখুন, পরিমলবাবুর বর্ণনা দিতেই মনে নেই! অবশ্য মূল গল্পের দশম পৃষ্ঠায় এ নিয়ে পুরো একটি প্যারা আছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে লোকটি ময়লা, মোটাসোটা, মজবুত ধরণের। স্ত্রীকে বললুম, 'যাও আলাপ করে এস গিয়ে।'

ও জোরে জোরে মাথা ঝাঁকুনি দিলে,—'না, ছি-ছি, লজ্জাও করে না। স্বামী বিদেশে হোটেলে খেয়ে না-খেয়ে ওদের জন্যে খেটে মরছে, আর উনি সিনেমা দেখতে এসেছেন!'

একটু পরে পরিমলবাবুকে দেখতে পেলুম না। সিগারেট খেতে বাইরে গিয়ে থাকবেন। মৃণাল আমার স্ত্রীকে হাতছানি দিয়ে একবার ডাকলে। আমার স্ত্রী যেন দেখেও দেখলে না। আমি ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললুম, 'ছি-ছি, না হয় ওরা একটু বেশি দামের সীটেই এসেছে। তাই তে এত চটে গেলে?'

স্ত্রী আরও চটে গেলেন, 'তাইতে বুঝি? ওদের রকম দেখে। পাঁচজনে পাঁচ কথা বলতে শুরু করেছে, জানো?'

বললুম, 'অন্তত একজনেরটা তো জানছি।'

রাগ করে আমার স্ত্রী ছবিতে মন দিলেন।

আরও একচোট নিলেন বাড়ি ফেরার পথে।—'তোমাকে এতদিন বলি নি। কী বেহায়া জানো, লোকটা ওকে একটা শাড়ি দিয়েছে, আমাদের দেখাতে এসেছিল।'

—'শুধু ওকে?'

—'না, ছেলেমেয়েদেরও অবিশ্যি একসেট করে নতুন জামাকাপড় দিয়েছে। ওটা লোক-দেখানো। রোজ ডিম আসছে, ফল আসছে, মাংস দিয়ে দশ রকমের রান্না হচ্ছে, মুখেও রাচে! ওদিকে সেই বেচারা বিদেশের হোটেলে উপোস দিচ্ছে কি-না ঠিক নেই।'

বললুম, 'সাবিত্রী, সকলের পাতিব্রত্যের আদর্শ হয়ত তোমার মতো উঁচু নয়।

স্ত্রী বললে, 'ঘেন্না। ওর সাজগোজের ঘটা আজকাল কত বেড়ে গেছে দেখতে পাও না?'

নিরীহ গলায় জবাব দিলুম, 'কী করে পাব। তোমার ভয়ে ভালো করে তাকাই না তো।'

পরদিন সকালে হঠাৎ ও-বাড়ি থেকে সহর্ষ আবৃত্তি শুনতে পেলুম···'কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা! তোমার পরশ অমৃত সরস, নয়নে তোমার দিব্য বিভা'—স্ত্রী বললে, 'শুনলে?'

—'ব্যাপার কী?'

—'ঘুম ভাঙিয়ে মৃণালদি চা খাওয়াতে গেছে যে। তাই কবিত্বের বান ছুটেছে।'

হেসে বললুম, 'এ কবিতাটাও কিন্তু ওর রচনা নয়।'

—'না হোক। পরের বউকে পরের লেখা কবিতাই বা শোনাতে যাবে কেন শুনি?'

বললুম, 'ঠিক। এই তো তোমার ঠোঁটের ভঙ্গিটি দেখে কতদিন

বলেছি—ধারানিবদ্ধের কলঙ্ক রেখা,—সেও অন্যের রচনা, কিন্তু পরের লেখা নিজের বউকে শোনাতে বোধহয় দোষ নেই, না?'

স্ত্রী রসিকতাটায় কর্ণপাতও করলেন না। নিজের ঝোঁকেই বলে গেলেন, 'মরি মরি রুচি! অমন দেবতুল্য সুন্দর যার স্বামী, সে কিনা কদাকার একটা লোকের সঙ্গে—ছিঃ!'

—'অর্থাৎ লোকটা কন্দর্পকান্তি হলে তোমার আপত্তি হত না?'

—'ভারি তার্কিক হয়েছ! আসল কথা, সব কিছুরই বয়স আছে। বড়ো বড়ো ছেলে, দুদিন বাদে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, তার কি এসব সাজে!'

এ সব যে খুব উঁচু দরের নীতিকথা নয়, শ্রীমতীকে সেটা বলতে ভরসা হল না।

মূল গল্পে সম্পাদক মশায়, এই পর্যন্ত পৌঁছতে আমার বিশ পৃষ্ঠা লেগেছে। অতঃপর আমার সঙ্গে পরিমলবাবুর পরিচয়ও হয়েছিল, তখনকার আলাপ—আলোচনা, এখনকার ক্রমোচ্চ কানাকানি, আরও সব খুঁটি নাটি চিঠিতে বাহুল্যবোধে বর্জন করলুম।

এখানে কেউ কেউ, মহিলারাই বেশি বলতে শুরু করেছিলেন, লোকটার মা আর স্ত্রীর এখানে আসবার কথা ছিল, তাদের কী হ'ল? পুরুষেরা ভাবছিলেন, লোকটার ছুটি আর ফুরোয় না নাকি! কলেজের এমনকি হাইকোর্টের ছুটিরও তো শেষ আছে।

শেষ পর্যন্ত একদিন শোনা গেল ওদের যাবার দিন ঠিক হয়ে গেছে। আগামীকাল ওরা সবাই গিয়ে সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসবে। ফিরে এসে কলকাতা।

ওরা যেদিন গেল, তার পরদিনই যদি সুধীরবাবু এখানে হঠাৎ চ'লে না আসতেন তবে হয়ত ব্যাপারটা এমন হাটে-হাঁড়ি হয়ে যেত না। অফিসে কী কাজ পড়েছিল, সুধীরবাবু একদিনের জন্য এখানে এসেছিলেন। আমরা পরে অনুমান করে ছিলাম, ওটা ছুতো। ওঁর

কানেও কিছু কানাঘুষো পৌঁছে থাকবে। এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওরা কই?' শুনলেন, 'সে কি, ওরা যে আপনার ওখানে।'

'কবে গেল?'

'কেন, কাল।'

সুধীরবাবু ওখানেই, মাটির উপরে বসে পড়লেন। কেউ কেউ বললে, 'সে কি মশায়, আপনার অনেক দিনের বন্ধু।'

'কে বললে বন্ধু।' উনি এখন যেখানে থাকেন, লোকটার সঙ্গে আলাপ সেখানেই। দু দিনেই অবশ্য খাতির জন্মেছিল। এখানে বেড়াতে আসবে শুনে সুধীরবাবু নিজেই ওকে ওঁর বাসার ঠিকানা দিয়েছিলেন। ওর মারফৎ স্ত্রীকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন, লোকটার আপ্যায়নের যেন ত্রুটি না হয়।

সুধীরবাবু পরের গাড়িতে ফিরে গেলেন। সৌম্য প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে সেদিন অত্যন্ত করুণ দেখাচ্ছিল।

মৃণালরা কিন্তু ফিরে এসেছিল। ঠিক সাত দিন পড়ে। মেয়েরা গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, একেবারে ভালোমানুষের মতো গলায়, 'সুধীরবাবু কেমন আছেন, মৃণালদি?'

'ভালো না ভাই। খুব রোগা হয়ে গেছেন। ছুটি নেই, নইলে নিজেই আসতেন।'

কেউ চোখ টিপল, ঠোঁট বেঁকিয়ে থামল কেউ।—'এ কদিন ওখানেই ছিলেন বুঝি?'

মৃণালদি নাকি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিলেন। ফস করে কে তখন জিজ্ঞাসা করে বসল, 'তবে যে শুনলুম আপনারা নৈনিতালে গিয়েছিলেন। এখানকার নিতাইও ঘুরে এল কিনা, সে বললে আপনাদের ওখানে দেখেছে।'

এটা আন্দাজী ঢিল, কিন্তু লেগেছে ঠিক আমার স্ত্রীর কাছে শুনেছি, মৃণালের মুখ পলকে সাদা হয়ে গিয়েছিল। কোনোরকমে

নিজেকে সামলে বলেছিল, 'আমি এখন একবার গা ধুতে যাব ভাই; সারারাত ট্রেনে এসে মাথা ঘুরছে।'

বেশি লোক জানাজানির ভয়ে লোকটাকে আর মারধোর করলুম না। পাড়ার মুরুব্বীরা ওকে আড়ালে ডেকে ধমকালেন। সেদিন দুপুরেই পরিমল চম্পট দিলে। সুধীরবাবুকে তার ক'রে দেওয়া হ'ল, পরদিনই ভোরে এসে যেন ওদের এখান থেকে নিয়ে যান।

সন্ধ্যার দিকে ও-বাড়ি থেকে মৃদু কান্নার আভাস পেলুম।

স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আবার কী হল।'

তিনি মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'থিয়েটার। মৃণালদি খালি কাঁদছে আর মূর্চ্ছা যাচ্ছে।'

শুনলুন, পরিমলের শোকে নয়, গয়নার। লোকটা নাকি যাবার আগে বাক্স ভেঙ্গে সব নিয়ে গেছে।

কপট সহানুভূতির সুরে বললুম, 'আহা, তবে তো শোক হতেই পারে। গয়নার চেয়ে মেয়েদের কাছে বড় কী আছে। গহনাং পরতরং নাহি।'

নয়নে অগ্নিবাণ হেনে স্ত্রী বললেন, 'চুপ করো। মেয়েদের তো সব কিছু জেনে ব'সে আছ! ওর গয়না চুরি গেছে না ছাই! নিজে থেকে সব একখানা একখানা করে তুলে দিয়েছে, নইলে এত সিনেমা আর হিল ইস্টিসনের খরচ এল কোথা থেকে! আর সব গয়না যাই হোক, অনন্ত একটা যে চুরি যায়নি আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি।' বলতে বলতে স্ত্রী চাপা গলায় বললেন, 'জানো, মৃণালদির হাতের আংটিটা নেই?'

সভয়ে বললুম, 'ওরে বাবা, এত দূর?'

—'নৈনিতালে সাতদিন কাটিয়ে এল, আরও কতদূরে গড়িয়েছে কে জানে?'

বোকার মতো বললুম, 'এখন কাঁদে কেন?'

—'এটুকুও বোঝ না, কী বুদ্ধিতে তবে গল্প লেখো! কাঁদে ভয়ে।

একজন তো পালিয়েছে; আর একজনের কাছে মুখ দেখাতে হবে না? বাকি জীবনটা যাকে নিয়ে ঘর করতে হবে, তাকে বোঝাবে কী দিয়ে? তাই নিজে সাধু সেজে লোকটাকে চোর অপবাদ দিচ্ছে।'

আমার আসল গল্প, সম্পাদক মশাই, এইটুকু। যে লেখাটা পাঠিয়েছি তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন, ঘটনা প্রায় সবটাই মেলে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝবেন, গরমিলও অনেকখানি। সে তফাত সুরের। আমরা, একালের কথাকারেরা, শুধু গল্প বলে খুশি নই, সবজান্তাও হতে চাই। মনোবিকলনের দিকে ঝুঁকে পড়ি। আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত চরিত্রের উপর আরোপ করি। মন দিয়ে পড়ুন, দেখবেন, এ ভুল আমি এ গল্পেও করেছি। মৃণালের সঙ্গে পরিমলের ঘনিষ্ঠতা ঘটেছিল, শুধু এটুকু লিখেই ক্ষান্ত হইনি, সেই সঙ্গে বলতে গেছি, কেন। মৃণাল, অমন সুরূপ শান্ত সৌম্য যার স্বামী, পরিমলের মধ্যে কী দেখে ভুলেছিল। উত্তরের খোঁজে তাকিয়েছি পরিমলের কমবয়সী মজবুত শরীরটার দিকে, সবচেয়ে সোজা এবং স্থূল যে সমাধান মনে এসেছে, সেটাই বিনা বিচারে লিখে দিয়েছি। বলতে চেয়েছি, পুরুষের প্রতি অন্ধ আদিম আকর্ষণ ছাড়া মৃণালের ক্ষণিক বিভ্রমের আর কোনো হেতু নেই।

গোটা গল্পটাই ওখানে মিথ্যা হয়ে গেছে।

সেদিন কাছাকাছি একটা শহরে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ পরিমলের মুখোমুখি প'ড়ে গেলুম। দেখামাত্র চিনলুম, সেও আমাকে চিনল, আর আশ্চর্য, সে পালাতে চেষ্টাও করলে না! বললুম, 'ভয় নেই, আমি পুলিশে খবর দেব না।' সে বললে, 'জানি।' এবং আমাকে অবাক করে বললে, 'চা খাবেন?' বিনা বাক্যে ওকে অনুসরণ করলুম।

ছোট দোকান, কোনোমতে একবারে দুজনের মতো জায়গা পাওয়া গেল।

ভূমিকা না বাড়িয়ে প্রথমেই বললুম, পরিমলবাবু, আমার গোটা কয়েক কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল।

দেবতা যেমন বর দেন, সেই সুরে সে বললে, 'করুন।'

বললুম, 'আমি একটা ব্যাপার ভালো বুঝতে পারি নি।'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত ঘুরিয়ে পরিমল বললে, 'দু-দিনের ব্যাপার, ও-সব যেতে দিন।'

গম্ভীর গলায় বললুম, 'দু-দিনের ব্যাপার জানি। কিন্তু সেটাই বা কেন ঘটেছিল তাই বুঝতে পারি নি। মৃণালের তো কিছুর অভাব ছিল না।'

পরিমল লঘু গলায় হেসে উঠল।—'অর্থাৎ আদর্শ উদার স্বামী ইত্যাদি ছিল বলবেন তো? তার পাশে আমি নিছক একটা পশু, না?'

বললুন, 'শুধু উদার নন, সুধীর বাবু ওকে ভালোও বাসতেন।'

'ওখানেই আপনার একটু ভুল হ'ল। পনেরো-কুড়ি বছরের বিবাহিত জীবনের পর কতটুকু প্রেম বাঁচে বলুন তো? কজন স্বামীর চোখে প্রথম দিনের সেই মোহ থাকে?'

বাধা দিয়ে বললুম, 'তবে তো আমি যা ভেবেছি তাই। এ নিতান্ত জৈব ব্যাপার। আপনি বয়সে তরুণ বলেই জিতেছিলেন।'

পরিমল আবার হাসল।—'ফের ভুল হল। জিতেছিলুম আমি নিজে তরুণ বলে নয়, ওকে তরুণী ভেবেছিলুম বলে।'

শূন্য চোখে চেয়ে বললুম, 'বুঝতে পারলুম না।'

'পারলেন না?' পরিমল গলা নামিয়ে বললে, 'মৃণালের বয়স কত জানেন? জানলে পারতেন।'

বললুম, 'কত আর? ত্রিশ? পঁয়ত্রিশ?'

'চল্লিশের একদিন কম নয়। প্রৌঢ়া কোনো রমণীকে গদগদ গলায়

কবিতা পড়ে শুনিয়েছেন কোনো দিন ? বলেছেন, তার চোখের অতল কালোয় আপনার মৃত্যু ? বলে দেখবেন। তার মুখ-চোখের রঙ বদল হয় কিনা লক্ষ্য করবেন।'

বলতে বলতে পরিমল উঠে দাঁড়াল। চেয়ে দেখলুম, ওর হাতে জ্বলজ্বল করছে সেই আংটি।

সেই থেকে আমি কেবল এই ভাবছি। অন্তত একজনের চোখে সে এখনও তরুণী, এইটুকু যাচাই করতে গিয়েই কি তবে মৃণাল মরল ? কী জানি।

তাই ঠিক করেছি, সম্পাদক মশাই, গল্পটা ফিরেই লিখব। যদি সময় থাকে, তবে লেখাটা পত্রপাঠ ফেরত পাঠিয়ে দিন।

বিকালের দিকে এখনও যেদিন মেঘে মেঘে আকাশ কালো হয়ে আসে, নিরুপমার কাজের শেষ থাকে না। কোমরে ব্যথা, তাড়াতাড়ি নড়াচড়া করতে কষ্ট, তবু কোনোমতে দালানে এসে বসেন, উবু হয়েই বড়ির থালাটা সরিয়ে রাখেন এক কোণে, জোরে জোরে ডাকতে থাকেন, "বৌমা, ও বৌমা, কাপড়গুলো তুলে ফেল, এখুনি যে সব ভিজে তাল হয়ে যাবে।"

ভিতর থেকে সাড়া আসে, "যাই মা," তবু বুঝি অরুণার বেরিয়ে আসতে দু'চার মিনিট দেরি হয়। অসহিষ্ণু নিরুপমা গজগজ করেন, আবার ডাকেন, "বৌমা, তোমার চুল বাঁধা কি এখনও শেষ হল না। আজ না হয় পাতা একটু কম ঘটা করে কাটলে বাছা।"

ঘরের মধ্যে অরুণা ছটফট করে, নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে, না পেরে বলে, "ছাড়ো, ছাড়ো, মা ডেকে ডেকে সারা হয়ে গেলেন, শুনছ না। শাড়িগুলো সব জবজবে হয়ে যাবে যে।"

অনিল বলে, "যাক। ভিজে শাড়িতেও তোমাকে নেহাৎ মন্দ দেখাবে না।"

"অসুখ করলে?"

"ওষুধ আছে।"

আঁচলে গাল মুছতে মুছতে অরুণা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে। নিরুপমা রাগ করে বলেন, "পাতা কাটা হল।"

অরুণা অপ্রতিভ কিন্তু সহজ গলায় বলে, "মা যেন কী, কিছু দেখতে পান না। আমি কি পাতা কেটে চুল বাঁধি? জট পড়েছিল,

তাই মাথায় চিরুনিটা একটু বুলিয়ে এলাম। নইলে উকুন হবে, আপনার ছেলে বলেছে।"

"নাও, এবার কাপড়গুলো তুলে ফেল দেখি। খোকা অফিস থেকে এল না? লেখা পড়া শিখে মেয়ের দিন দিন বিবেচনা যেন বাড়ছে। ঝি বিলুকে নিয়ে পার্কে বেড়াতে গেছে কখন, এখনও যে আসে না।"

অরুণা বলে, "আসবে, আসবে, আপনি একটুতেই বড়ো ব্যস্ত হয়ে পড়েন।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ আর একটি শিশুর গলা শোনা যায়। ঝুপ ঝুপ করে তখনই বৃষ্টি নামে, রেলিংটা একেবারে ভিজে যায়, দালানেও ছাঁট আসে, নিরুপমা সরে দেয়াল ঘেঁষে বসেন। ছোট দু'টি হাত পিছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরে, কানের কাছে নুয়ে পড়ে একটি কচি মুখ আবদার করে, "দিদা, ছড়া বল।"

"কোন্ ছড়া?"

"বিষ্টির।"

"আয় বৃষ্টি ঝেঁপে,

চাল দেব মেপে।"

"এটা না, অন্যটা। শিবঠাকুরের বিয়েটা।"

"বেশ তো, সেটাই বলছি, গলাটা তো আগে ছাড়। ফাঁস দিয়ে মারবি নাকি।....টাপুর টুপুর নদেয় এল বান, শিবঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান। এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান...."

"আর এক কন্যে, দিদা?"

ছড়া ভুলে দিদা তখন অন্য কথা ভাবছেন। গলিতে জল একহাঁটু হল, মেয়েটা এখনও ফেরেনি?

লিলি এল, একেবারে ভিজে পায়রাটি হয়ে, স্যাণ্ডালের স্ট্র্যাপ ছেঁড়া, শাড়ি খাতা বই শপশপে, বিনুনি খুলে বুকের কাছে এলানো, তবু মুখে গুনগুন একটা গানের সুর।

নিরুপমা চেঁচিয়ে বললেন, "রাত দু'পহর অবধি কলেজ তোমার?"

মার সামনে লজ্জা নেই, শাড়ির প্রান্তটা একটু তুলে নিংড়ে নিল লিলি, ভিজে আঁচল দিয়েই একবার ঘষে নিল মাথা। হাসতে হাসতে বলল, "মার এখন আর সময়ের হুঁশ নেই, রাত কোথায়, এখন তো মোটে ছ'টা। টিউটোরিয়াল ক্লাশ ছিল শেষ পিরিয়ডে, করব না?"

কঠিন সুরে নিরুপমা বললেন, "যাও আগে জামাকাপড় ছেড়ে এস গিয়ে তারপর তোমার টিউটোরিয়ালের বিহিত করছি। কলেজ থেকে ছাড়িয়ে আনলে তোমার শিক্ষা হবে।"

একটা কথাও যেন লিলির কানে গেল না, হাসতে হাসতে সে ছেঁড়া স্যাণ্ডেল জোড়া টেনে টেনে ঘরে গিয়ে ঢুকল। হাঁসের পালক জলে ভিজল না।

বিলু সরে গিয়ে হাত পেতে রেলিং চোঁয়ানো জল ধরছিল, লিলি চলে যেতেই সে ছুটে এসে ভিজে হাতে দিদার গাল চেপে ধরল। একটা গলপো বল।"

"কী বলব, সব তো শুনেছিস, আমার ঝুলিতে আর কিছু নেই।"

"কেন বেঙ্গমা বেঙ্গমী?"

"আবার শুনতে হবে?" ফের শুরু করতে হল, "নিঝুম দুপুর, ঘোড়া ছুটিয়ে তেপান্তরের মাঠ পাড়ি দিয়ে এসেছেন রাজপুত্তুর, বটগাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করছেন, চোখে ঢুলুনিও এসেছে। সেই বটগাছে বাসা বেঁধেছে বেঙ্গমা বেঙ্গমী—কাল দুপুরে কিন্তু আমার দশটা পাকা চুল তুলে দিতে হবে।"

ঝি এসে সমুখে দাঁড়াল। "কর্তাবাবু আপনাকে ডাকছেন, মা। বাতের ব্যথাটা নাকি বেড়েছে, মালিশ করে দিতে হবে।"

"বেড়েছে নাকি, বাড়বে না? যা বর্ষা নেমেছে ক'দিন থেকে। এবার ছাড় বিলু, ঘরে যাই, তোর দাদু ডাকছে।"

"তুমি দাদুকে বেশি ভালোবাসো। আমি জানি।"

"না, না, তোকে। হল তো। এবার সর দেখি।" খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে আসেন একেবারে ভিতরের ঘরে সেখানেও এখনও আলো জ্বলেনি। বিছানায় শোয়া একটা পাঁজরসার শরীর থেকে থেকে খুক খুক করে কাশছে, মালিশের শিশিটা অন্ধকারেই খুঁজে নিয়ে নিরুপমা তার পাশে বসেন।

"খুব কষ্ট হচ্ছে ?"

"খুব না, এই পিঠের কাছটায়। তুমি একেবারে খেয়ে এসেছ তো।"

"এখনই ? তোমার খাবার দিয়ে গেছে ?"

"আমি আজ কিছু খাব না।"

"একেবারে কিছু না, সেকি হয়। একটুখানি দুধ খেতেই হবে।"

কখন আপনা থেকেই বৃষ্টি থামে, গলিতে ফের লোকজন চলাফেরার আওয়াজ পাওয়া যায়। পাশের ঘরে হৈ চৈ হুল্লোড়, বোধয় মেজোছেলে সুব্রত বাড়ি ফিরেছে, এতক্ষণে বাবুর দেশোদ্ধার সারা হল। ফিরেই খুনসুটি লাগিয়েছে বোন-বৌদির সঙ্গে। বড়ো ছেলে অনিল বুঝি ক্লাবে যায় নি, আজ অনেক রাত অবধি ওরা তাস খেলবে। এ-আসরে নিরুপমা যান না, দু'এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকেই চলে আসেন। বড়দার পার্টনার লিলি, সুব্রত বসে বৌদির সঙ্গে। তাছাড়া টুয়েন্টি নাইন খেলা নিরুপমা বোঝেনও না। আগে তাস খেলতেন বটে, কিন্তু বিন্তির ওদিকে এগোতে পারেননি। ওদের খেলায় বাজিও আছে। যাদের কালো সেট হবে তারা শনিবার সিনেমা দেখাবে। সুব্রত যদিও এক পয়সা দেবে না, সব যাবে বৌদির বাক্স থেকে। লিলির ভরসা বড়দা।

সত্যেনবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন। নিশ্বাসের তালে তালে বুক ওঠাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকছে। বিছানা থেকে উঠে নিরুপমা বাইরে এলেন। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ এখন টলটলে, এখানে ওখানে তারাও ফুটেছে, বুটিদার একখানা নীলাম্বরী যেন ভিজে হাওয়ায়

শুকোতে দেওয়া। বিলুরও কোনো সাড়াশব্দ নেই, ঝির কোলেই না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল কিনা কে জানে। আরও একটি দিন শেষ হয়ে এল।

শেষ। কথাটা যেন ধ্বনিরূপ নিয়ে বারবার বাজল নিরুপমার কানে। পিছনে চাইলেন, ঘোর অন্ধকার, একটি সুষুপ্ত মানুষের নাকের নিয়মিত ঘর্ঘর ছাড়া শব্দটুকু নেই। গায়ে কাঁটা দিল, অবলম্বনের জন্য রেলিংটা চেপে ধরলেন। এই প্রথম নয়, আরো অনেকদিন গায়ে কাঁটা দিয়েছে, তার মধ্যে আজ বিশেষ একটি দিনের কথা মনে পড়ল। সেদিন অবশ্য কাঁটা ভয়ে দেয়নি, দিয়েছিল ভাবনায়।

চল্লিশ পেরিয়ে আসার কয়েক বছর পরে সেই আষাঢ়ের রাত্রি আবার যেন ফিরে এল। সমস্ত রাত চোখের দু'পাতা এক করতে পারেননি, বিছানায় ছটফট করেছেন। আলো জ্বেলে ক্যালেণ্ডারটা দেখেছেন, ফের আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছেন, কিন্তু ঘুমোননি। হিসাব যদি নির্ভুল হয়, আর মনে যা ভাবনা ঢুকেছে তা যদি ঠিক হয়, তবে ছি ছি, সকলের কাছে মুখ দেখাবেন কী করে। এক ছেলের বিয়ে দিয়েছেন, আরেক ছেলেও বড়ো, কলেজে পড়ে, মেয়ে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে, আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে একটি দুটি পাকা চুল প্রায়ই খুঁজে পান, কী লজ্জা!

পরদিন সকালে তাঁর চেহারা দেখে সকলে অবাক হয়ে গেছে। রুক্ষ মূর্তি, সারা কপালে সিঁদুর লেপা, চোখের কোলে কালি। বাথরুমে ঘটিঘটি জল ঢেলেও যেন সে-কালি মোছেনি, অকারণে মেয়েকে মেরেছেন, ঝিকে ধমকেছেন, বৌকে ঠেস দিয়ে কথা শুনিয়েছেন। আসল রাগ যার উপরে, যাকে প্রাণ খুলে গাল পাড়লে সব জ্বালা জুড়োত, সে তখন টুরে, মফঃস্বলে। তার করলে লোক জানাজানি হবে, তাই পত্রপাঠ চলে আসতে গোপন চিঠি লিখে দিলেন।

সত্যেনবাবু চারদিনের মাথায় ফিরে এলেন।

প্রথমেই মেয়ের সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞাসা করলেন, "কার অসুখ রে।"

"কই, কারো তো না।"

"তবে যে তোর মা আমাকে তাড়াতাড়ি আসতে লিখে দিলে। কত কাজ ফেলে আমাকে চলে আসতে হয়েছে ভাব দেখি।"

লিলি চোখ বড়ো করে বলেছিল, "মা তোমাকে চিঠি দিয়েছিলো বুঝি বাবা? কই, আমাদের তো কিছু জানায়নি?"

বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো ভাবনার উপর লজ্জা চাপল। কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকটা আরও কী বেফাঁস কথা বলে ফেলে সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি কড়া গলায় বলললেন, "লিলি, তুই কাজে যা। তুমি একবার এদিকে এস তো।"

সব শুনে সত্যেন বাবুরও মুখ শুকিয়ে গেল। ভাঙ্গাভাঙ্গা গলায় বললেন, তুমি ঠিক জানো, তোমার ভুল হয়নি?"

পূর্ণিমার নিশিপালন, একাদশীর জো, কোনো তিথির হিসাবে এতটুকু যার গোলমাল হয় না, তার এত বড়ো ব্যাপারটায় ভুল হবে? চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে, দাঁতে ঠোঁট চেপে নিরুপমা বললেন, "ভুল হলে তো বেঁচে যেতাম, কিন্তু আমার আর একটুও সন্দেহ নেই যে।"

"তাই তো," বলে মাথা চুলকে সত্যেনবাবু সেখান থেকে সরে পড়লেন।

রাত্রে দেখা হতে ফের বললেন, "তবে তো একটা ডাক্তার এনে ব্যাপারটা ভালো করে জেনে নিতে হয়।"

"যেমন বিবেচনা তেমন কথা!" পাশ ফিরে নিরুপমা বললেন, "বৌ, মেয়ে, ছেলেদের সামনে সবাই জিজ্ঞাসা করবে কী হয়েছে। আমি মরে গেলেও নয়।"

"তবে তুমিই একবার চেম্বারে চল।"

"হাঙ্গামা তাতেও কম নয়। কোথায় যাচ্ছি বলে বেরোব? কেউ যদি সঙ্গে যেতে চায় তা হলে?"

আরও একটা উপায় স্থির। সবাইকে বলবেন কালীঘাটে পূজো দিতে যাচ্ছেন। কালীঘাটের নামে লিলি নাক সিঁটকাল, বৌ ঠোঁট বাঁকাল। কেউ সঙ্গ নিল না।

কালো পর্দাটানা, চড়া আলো জ্বালানো ডাক্তারখানার সেই ছোট কামরাটির কথা মনে পড়লে আজও শরীর শিউরে উঠে। কত জেরা, নির্লজ্জ, কণ্টকিত মিনিটের পর মিনিট আর যেন কাটে না। তালু অবধি জিভ শুকিয়ে গেল, কলিজার গতি কি এত দ্রুত, হাতুড়ি কি এর চেয়েও জোরে পড়ে। এত নোনা জল কি থাকে মানুষের দেহে, নইলে এই ঘাম কোথা থেকে এল।

পরীক্ষার পর ডাক্তার বলেছেন, "আপনি এখানেই একটু বসুন, আমি আপনার স্বামীর সঙ্গে একটা দু'টো কথা বলে আসি।"

পর্দা টানাই রইল, তবু উৎকর্ণ নিরুপমা এপাশে দাঁড়িয়ে ওপাশের কথা পরিষ্কার শুনতে পেলেন। ডাক্তার বাবুর গলা: "যত সব বাজে বাজে ভয় আপনাদের আরে না না মশায়, ওসব কিছু না, আমি খুব যত্ন নিয়েই পরীক্ষা করেছি। কত বয়স হল আপনার মিসেসের, ...আই সী। সিসটেম আদার ওয়াইজ ভালো? তবে তো আমি যা ভেবেছি তাই...।" এখানে ডাক্তারবাবু বুঝি গলা নামিয়ে মুখটা সত্যেনবাবুর কানের একেবারে কাছে নিয়ে গেলেন। একেবারে শেষের দু'টি কথা মোটে নিরুপমার কানে এল: "যান মশাই, আর কোনো ভয়ই নেই আপনাদের, একেবারে নিরঙ্কুশ। তবে জীবনের একটা পরিচ্ছেদ ফুরিয়ে এসেছে, মনে রাখবেন এটা তারই সূচনা।"

ফেরবার পথে ট্যাকসিতে চড়ে উচ্চস্বরে হাসতে শুরু করলেন সত্যেনবাবু। "দেখলে তো, মিছিমিছি আমাকে কী বকাটাই না বকলে, কী হয়রানটাই না করালে। মফঃস্বল থেকে সব কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি ছুটে আসতে হল, তারপর কালীঘাটের নাম করে ডাক্তারের

বাড়ি," হো হো করে হাসছিলেন সত্যেনবাবু, হাসতে হাসতেই বলছিলেন, "এবার সত্যিই কিন্তু একদিন গঙ্গাচ্চান করতে হবে, কালীঘাটে পুজো দিতে হবে। দেখছ না গিন্নি, এতদিনে আমরা বুড়ো হতে চললাম। এখন ক' বছর গঙ্গায় নাওয়া আর তিলক কাটা চলুক, তাপর দুজনে মিলে কাশীবাসী হওয়া যাবে।"

সামনে দু'টো দাঁত পড়ে গেছে, সত্যেনবাবু তখনও হাসছিলেন, নিরুপমা হঠাৎ তীব্র গলায় ধমক দিলেন, "চুপ করো।"

সত্যেনবাবু অবাক হয়েছিলেন, অপ্রস্তুতভাব সামলে উঠতেই ফের হেসে নিচু স্বরে বলেছিলেন, "তবে এখন কিছুদিনের জন্য কিন্তু আমরা নিশ্চিন্ত, ডাক্তার বলল শোননি?"

"তুমি চুপ করলে!" এবার এত জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন নিরুপমা যে, ড্রাইভার চমকে ফিরে চাইল, সত্যেনবাবু বাকি পথটা আর একটা কথাও বলতে ভরসা পেলেন না।

'আর ভয় নেই'—ডাক্তারের এই আশ্বাস তারপর থেকে কতবার যে নিরুপমা নিজেকে অস্ফুট স্বরে শুনিয়েছেন ইয়ত্তা নেই। আশ্চর্য মন খুশিতে নেচে ওঠেনি। দুপুরে সবাই ঘুমলে ছোট একটা হাত-আয়না নিয়ে বসেছেন, দেখে দেখে খুঁটে খুঁটে পাকা চুল তুলছেন, ওপর ওপর কালোর নীচে এত সাদা চুল লুকিয়ে ছিল? মুখের চামড়া এখানে ওখানে টেনে টেনে দেখেছেন, এই দাগটা কোথা থেকে এল, আগে তো ছিল না। কপালের এই রেখা? নাকি ভুল দেখেছেন, চোখ দু'টিও তাঁর গেছে। একে একে সব যাবে, চোখ যাবে কান যাবে, একদিন বলার ক্ষমতাও। মৃত্যু এগিয়ে আসছে ধীর পায়ে, এরা সব তার চর। তারই প্রথম পরোয়ানা পৌঁছে গেছে দেহে। একটি অধ্যায় শেষ হয়ে এসেছে, ডাক্তার বলেছে। সঙ্গে সঙ্গে একথা বলল কেন, আর ভয় নেই? কী নিষ্ঠুর ঠাট্টা।

একটি সুখের চিরতরে ইতি হতে চলেছে। সব সুখেরই একে একে ইতি হবে। ছোট ছোট মৃত্যুর বিন্দু দিয়ে একটি সম্পূর্ণ অবসানের

সরসী তৈরি হবে। সেই সরসীতে যতদিন ডুবে মরতে না পারছেন তত দিন কী করবেন নিরুপমা? পলিত-কেশ, গলিত নখদণ্ড হয়ে বেঁচে থাকবেন? আর ভয় নেই, কী মিথ্যুক ডাক্তার। ভয় তো এখনই বেশি। সেদিনের আর দেরি নেই, যখন নিজেকে আয়নায় দেখে ভয় পাবেন, চিনতে চাইবেন না বা পারবেন না।

হাত-আয়নাটার কাঁচ ঝাপসা হয়ে এল, চমকে তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে মুছে নিলেন নিরুপমা, ফোঁটা ফোঁটা জলে কখন ভিজে গেছে, একটুও টের পায়নি? বিশ্বাস, একটা অনুভূতি সারা শরীর তেতো করে দিয়েছে। হায়রে, এর চেয়ে সেই ভাবনাটা সত্য হল না কেন। লিলিতে চৌদ্দ বছর আগে যার ইতি হয়ে গেছে, এতদিন পরে পুনশ্চ দিয়ে ফের সেটার শুরু হলে লজ্জা পেতেন ঠিক। কিন্তু জীবনের এখনও পরমায়ু আছে এই আশ্বাসও পেতেন। লজ্জা তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নয়। হাতের মুঠি শক্ত হল নিরুপমার, ঝুঁকে পড়ে শক্ত কাচে কপালটা ঘসতে ঘসতে বার বার প্রার্থনা করলেন, ডাক্তারের পরীক্ষা যেন ভুল হয়, যে ভয় করেছিলেন সেটাই যেন সত্যি হয়ে ওঠে।

কেমন যেন হয়ে গেলেন নিরুপমা। নিজেও টের পেতেন বদলে যাচ্ছেন। একা একাই কখন চোখের পাতা ভিজে গেছে, কখন ফিক ফিক করে হেসেছেন। ঘুমের ঘোরে কতবার যে মুখ নখের টানে ক্ষত করেছেন হিসাব নেই। ছেলেরা বলত মা, তোমার কি কোনো অসুখ করেছে। মাথা নেড়ে নিরুপমা বলতেন, "না না।" এত জোর দিয়ে বলতেন যে, যারা শুনত তারা চমকে উঠত।

আর বকতেন লিলিকে। ভাল লাগত না অরুণাকেও, কিন্তু সে পরের মেয়ে, বেশি কিছু বলতে ভরসা পেতেন না। লিলি যেন দু'চোখের বিষ হয়েছিল। এমন করে চুল বেঁধেছিস কেন, এই শাড়িটা পড়লি কেন, জামার হাতা ছোট করে কেন ছাঁটলি—ছুতোর কখনও অভাব হত না। আবার, লিলি তাঁর পাশেই তো শুত, কোনো কোনো দিন রাত্রে উঠে তাকে অপলক চোখে দেখতেন নিরুপমা। একটি

শরীর ধীরে ধীরে ভরে উঠছে? একটি মেয়ে দিনে দিনে সুন্দর হয়ে উঠছে, দেখেও যেন তৃপ্তি হত না, ওর গায়ে হাত দিয়ে পরিপূর্ণ একটি বুকের শ্বাসপতনের ছন্দ অনুভব করতে চাইতেন। কোনো দিন হয়ত লিলি জেগে উঠেছে, মাকে নির্নিমেষ চোখে চেয়ে থাকতে দেখে ভয় পেয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে, "কী, মা কী।"

"কিছু না," নিরুপমা বলেছেন, "তুই ঘুমো।"

সেই সময়ে কিছুদিনের জন্য লিলিকে হিংসে করতে শুরু করেছিলেন নিরুপমা, আপন মেয়েকে? কে জানে।

তাস খেলা ফেলে ওরা এখন দল বেঁধে খেতে আসছে, নিরুপমা টের পেলেন। তাড়াতাড়ি সরে গেলেন এক কোণে। আজ আর তিনি কিছু খাবেন না, কেমন একটা চোঁয়া ঢেকুর উঠছে বিকাল থেকে। সত্যেনবাবুর জন্য শুধু একটু গরম দুধ দিয়ে যেতে বলে দেবেন ঝিকে।

মনে নেই কবে সেই পাগলামির ভাবটা কেটে গেছে, সন্ধি করেছেন নিজের সঙ্গে। ভেবেছিলেন সম্মুখে গলি, গলির শেষে দু'হাত প্রসারিত করে মৃত্যু দাঁড়িয়ে, কাছে গেলেই টেনে নেবে। এগিয়ে দেখছেন গলি বন্ধ নয়, ওখানে মাত্র একটা বাঁক, মোড় ফিরতেই আরেকটা দিগন্ত খুলে গেছে। ঠিক কবে জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পেলেন খেয়াল নেই, অরুণা যেদিন কলতলায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল, সেদিন থেকেই কি? ছেলেরা ডাক্তার ডাকতে ছুটল, সত্যেন বাবু অস্থির হয়ে পায়চারি শুরু করলেন, কিন্তু নিরুপমা ঘাবড়াননি। তাঁর অভিজ্ঞ চোখ ধরে ফেলেছে ব্যাপারটা কী। অরুণাকে ধরে ধরে আনলেন কলতলা থেকে, বিছানায় শুইয়ে দিলেন। মুখ চোখ মুছিয়ে দিয়ে সন্তর্পণে জেরা করে জানলেন, যা অনুমান করেছিলেন তা-ই

ঠিক। একটা দাঁত পড়ে গেছে, তবে ফোকলা মাড়ি বের করে হাসতে আটকাল না। বহুদিন পরে সেই প্রথম।

নিরুপমা সেদিন থেকেই কাঁথা সেলাই করতে আরম্ভ করলেন। একটা নতুন কাজ জুটল।

আরেকটা কাজ বাড়ল আরও বছরখানেক বাদে, যেদিন সত্যেন বাবু মফঃস্বল থেকে বাতে প্রায় পঙ্গু হয়ে ফিরে এসে শয্যা নিলেন। মেয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষার পড়া, অরুণা কোলের ছেলে বিলুকে সামলাতেই হিমসিম, নিরুপমার নিজেরও শরীর ভালো না, তবু মালিশের শিশি হাতে তাঁকে সত্যেনবাবুর বিছানার পাশে গিয়ে বসতে হল।

সেই শয্যা, কিন্তু নতুন সম্পর্ক। তাঁকে নাওয়ানো, সময়মতো আহার জোগানো, —একাভাবে তাঁরই উপর নির্ভরশীল অসহায় অসমর্থ মানুষটিকে নতুনভাবে ভালোবাসতে শুরু করলেন। ছেলেদের পিতৃভক্তি তখন দায়িত্ব পালনের নামান্তর মাত্র, তরুণী মেয়ে প্রহরে প্রহরে পোশাক বদলেই মশগুল। হঠাৎ যেন নিরুপমা টের পেলেন তিনি ছাড়া স্বামীর আপন জন কেউ নেই। তাঁরই কি আর কেউ আছে? আশ্চর্য, দুঃখ হল না, কান্না এল না।

তারপর বিলু একটু একটু করে বড় হয়েছে, মুখে একটি দু'টি করে কথা ফুটেছে, চলতে শিখছে: শুনে, দেখে নিজেই যেন খুশিতে শিশু হয়ে গেছেন নিরুপমা। সবাইকে ডেকে দেখিয়েছেন তার মাতালের মতো চলতে চলতে চলা, ধপাস্ করে পড়া। কেঁদে উঠলে কোলে তুলে থামিয়েছেন। আধো আধো বুলি শুনে হাততালি দিয়ে হেসেছেন। ভুলে যাওয়া ছড়াগুলো ফের মুখস্ত করতে হয়েছে, বিলুকে শোনাবেন। উপন্যাস পড়া ফেলে আরেকবার পড়ে নিয়েছেন ঠাকুরমার ঝুলি।

"মা এখনও এখানে দাঁড়িয়ে? খাওয়া হয়ে গেছে?"

ছেলেরা উপরে উঠে এসেছে। নিরুপমা বললেন, "আজ কিছু

খাব না রে, শরীর ভালো নেই রে। ঝি-কে বলে দেত, বিলুকে আমার কাছে দিয়ে যাক। আজ বাদলার দিন, বিছানা ভেজাবে, ঠাস্‌ঠাস্‌ মার খেয়ে সারারাত চেঁচাবে, ওর মায়ের যা মেজাজ। বিলু আমার কাছেই শোবে।"

ঘরে ফিরে গিয়ে নিরুপমা মেঝেয় বিছানা করে নিলেন। ঝি প্রথমে সত্যেনবাবুর জন্যে দুধ, পরে বিলুকে শুইয়ে দিয়ে গেল। খানিক পরে লিলিও এসে গড়িয়ে পড়ল আরেক পাশে। নিরুপমা ধমক দিয়ে বললেন, "জামাটা আলগা করে শো, গরমে মরে যাবি যে।"

কুণ্ঠিত লিলি ঘুমের ঘোরেই জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "না, না, আমার অসুবিধে হবে না।"

"আহা, মার কাছেও মেয়ের লজ্জা," বলে নিরুপমা আরেকবার ধমক দিলেন, কিন্তু পীড়াপীড়ি করলেন না।

জেগে উঠে দুধটুক খেয়ে সত্যেনবাবু আবার শুয়ে পড়েছিলেন, নিরুপমা মৃদুস্বরে বললেন, "এখন কেমন আছো। ব্যথাটা কমেছে?"

"পায়ের কাছটাতে কনকন করছে এখনও," সত্যেনবাবু ককিয়ে ককিয়ে বলে উঠলেন, "একটু টিপে দেবে?"

নিজের চোখ ঘুমে ভরে এসেছিল, তবুও মালিশের শিশি নিয়ে নিরুপমাকে উঠতে হল। সত্যেনবাবুর পায়ের কাছটিতে গিয়ে বসলেন। একটু পরেই ডেকে উঠে নাক ঘুমের গভীরতা ঘোষণা করল।

হঠাৎ নিরুপমা টের পেলেন, বিলু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। স্বপ্ন দেখেছে হয়ত। তাড়াতাড়ি উঠে তার পাশে গিয়ে বসলেন। মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে থাবড়াতে থাকলেন, "ঘুম আয়, ঘুম আয়, নিমগাছের পাতা। দুই দুয়োরে পড়ে আছে দু'টো বাঘের মাথা" জড়িতস্বরে বিলু বললে, "এটা না তিন কন্যেটা।"

—"বেশ তবে তিন কন্যেটাই শোন।" নিরুপমা ফের শুরু করলেন, "......তিন কন্যের দান। এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান। আরেক কন্যে—"

চোখ ঢুলুঢুলু, অবসাদে শরীর ভারী, বিলুর ছোট মাথাটিকেও কোলে রাখতে পারছেন না। এত ক্লান্তি, তবু কী আশ্চর্য সুখের স্বাদ যেন দেহের কণায় কণায় ছড়িয়ে গিয়ে এখন সত্তাকেও ছেয়ে ফেলেছে। একটি সুখের ইতি হয়ে গেল বলে নিরুপমা একদিন কেঁদেছিলেন, তখনও এই সুখের ঠিকানা জানতেন না। সেদিন বোঝেননি, সারার পরেও শুরু আছে। যৌবনকেই একদা জীবন বলে ভুল করেছিলেন, এখন জেনেছেন জীবন যৌবনকে ছাড়িয়েও।